স্ব-নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প



স্ব-নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদনা

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় □ সমরেশ বসু

সহযোগী সম্পাদক সমরেন্দ্র দাস

আলোচনা ও ভূমিকা

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

মডেল পাবলিশিং হাউস ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট কলকাতা-৭০০ ০৭৩

…আধুনিক ছোটগল্প হল যন্ত্রণার ফসল। মহৎ বিশ্বাস থেকে—অন্তত মোটামুটি একটা নিশ্চিন্ত ভিত্তি থেকে [যা ফ্লোব্যারও রাজতন্ত্রের মধ্যে পেয়েছিলেন] উপন্যাস সৃষ্টি হয়, কিন্তু শূন্যতার আঘাতে তার উপকরণগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে—আদর্শ আর বিশ্বাসের উজ্জ্বল-কোণিক ধারালো খণ্ডগুলিকে লেখক জিজ্ঞাসার মাধ্যমে নগ্ন-তীক্ষ্ণতার সঙ্গে ছুড়ে দিতে থাকেন।…

…ছোটগল্প হল লেখকের ব্যক্তিত্বেরই এক-একটি অভিব্যক্তি। নিজের সমাজ পরিবেশ, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং চারিত্রিক গঠন অনুযায়ী ছোটগল্পের লেখক যে প্রতীতি জীবন থেকে গ্রহণ করবেন, তারাই তাঁর রচনায় ধরা দেবে। ছোট গল্প, লেখকের ব্যক্তিত্বেরই বিচিত্র-রঞ্জিত বিকাশ।…

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

বাংলা ছোটগল্পের এই সংকলন বাংলাসাহিত্যে নিশ্চিতই কালোত্তীর্ণ সংযোজন। গত একশ বছরের প্রতিভা এই সংকলনে উপযুক্ত মর্যাদায় সন্নিবেশ করার সযত্ন প্রয়াস রয়েছে। সংকলনের সম্পাদক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও সমরেশ বসু দিনের পর দিন পরিশ্রম করেছেন সংকলনটিকে প্রতিনিধিত্বমূলক করার লক্ষ্যে। আজ যখন দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে তখন এঁরা দুজনই প্রয়াত। বাংলা সাহিত্যের দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্র চিরদিনের মত আমরা হারিয়েছি। এই ব্যথা এই মুহূর্তে আমাকে বিষণ্ণ ও আচ্ছন্ন করছে। আমি তাঁদের শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁদের নির্দেশিত পথেই দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ সম্পন্ন করেছি। অবশ্য পরিপূর্ণ সহযোগিতার সুযোগ নিয়েছি সর্বশ্রী রমানাথ রায়, অর্ধেন্দু চক্রবর্তী, দেবব্রত মল্লিক ও বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে। প্রথম সংস্করণ যখন প্রকাশিত হয় তখনই সম্পাদকদ্বয় বহুতর সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে আপ্রাণ কাজ করেছেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল ব্যক্তিগত বাধা-বিপত্তি নিজেদের সৃষ্টিকর্মের তাগাদা নানা অনুষ্ঠান পারিবারিক জীবন ও ভ্রমণ।

দ্বিতীয় সংস্করণে সাঁইত্রিশটি নতুন গল্প নেওয়া হয়েছে। সাহিত্য-সৃষ্টি থেমে থাকে না। প্রতি বছরই নতুন নতুন ক্ষমতাবান লেখকের আত্মপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই। জানতে পারি। সুতরাং প্রথম সংস্করণ থেকে দ্বিতীয় সংস্করণে পৌঁছতেই পেয়ে যাই নতুন গল্পকার যাঁদের সংকলন থেকে বাদ দেওয়া চলে না। কারণ যে কোনো সুসম্পাদিত সংকলনই কালের দলিল। এই দায়িত্বের কথা আমাকে বলেছিলেন প্রয়াত দুজন সম্পাদক। যে সাঁইত্রিশজনের গল্প এই সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হল তাঁরা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে পরিচিত। বাংলা সাহিত্য ইতিমধ্যেই তাঁদের গ্রহণ করেছে—পাঠক নিয়েছেন কাছে টেনে।

প্রয়াত সম্পাদক দুজনের অভাবে এই সংস্করণ হয়ত কিছু কিছু ত্রুটির শিকার হবে। আশা করি তুচ্ছ ত্রুটিকে অতিক্রম করে পাঠকের তৃপ্তি এই সংস্করণকে পুরস্কৃত করবে।

জয়দেব ঘোষ

] সূচীপত্র [

॥ সময়ের সহোদর ঃ বাংলা ছোটগল্প ॥

বাংলা ছোটগল্প তার যাত্রারম্ভের প্রথম বিন্দু থেকে আজ পর্যন্ত কতটা এগিয়েছে, তার সে দূরযাত্রায় দূরত্বজ্ঞাপক শিলাফলকগুলি কে কোথায় বিন্যস্ত, কোথায় তার যাত্রাপথ কোন দিকে বেঁকেছে, তার পথ-সঙ্কট ও পথসন্ধিতে কোন্ কোন নির্দেশক কখন কীভাবে কাজ করেছে, এই সংকলনের গল্পগুলির সামনে দাঁড়িয়ে সে প্রশ্ন পাঠকের কাছে অনিবার্য। জিজ্ঞাসুর কাছে সে প্রশ্নের গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য। এবং রসিকের কাছে সে কাজের দায়িত্ব তিল পরিমাণে পালিত হলেও আনন্দদায়ক—এই বোধেই এ প্রবন্ধের অবতারণা। বিশেষ বাংলা ছোটগল্প আজ পর্যন্ত তার সর্বতোমুখিনতার জন্য বহুল অভিনন্দিত, আর তার প্রখর গতিশীলতার জন্য বিপুল সুখ্যাত। ফেলে-ছড়িয়েও ছোটগল্পে আর লিরিকে বাংলা সাহিত্য রাজা। সুতরাং সে রাজত্ব পত্তনের গোড়ার কথা নানা দিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য।

উপন্যাস-নাটকের বেলায় যা ঘটেনি, ছোটগল্পের বেলায় সেই স্বাবলম্বনপ্রাপ্তি প্রথম চোটেই ঘটে গিয়েছিল—সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ এ-কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম এবং প্রধান উত্তমর্ণ ইংরেজি সাহিত্যের বহুকীর্তিত গরিমা সত্ত্বেও ছোটগল্পের বেলায় তাদের যৎসামান্য পশ্চাৎপদতার কথাও কোনো কোনো সমালোচক ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন। সুতরাং স্বাধীন এবং স্বাবলম্ব পদক্ষেপেই বাংলা ছোটগল্পকে অগ্রসর হতে হয়েছে। এই অগ্রসরণ সার্থক হতে পেরেছে এই কারণে যে, আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে, আমাদের ইতিহাসের ধারানুক্রমের সঙ্গে ছোটগল্পের অবিচ্ছেদ্যতা জড়িত। যেমন, আমাদের ছোট কবিতার প্রাণবন্ত আবেদন, তেমনি আমাদের ছোটগল্পের আশ্চর্য প্রাণময়তা। সমাজ এবং স্বদেশের সংসর্গবিচ্যুতি কদাপি এক লহমার জন্যেও ঘটেনি আমাদের সাহিত্য-শাখার এই দুটি বিশাল অংশে। এদের কৃতিত্বের মূলে এই সত্য নিশ্চয় ক্রিয়াশীল। বাংলা ছোটগল্পের জন্মকালের আলোচনায় একথা আরো পরিস্ফুট হবে।

এ-আলোচনায় প্রথমেই জাতীয় পরিবেশের তাৎপর্যের কথা না [illegible] পারে না। ইংরেজি সাহিত্যের ছোটগল্পের প্রাথমিক লক্ষ্যভেদিতার মূলে এবং ফরাসি গল্পের অন্তর্ভেদিতার পিছনে এই জাতীয়পরিবেশের প্রভাব কাজ করেছে। জাত হিশাবে ইংরেজের অন্তর্মুখী স্বভাব ছোটগল্পের অনুকূল নয়। মজলিসী ফরাসি-মনের সামাজিক মন ছোটগল্পের চর্চায় সেক্ষেত্রে অধিক কার্যকরী। অলস আড্ডার গসিপ ছোটগল্পের নাতিদূর পূর্বপুরুষ। আড্ডার পরচর্চা শতেক দোষে দোষী হওয়া সত্ত্বেও মানব-সম্পর্কের রক্তে-মাংসে জীবন্ত। ফরাসি বা রুশীয় জীবনের অকৃত্রিম ও সহজিয়া ভাব ছোটগল্পের সেই প্রাণ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে বেশি। শুধু তাই নয়, ফরাসি এবং রুশীয় জনজীবনের দুর্দশা যেমন ইতিহাসখ্যাত, তাদের সার্বিক সম্পর্কের আদান প্রদানও তেমন বহুপরিচিত। তুষার-কাঠিন্যে এ দুই জায়গার জনজীবন স্রোত হারিয়ে ফেলেনি।

দেশের আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক ও ভৌগোলিক বৈচিত্র্য এবং তৎসঞ্জাত জনসাধারণের জীবন-সংগ্রামে বিস্ময় ও রহস্যের ঘনীভূত রস-সম্ভাবনা ছোটগল্পের সার্থকতার আর-একটি শর্ত। কলোনির শাসনযন্ত্রের প্রয়োজনে ইংরেজ যুবককে দেশ-দেশান্তরে যেতে হয়েছে, এটা

ঠিক। কিন্তু শাসনযন্ত্রের প্রাচীরকে ডিঙিয়ে সেই যুবক সেই-সেই দেশের সঙ্গে একচিত্ত কখনো হতে পারেনি—ফলে ইংরেজি ছোটগল্পে জীবন-বিস্ময়ের বিমুগ্ধতা কদাচিৎ ধ্বনিত হয়েছে। আর ইংলন্ডের ক্ষুদ্র দ্বীপ এবং অপেক্ষাকৃত মন্থর জীবন প্রাণরহস্যের দীন ভাণ্ডারী—কাজেই ইংরেজি সাহিত্য গরিমার এই দিক অনুজ্জ্বল রয়ে গিয়েছিল।

বাংলা দেশের সাহিত্যাকাশে ছোটগল্পের সম্ভাবনার ভাববাষ্প চিরদিন বর্তমান, একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। জাতীয় পরিবেশ, জনজীবনে অকৃত্রিম সরসতা, এবং কালান্তরকে বরণ করে নেবার সদাসম্মতচিত্ততা,—ছোটগল্পের ভূমিকা রচনার সমস্ত শর্তগুলিই এখানে হাজির ছিল। জাতীয় আবহাওয়া গল্পরচনার পক্ষে কতটা অনুকূল ছিল, তার আলোচনাকালে গ্রাম্য চণ্ডীমণ্ডপে ও স্নানের ঘাটে কিংবা অন্য আড্ডায় প্রচলিত গল্পগুলির সন্ধান ও রূপনির্ণয় নেহাত অকাজের কাজ হবে না। মজলিসী গল্পের ধরনধারণ সম্বন্ধে কিছুমাত্র ওয়াকিবহাল হলেই তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি নজরে না পড়ে পারে না। মুখে মুখে সময় কাটানো ও চিত্ততোষণের জন্য বলা এই ধরনের গল্পগুলিতে ছোটগল্পের অনেক লক্ষণ বিদ্যমান। সুনির্দিষ্ট প্লট—গল্পের ঘটনার স্পষ্ট ক্লাইম্যাক্স এবং প্রায় ক্ষেত্রেই হাস্যরসের সমাবেশে এই ধরনের গল্পগুলি ছোটগল্প পর্যায়ে গিয়েই দাঁড়িয়েছে। এদেরই আমি বলতে চেয়েছি বাংলা ছোটগল্পের নাতিদূর পূর্বপুরুষ। পরিমিত পরিসরের ভিতর এ-ধরনের গল্পকে বলে শেষ করতে হ'ত, এবং যেহেতু হাস্যরস সৃষ্টি ছিল এদের আড্ডাগত লক্ষ্য, সুতরাং শ্রোতার ধৈর্যের দিকে তাকিয়ে গল্পকে পরিমিত হতে হতই।

শান্তিপুর অঞ্চলে শ্রীগুরু ও গোপেশ্বর—দুই মামা-ভাগ্নের ধূর্ততাকে অবলম্বন করে এরকম অনেক গল্প এককালে প্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই গল্পগুলি মজলিসে মজলিসে সহাস্যে কথিত হ'ত, এরকম অনুমান করা চলে। ১৮২০ সালের সমাচারদর্পণের ১৫ই জানুয়ারির সংখ্যায় জনৈক পত্রলেখকের গল্পে আমরা "শ্রীগুরু-গোপেশ্বরের এইরূপ অনেক কথা প্রসিদ্ধ আছে" এই উক্তিতে শ্রীগুরু-গোপেশ্বরের চরিত্র অবলম্বন ক'রে রচিত গল্পের বহুল প্রচারের ইঙ্গিত পাই।

গল্পটিও অদ্যাবধি পরিচিত গল্প। সংক্ষেপে গল্পটি এই—ঐ মামা-ভাগ্নে দুজন খুবই ধূর্ত ছিল। টাকা-পয়সা উপায় ক্রমেই শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে ব'লে তারা এক কৌশল করল। এই কৌশলটাই গল্পের প্রধান ঘটনা। মামা শ্রীগুরু ভাগ্নে গোপালকে কোনো হিন্দু বড়োলোকের বাড়িতে বিক্রয় করে দিলেন। মামা টাকা ট্যাঁকে নিয়ে প্রস্থান করলেন। ভাগ্নে রইল। তারপর ভাগ্নে একদিন 'পশ্চিমাস্য' হয়ে নামাজ প'ড়ে মুসলমান প্রতিপন্ন হ'ল। ধর্মপ্রাণ হিন্দু ধনাঢ্য আর কী করেন, কিল খেয়ে কিল চুরি করে ভাগ্নেকে বিদায় দিলেন।

লক্ষ্য করার বিষয়, গল্পের হিউমারের নিটোল পরিচ্ছন্নতা, গাল্পিক কাঠামোর সুনির্দিষ্ট বৃত্তানুসরণ, এবং বড়োলোকের ক্ষতিহীন বিড়ম্বনায় সাধারণ মানুষের নির্দোষ উল্লাস। আসর-জমানো গল্পের এই তৈরি-করা জমিতেই ছোটগল্পের প্রথম ইঙ্গিত আভাসিত হয়েছে। এর পরে দেখা যাক সেই ইঙ্গিতের কালগত তাৎপর্য কী।

উনবিংশ শতকের জলেস্থলে মত্ত তোলপাড় সম্বন্ধে নানান আলোচনা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। সে সম্বন্ধে বিতণ্ডা না করে একটা নিরীহ নির্দোষ উক্তি করা চলে যে, আমাদের জীবনচেতনায় কালান্তরের স্বাক্ষর উনিশ শতকের প্রথম পাদেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কালান্তরের এই সূচনা একান্ত অর্ধস্ফুটভাবে অষ্টাদশ শতকের কোনো কোনো রচনায় হাজির

আছে। প্রাক্‌-পলাশী যুগে অদ্ভুত রামায়ণ রচয়িতা রামানন্দ ঘোষ রচিত গ্রন্থের পুষ্পিকায় আত্মবিলাপে দারুব্রহ্ম পূজা করে কী পার্থিব লাভ হ'ল—এই উক্তিতে আমরা আধুনিকতার বিশিষ্ট চিহ্ন জিজ্ঞাসার সাক্ষাৎ লাভ করি। তাঁর শেষ জীবনের পার্থিব দুর্দশার মূলে নিজের পরিত্যক্ত স্ত্রীর অভিশাপ, এরকম উক্তিও গ্রন্থের পুষ্পিকায় তিনি করেছেন। ধর্মজীবন-যাপনের পরিণতিতে অনুতাপের এই স্বাক্ষর অর্ধস্ফুট জীবনমুখিনতার পরিচয় বহন করছে, একথা হয়তো বলা চলে। এই ক্ষীণ চিহ্ন ভারতচন্দ্রে ও পরে কবিওয়ালাতে আর-একটু বলিষ্ঠ হয়ে উনিশ শতকের প্রথম পাদে নিশ্চিতরূপে ইতিহাসের তাগিদে কালান্তরকে স্বীকার করে নেবার দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হ'ল।

কালান্তরের সেই চিহ্ন বুদ্ধিজীবীদের যে-কোনো প্রচেষ্টাতেই তখন দুর্লক্ষ্য ছিল না। সমাচারদর্পণের বা সংবাদপত্রের সাক্ষ্য গ্রহণে ঐতিহাসিকেরা দেখিয়েছেন যে, আধুনিকতার প্রাথমিক সূত্রগুলি তখন নানাভাবে বুদ্ধিজীবীমহলে হস্তগত হয়েছে। এই নতুন-অভিজ্ঞানলব্ধ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের চেতনায় প্রগতির জন্য একটা আন্তরিক তাগিদ সক্রিয় ছিল। ফলে নবার্জিত বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস ও উনিশ শতকীয় হৃদয়ধর্মের উদ্বোধন ইতিহাসকে নতুন আলোকে উদ্ভাসিত করেছিল। সরাসরি পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের অনুরক্তি ও কৌলীন্য-প্রথা-বিরোধিতার ন্যায় সমাজ সংস্কারেচ্ছা তখন নবজাতক মধ্যবিত্তের পরিচয়চিহ্নের মতো ব্যাপক হয়ে উঠছিল।

যুগান্ত এবং যুগান্তরের তৎকালীন সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে চিন্তার মুক্তিপথও আভাসিত হয়েছিল। ব্যক্তিত্ববোধক উক্ত চিন্তামুক্তিই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জনক। বাংলা ছোটগল্পের উৎস সন্ধানেও উল্লিখিত ইতিহাসের সঙ্গে মজলিসী গল্পের যোগসূত্র আবিষ্কার ইতিহাস ব্যাখ্যার সহায়ক হবে।

বলা একান্ত বাহুল্য, উনিশ শতকের প্রথম পাদ সমাজ-সংস্কারেচ্ছার দ্বারা চিহ্নিত। এই ইচ্ছা বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত এবং কালান্তরের চিহ্নবহ এবং স্বাভাবিক। ফলে সমাজের সর্বক্ষেত্রে নতুন-পুরনোর ইতিহাসগত দ্বন্দ্ব দৃশ্যমান ছিল। কবিরাজী বনাম ডাক্তারী, বাল্যবিবাহ ও স্বাধীন বিবাহ, এ-ধরনের ছোটবড়ো নানান ক্ষেত্রে তার নিদর্শন মেলে। উনিশ-শতকীয় বুদ্ধিবাদীদের পক্ষে সমাচারদর্পণ এ বিষয়ে তাদের ইতিহাসগত ভূমিকার জন্যই একটা বড়ো হাতিয়ার ছিল।

এই ধরনের বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে, পূর্বে কথিত মজলিস বা আড্ডার ভঙ্গি অনুসরণ করে এমন অনেক দীর্ঘ নাতিদীর্ঘ পত্র সমাচারদর্পণে প্রকাশিত হয়েছে, যেগুলি ছোটগল্পের অতি নিকট-আত্মীয়। সংবাদপত্রের দৈনিক চাহিদা মেটানোই যে এদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, একথা রচনাগুলি পড়লে বোঝা যায়। দু-একটি গল্প রসমূল্যে এখনো মূল্যবান। এর মধ্যে একটি বিশেষ গল্পের চুম্বক তুলে দিচ্ছি। সমাচারদর্পণের ১৮২১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল।

কোনো দরিদ্র ব্যক্তি মরণাপন্ন ব্যাধিতে কণ্ঠাভরণ কবিরাজকে আহ্বান করলেন। ব্যাধি কঠিন এই অজুহাতে কণ্ঠাভরণ কবিরাজ সোনাভস্ম রূপাভস্ম বাবদে বেশ কিছু টাকা হস্তগত করলেন। কেউ কেউ বিচক্ষণ ইংরেজ ডাক্তারের শরণাপন্ন হবার উপদেশ দিলেন বটে, কিন্তু ধূর্ত কণ্ঠাভরণ তা বানচাল করে দিল। ইংরেজ ডাক্তারের বদলে কণ্ঠাভরণ আর এক হাতুড়েকে আমদানি করলেন। ইত্যবসরে রোগী যায়-যায়। রোগীকে গঙ্গাযাত্রা করানো হ'ল।

এই সময় এক 'জ্ঞানবান কবিরাজ' হাজির হলেন। "কবিরাজ আসিয়া দেখিতেছেন এমত সময়ে রোগী বিছানাতে হস্তপদাদি ঘর্ষণ করিতেছে অর্থাৎ শয্যাকন্টক হইয়াছে। তাহা দেখিয়া রোগীর মাতা কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেক—বিছানায় হাত বুলাইতেছে কারণ কি। কবিরাজ কহিলেক এক দ্রব্য তত্ত্ব করিতেছে। রোগীর মাতা কহিলেন কি দ্রব্য কবিরাজ কহিলেন শিঙ্গা। শিঙ্গা কি করিবেক। কবিরাজ কহেন ফুঁকিবে আর কি করিবেক।"

এই অতি সংক্ষিপ্তি থেকে অবশ্য গল্পের মোটা কাঠামোটুকু ছাড়া আর কিছু ধরা পড়ছে না। কিন্তু সমগ্র গল্পটিতে যা আছে তা হলঃ—

(ক) সুনির্দিষ্ট প্লট এবং মিতভাষণ।
(খ) আধুনিক মন।
(গ) চরিত্র সৃজনের সুস্পষ্ট প্রচেষ্টা ও সাফল্য।
(ঘ) ডায়ালগ বা উক্তি-প্রত্যুক্তিব ঔজ্জ্বল্য।
(ঙ) মার্জিত হিউমাব।

এবং এই পঞ্চলক্ষণে মিলিয়ে নিয়ে উক্ত পত্রটিকে ছোটগল্পেব মর্যাদাই দিতে হবে। পত্রলেখক গল্পেব যে মর‍্যালটুকু দিতে চেয়েছেন, তা তো উনিশ শতকে সাধারণ ঘটনা।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত পত্রগুলির সাংবাদিক মূল্য অবশ্যই প্রথম এবং প্রধান। এ-ও ঠিকই বটে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটনার সুষ্ঠু বিবৃতি ছাড়া আব কিছু পাওনা হয না। কিন্তু কিছু গল্প পাওয়া যায়, গাল্পিক মূল্যেই যেগুলি মূল্যবান। সে-যুগের সংবাদপত্রে সাহিত্যেব স্থান ছিল না। কিন্তু কথিত গল্পগুলি সংবাদের দৈনন্দিনতাকে কিছুটা অতিক্রম করতে চেয়েছিল। এ অনুমান ভুল নয় যে, তখনকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত উক্ত পত্র-গল্পগুলি পাঠকমহলে কিছুটা কৌতূহল ও আগ্রহ উদ্দীপিত করত।

মনে বাখতে হবে—যে-সময়কাব কথা বলা হচ্ছে, তখন আধুনিক বাংলা সাহিত্য সবে জন্মলাভ করেছে। গদ্যেব খঞ্জতা তখনো ঘোচেনি। তখনো অনেক দূরে বঙ্কিম-বিদ্যাসাগবেব আশ্চর্য দিগন্ত। সে-সময়ের সদ্যাঙ্কুরিত আধুনিক মনেব যেটুকু সাহিত্যপিপাসা ছিল, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেব পণ্ডিতী বাংলাব বিদ্যাব্যবসায়ে তা মিটত না। ববঞ্চ তাব স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল এই ধরনেব ঘটনামূলক উপাখ্যান বচনার দিকে। ফলে লেখকদের উৎসাহের অভাব, অন্তত নিজেদের দিক থেকে এবং পাঠকদেব দিক থেকে কোনো দিকেই ঘটেনি। তখনো কোনো গল্পের নির্দিষ্ট মাপকাঠি তৈরি হয়নি, কেউ বলে দেযনি, কী করলে সাহিত্যপদবাচ্য গল্প বচনা সম্ভব হয়। সেই সময়ের মানদণ্ডে বিচার করতে হবে এই কাহিনীগুলিকে।

এবং সে বিচারে এরা টেঁকে। উল্লিখিত 'বৈদ্য-সম্বাদ' গল্পের কবিরাজ—চরিত্রের পরিকল্পনায় বাস্তবজ্ঞানের রীতিমতো মৌলিকতা বিদ্যমান। এই চরিত্রের পরিবেষণ কৌশলে চণ্ডীমঙ্গলেব মুরারি শীল ভাঁড়ুদত্তের কথা মনে না পড়ে পারে না। কোনো কোনো গল্পে রোমান্সের এক অস্পষ্ট পদসঞ্চারও যে পরিলক্ষিত না হয় তা নয়। বিশেষ করে কৌলীন্যপ্রথা, কন্যাপণ প্রভৃতি বিষয়গুলি এই ধরনের পত্রকাহিনীর বড়ো খোরাক ছিল। এমনি একটি ঘটনাকে অবলম্বন করে একটি কাহিনীর সাক্ষাৎ আমরা পাচ্ছি ১৮২১ সালের ১০ই নভেম্বরের সমাচারদর্পণে।

সংক্ষেপে কাহিনীটি এই—কোনো বিপত্নীক ব্যক্তি বিবাহেচ্ছায ঘটক নিয়োগ করলেন। ঘটক

ভদ্রলোকটির কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা হস্তগত করে তাঁকে এক কন্যার পিতার কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করল। কন্যার পিতাটি অর্থগৃধ্নুতায় ঘটককে ছাড়িয়ে যান। কিন্তু কন্যা দেখার সময় কন্যা পাত্রের প্রেমে পড়ে গেল। কন্যা পিতাকে চেনে। সুতরাং সে গোপনে স্নানের ঘাটে পাত্রের সঙ্গে নিজের তৎপরতায় দেখা করল। দেখা করে নিজের পিতার স্বভাবটি পাত্রের কাছে ব্যক্ত করল। তারপর দুজনে গোপনে স্থানান্তরে গিয়ে বিবাহ সম্পন্ন করে ফেলে। পরদিন যখন কন্যার পিতা বরকে কটূক্তি করতে লাগলেন, তখন কন্যা জগৎসমক্ষে বিবাহের কর্ত্রী যে সে-ই, একথা ঘোষণা করল। পিতাকেও শেষ পর্যন্ত এই "আশ্চর্য বিবাহে" মত দিতে হ'ল।

এ গল্পেরও কতকগুলি উল্লেখ্য চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আছে ঃ—

(ক) নির্দিষ্ট প্লট।

(খ) মিলনান্ত পরিণতি।

(গ) একটি 'ভিলেন' চরিত্র এবং তার পরাজয়ে গল্পের সমাপ্তি।

কিন্তু উক্ত লক্ষণত্রয়ের সঙ্গে একটি সামান্য দুর্বলতা এ গল্পের আছে। সেটা হল 'বৈদ্য-সম্বাদ' গল্পে যেমন চরিত্র-চিত্রণের সুস্পষ্ট প্রচেষ্টার দেখা পাই, এ গল্পে ঘটনার স্রোতে সে চেষ্টা হারিয়ে গেছে। সেদিক থেকে 'বৈদ্য-সম্বাদ' চরিত্র-প্রধান গল্প এবং 'আশ্চর্য বিবাহ' ঘটনারস-প্রধান গল্প।

১৮৩০ সালের মধ্যে লেখা আরো নানারকমের পত্র-রচনাকে এ-ধরনের গল্পের মর্যাদা দেওয়া যায়। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ১৮২১ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারির সমাচারদর্পণে প্রকাশিত 'বাবুর উপাখ্যান'। এটিতে সঠিক গল্প বলতে যা বোঝায়, তার কিছু ন্যূনতা আছে। চরিত্রসৃজনই এই রচনার লক্ষ্য বলে মনে হয়। সমাচারদর্পণের দুই কিস্তিতে এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮২৫ সালের ২৫শে মার্চ সংখ্যায় কন্যাপণ-বিষয়ক গল্পটিও উল্লেখযোগ্য। এই গল্পটির নাম নেই। ১৮২৮ সালের ১৪ই জুন সংখ্যায় প্রকাশিত "এক নব্যাভব্যবিবেকির বিবরণ" ব্যঙ্গগল্পের পূর্বপুরুষ বলে গণিত হতে পারে। এদের মধ্যে কোনো কোনো গল্পের পাত্রপাত্রীর কথাবার্তায় জেলার কথ্যভাষার ব্যবহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাঢ় অঞ্চলের কথ্যভাষা উক্তিপ্রত্যুক্তিতে একজন ব্যবহার করেছেন। এটা কেরি সায়েবের 'কথোপকথন'-এর প্রভাবেও হতে পারে।

মজলিস বা আসর-জমানো গল্পের সঙ্গে যোগসূত্র বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পে অল্পবিস্তর বরাবরই উপস্থিত। গল্পের মানসিক কথ্যরূপই ধীরে ধীরে তার লেখ্যরূপে পরিণত হয়। জনজীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং মনোরম বাগ্‌ভঙ্গিই ছোটগল্প-রচয়িতার দুটি প্রধান গুণ। আলোচ্য রচনাগুলির ক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্পের জন্ম মুখে মুখে বানিয়ে এবং ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের গল্পে মজলিস বা আড্ডার আবহাওয়া মোটেই দুর্লক্ষ্য নয়। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের গল্পের কথা এ প্রসঙ্গে আলাদা করে না বললেও চলে।

উদ্ধৃত কাহিনীগুলি সে কারণেই পত্রাকারে বা সংবাদাকারে রচিত হলেও ছোটগল্পের একটা অস্পষ্ট সূত্র তাদের মধ্যে আবিষ্কার করা যায়। তখন গল্পের ঘটনা বাংলাদেশে ঘটেছে। আড্ডা বা মজলিসের গল্প-জমানো বাগভঙ্গির সাহায্যে নতুন-পাওয়া গল্পের ঘটনাকে ব্যবহার করার একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এগুলি গল্প নয়। এগুলি ঊনগল্প। ভাবীগল্পের

বীজ আছে এদের মধ্যে। সাহিত্যিক সাময়িকপত্রেই ছোটগল্পের প্রথম আসর ধীবে ধীরে জমে উঠল বাংলা ছোটগল্পও পাঠকমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে বাংলা সাময়িকপত্রের পাতায় নিজের জায়গা করে নিল দেখতে দেখতে। *'বঙ্গদর্শন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র যখন এক এক সংখ্যায় স্বয়ং সম্পূর্ণ এক একটা কাহিনী—যেমন 'ইন্দিরা' বা 'যুগলাঙ্গুরীয়' লিখলেন, তখনই বোঝা যাচ্ছিল, আকারে ছোট এইসব কাহিনীগুলির পিছনে রচয়িতার শৈল্পিক অভিপ্রায়ের সঙ্গে* যুক্ত ছিল তখনকার পাঠকচিত্ত সম্বন্ধে সচেতনতাও। তবু একথা অবশ্য উল্লেখ্য যে, এইসব রচনাগুলির কোনটাই 'ছোটগল্প' নয়। হয়তো তারা বড়গল্প—হয়তো তারা নভেলেট—নিশ্চয় সন্দেহ নেই তাদের আখ্যান রসে, কোনোটি হয়তোবা কতকাংশে tale-ধর্মী। কিন্তু ছোটগল্পের স্বাদ তাতে মেলেনি। সেটা বুঝি অনেকটাই মিলল ঐ বঙ্গদর্শনের পাতাতেই ১২৮০, জ্যৈষ্ঠ, বঙ্কিম অনুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'মধুমতী'-তে। লেখক নিজে সজাগ ছিলেন না যে তাঁর কলম থেকে একটি নতুন শিল্পরূপ জায়মান হয়ে উঠছে। ভূদেব চৌধুরী মহাশয় তাঁব মনোজ্ঞ আলোচনায় ঠিকই বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার ছায়া সম্পাত ঘটেছে 'মধুমতী'-তে। তথাপি 'মধুমতী' ছোটগল্পের একটা অব্যর্থকুল লক্ষণকে অভিব্যক্ত করেছে। তা হল ছোটগল্পের অন্তর্গূঢ় পোয়েট্রি। এ কথা ঠিক যদি পূর্ণচন্দ্র জানতেন, তাঁর শিল্পকৃতির স্বাতন্ত্র্য এবং স্বনির্ভরতা কোথায়, তাহলে তিনি আরও একটু মিতবাক হতেন—বর্ণনা কমাতেন, ব্যঞ্জনাকে আরেকটু উসকে দিতেন। সম্পাদকও বুঝতে পারেননি এর শিল্পরহস্যেব মৌলিকতা। তাই 'উপন্যাস' অভিধাতেই 'মধুমতী' চিহ্নিত হয়েছে। জাতককে লালন ও তার নামকরণের দায়িত্ব নিলেন প্রায় অব্যবহিতকালে আরেকজন লেখক। তিনিও সাময়িক পত্র সেব্য গল্প লিখতে বসে এ পালা শুরু করলেন। তিনিই নাম দিলেন এই নতুন শিল্প প্রকরণটির—'ছোটগল্প'। মোক্ষম এই নামটি—যার বিকল্প আজও আমরা খুঁজে পাইনি—পাবাব দরকারও হয়নি—যিনি দিয়েছিলেন তিনিই সর্ববাদীসম্মতভাবে বাংলা ছোটগল্পেব শ্রেষ্ঠ শিল্পী—রবীন্দ্রনাথ।

আমরা দেখতে পাই সংবাদপত্রের তথ্য বা ঘটনাসর্বস্ব চিঠিগুলি ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে বাংলা আখ্যায়িকা ছোটগল্পেব রসাত্মক স্বয়ংসম্পূর্ণতা পেল। ঐ চিঠিগুলিতে—যা আমবা একটু আগে আলোচনা করেছি ঘটনারস যদি বা ছিল, গল্পরস ছিল না—শুধু তার আদল ছিল। কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যকে যে ছোটগল্পেব প্রকবণ গ্রহণ করতেই হবে, তার অলক্ষ্য ইঙ্গিত এখানে ওখানে দুর্লভ ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রেব হীরা, তাবকনাথের নীলকমল অন্যথায় উৎকৃষ্ট ছোটগল্পের উপাদান চরিত্র হতে পারতো। নানা উপন্যাসে ব্যঞ্জনাময় এমন নানা ঘটনাব দেখা মেলে যার মধ্যে নাতিদূর ছোটগল্পের পদধ্বনি শোনা যায়। কিন্তু ছোটগল্পেব শিল্পস্বাতন্ত্র্য ও রূপসৃষ্টি সম্বন্ধে সচেতনতা জেগেছে আরো পরে। ছোটগল্পের রূপশিল্পের ইতিবৃত্ত আলোচনায় আমরা জেনেছি উপন্যাস বা নাটকের মতো ছোটগল্পও একপ্রকার আলাদা রূপসৃষ্টি। আকৃতি এবং প্রকৃতিব দিক থেকে তার একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। আকারে ছোট হলেই কোন গল্পকে আমরা ছোটগল্প বলি না। 'tale' অবশ্যই গল্প। কিন্তু সেখানে ঘটনাবস্তুটাই [story of incident] মুখ্য। 'Anecdote' বা গল্পকথাও ছোটগল্প নয়, যদিও সেখানে আমরা একটা সরল এবং সুসংহত আখ্যানের দেখা পাই। একটা ভালো ছোটগল্প পড়লেই আমরা বুঝতে পারি কোথায় তার স্বাতন্ত্র্য। 'নভেল'-এর সঙ্গে ছোটগল্পের প্রধান পার্থক্য হল আয়তনে। এ্যারিস্টটল যাকে বলেছিলেন magnitude বা আয়তনগত বিশালতা,

তা উপন্যাসে আছে—ছোটগল্পে নেই। এডগার এ্যালান পো-কে কখনো কখনো বলা হয় ছোটগল্পের প্রবর্তক। তিনি অবশ্য 'ছোটগল্প' বা 'Short story' কথাটি ব্যবহার করেন নি। তিনি তাঁর গল্পগুলিকে 'Prose tale'— গদ্য আখ্যান বলে অভিহিত করেছিলেন। তিনি এইজাতীয় রচনার লক্ষণ নির্ণযকালে বলেছিলেন, একাসনে বসে দেড থেকে দুইঘন্টার মধ্যে পড়ে শেষ করে ফেলা যাবে, ছোটগল্পের আয়তন এর বেশি হবে না এবং ছোটগল্পের সমস্ত অনুপুঙ্খেরই মূল লক্ষ্য থাকবে একটাই—তা একটি অনন্যসাধারণ একক রসপরিণামকে অব্যর্থ করে তুলবে। Economy of Management বা 'নিয়ন্ত্রণের গৃহিনীপনা' ছোটগল্পের একটা বড়ো লক্ষণ। এদিক দিয়ে ভাবলে অসংহতি, অযথা বাক্যব্যয় এবং বর্ণনার আতিশয্য ছোটগল্পের শিল্পপ্রকৃতির শত্রু। পো এবং মোপাসাঁর ঘটনামুখ্য গল্পে অথবা চেখভ বা রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিসিদ্ধ গল্পে অনেক পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু ছোটগল্পের রূপান্বয়ের ক্ষেত্রে বিন্যাসের পরিমিতিবোধ রক্ষা করা একটি অবশ্য পালনীয় শর্ত। ছোটগল্প আর উপন্যাসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে নভেলা [Novella]। ছোটগল্পের ছোটত্বের একদিকের নিদর্শন বাংলাসাহিত্যের বনফুল। আবার ছোটগল্পের সীমানা পার হয়ে গল্প কখন 'নভেলা'-র দিকে এগিয়ে চলে গল্পগুচ্ছেই তার নিদর্শন 'মেঘ ও রৌদ্র' [১৩০১ বঙ্গাব্দ] এবং 'নষ্টনীড' [১৩০৮ বঙ্গাব্দ]। ছোটগল্পের সংজ্ঞা-নির্দেশে প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, যা ছোট অথচ গল্প—তা-ই ছোটগল্প। প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছিলেন, বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ রচনা ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অবশ্যই ক্ষুদ্রত্বের দিকে লক্ষ্য রেখেই কেউ গল্প লিখতে বসেন না। উপন্যাস যেমন ছোটগল্পের বৃহতীকরণ নয়, ছোটগল্পও তেমনি উপন্যাসের সংক্ষিপ্তসার নয়। লেখকচিত্তে জীবনের একটি উদ্ভাসন যা-কিছু স্পষ্ট করে তোলে, ছোটগল্পকার শক্ত মুঠিতে তার সবটুকুকে ধরে দেন। তিনি একইসঙ্গে দুই দিকে নজর রাখেন—যা বলবার আছে তার সবটুকু বলতে হবে, যা বলবার নয় তার কিঞ্চিন্মাত্রকেও আমন্ত্রণ করলে চলবে না। সমারসেট মম্ ছোটগল্পের শিল্পরূপ সম্বন্ধে বলেছিলেন—'It is complete in itself It starts with a set of circumstances, but of which the causes may be ignored ; and these consequences in their turn the cause of othe. rcumstances, are Pursued till a point is reached, when the reader is satisfied that they are the cause of no further consequences that need be considered.'

মমের এই ভাষ্য অনেক সময়েই হয়তো চেখভের সঙ্গে মিলবে না। 'The lady with the dog' গল্পের পরিসমাপ্তি যেখানে ঘটেছে, সেখানে মমের ব্যাখ্যা কার্যকর নয়। তার কারণ জগৎটা মমের নয়, চেখভের। ঘটনাবিরলতা বা ঘটনাপ্রবলতা বড়ো কথা নয়। ঘটনার জন্য কোনো কৈফিযৎ প্রদানও প্রত্যাশিত নয়। ছোটগল্পের আসল লক্ষ্য হল উদ্ভাসন।

ঘটনাশ্রয়ী ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বাংলাসাহিত্যে প্রধান লেখক ছিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় [১৮৭৩—১৯৩২]। তাঁর 'রসময়ীর রসিকতা'-র মতো গল্প যে-কোন মাপকাঠিতেই শ্রেষ্ঠ গল্প। ভাবাশ্রয়ী গল্প বা যে-গল্পের প্রধান লক্ষ্য গীতিকবিতার মতো ভাববিস্তার, বাংলা সাহিত্যে তার প্রধান পুরুষ রবীন্দ্রনাথ, প্রথম পুরুষও বটে। মার্কিন গল্পকার ও সমালোচক উইলিয়ম সারোয়ান ছোটগল্পকে সবচেয়ে স্বাধীন শিল্প বলে অভিহিত করেছেন। আন্তন চেখভ তো মনে করতেন একটা সামান্য ছাইদানি অবলম্বন করেও একটা উৎকৃষ্ট গল্প লেখা যায়। একটি সামান্য ঘটনা, কোনো একটি মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্ত অথবা কোন একটি

আবেগের উৎসারণ—সবকিছুই ছোটগল্পের বিষয় হতে পারে। রক্ষণীয় শর্ত শুধু তিনটি—এক, তাকে গদ্যে লিখিত হতে হবে। দুই, উপকরণ-বাহুল্য অবশ্যই বর্জনীয় হবে। তিন, ঘটনারই হোক বা ভাবনারই হোক, একটা নাট্যমুহূর্ত অবশ্যই থাকবে। চমৎকার বলেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, "লক্ষ্যভেদী তীরের মতো একটি পরিণামের 'মহামুহূর্ত' [ক্লাইম্যাক্স]-কে বিদ্ধ করিয়াই ছোটগল্প তাহার চরম সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।"

ছোটগল্পের উদ্ভব এবং বিকাশের ইতিহাসটি আলোচনা করলে বোঝা যায় যে, 'রিডিং পাব্‌লিক' বা পাঠক জনতার শ্রেণীগত বিকাশের একটি বিশেষ ক্ষণেই ছোটগল্পের উদ্ভব সম্ভব হয়ে থাকে। ধনতান্ত্রিক সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে ছোটগল্পের জন্মের একটি নিবিড় যোগ আছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদয়ের কালে প্রবল হয়ে ওঠে তার জীবন সম্বন্ধীয় কৌতূহল। ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সাময়িক পত্রগুলি সেই কৌতূহলেব নানা নিবৃত্তি করে। সাময়িকপত্রের পাঠকশ্রেণী তথা নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য ছোটগল্পের ভূমিকা হয়ে ওঠে অপরিহার্য। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রচারিত হয়েছিল সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' [১২৯৮ বঙ্গাব্দ]। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন। সাহিত্য সম্পাদক হিশাবে ঐ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের একটি অবশ্যকরণীয় কাজ ছিল। পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য প্রতি সংখ্যায় একটি করে গল্প লিখে চলা। 'দেনা-পাওনা' 'পোস্টমাস্টার' ইত্যাদি সাতটি গল্প এইভাবে লেখা হয়। মধ্যবিত্তের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও চেতনার জগতে যখনই নতুন কোনো অভিঘাত দেখা দেয় তখনি জন্মলাভ করেছে একটি নূতন পত্রিকা। সে পত্রিকাব গল্পগুলি সেই নূতন অভিঘাতের নিদর্শন বহন করে। 'সবুজপত্র' [১৯১৬] 'কল্লোল' [১৯২৩] প্রভৃতি পত্রিকায় যে-সব ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছে তা বিংশ শতাব্দীব বাঙ্গালি মধ্যবিত্তেব বৌদ্ধিক [intellectual] অগ্রগমনের এক-একটি মাইলস্টোন। এ থেকেই মনে হয় ছোটগল্প শুধু সনেটের মতো মুহূর্তেব মিনার নয়—তা কালের নদীর এক-একটা ঢেউ। ছোটগল্পের মতো বাস্তবের স্থিতাবস্থাকে সহসা চ্যালেঞ্জ জানাতে আর কেউ পারে না। ঔপন্যাসিককে অনেকদিন ধরে আয়োজন করতে হয়। কিন্তু ছোটগল্পকাব সাড়া দিতে পারেন অতি দ্রুত। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যে 'লক্ষ্যভেদী তীর'-এব উপমানটি ব্যবহার করেছেন, সে উপমানটি শুধু ছোটগল্পের আঙ্গিকরীতিব প্রসঙ্গেই প্রযোজ্য নয়। ঐ উপমানটির গভীরে রয়েছে আরেকটি সত্য। ছোটগল্প অতি পরিমিত বাক্যব্যয়ের ভিতব দিয়ে সটান মর্মমূলে প্রবেশ কবতে পাবে। তাই বাংলা ছোটগল্পের একই যুগে আবির্ভূত হন প্রেমেন্দ্র মিত্র ও জগদীশ গুপ্ত। নিরাবরণ মোহহীনতা দুজনের গল্পেরই প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'জননী' গল্পে জগদীশ গুপ্ত এবং 'ভস্মশেষ', 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র নির্মম নিয়তির যে আলেখ্য এঁকেছেন তা একসময়ের বাঙ্গালি মধ্যবিত্তের জীবনের দলিল। বস্তুত 'মানুষের মন কেবল অতলান্ত বিস্ময়ের আকর নয়—তার গোটা জীবন পরস্পববিরোধী প্রবণতার অভিঘাতে অপার জটিল। উপন্যাসশিল্পীর জীবনদৃষ্টি অবশ্যই পরিব্যাপ্ত। ছোটগল্পকাব ব্যাপ্তির দিকে আগ্রহী নন। তিনি তাঁর সমস্ত দৃষ্টিকে সংসক্ত করে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যাকে 'মহামুহূর্ত' বলেছেন, আর আমরা যাকে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উদ্ভাসনের ক্ষণ বলেছি, আর ড· ভূদেব চৌধুরী তাঁর বহুমান আলোচনা গ্রন্থে যাকে 'একটি বিন্দুতে একান্ত কেন্দ্রিত করা' বললেন তা স্বরূপতঃ একই কথা।

ড· শিশিরকুমার দাশ তার 'বাংলা ছোটগল্প' নামক গ্রন্থে অন্নদাশঙ্কর রায়ের একটি উক্তি

উদ্ধৃত করেছেন—'উপন্যাসকার ক্রমাগত সূতা ছাড়তে থাকেন, মাছকে অনেকক্ষণ ধরে খেলিয়ে তারপর ডাঙ্গায় তোলেন। ছোটগল্প হাউইয়ের মতো বোঁ করে ছুটে গিয়ে দপ্ করে নিভে যায়।' ঠিক এতখানি দ্রুততা শিল্পসম্ভব কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি একদা লিখেছিলেন—"চতুর্দিকব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে 'বুল্‌স আই' লণ্ঠনের আলো যেমন একস্থানে পতিত হইয়া সেই স্থানটুকুর সকল খুঁটিনাটি সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলে, ছোটগল্প রচনার কৌশল তেমনই জীবনের একটি ঘটনার উপর পতিত হইয়া তাহাকে সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করে।" এখানেও আমরা যে উদ্ভাসনের কথাটি বলেছি সেই তত্ত্বটি সমর্থিত হচ্ছে। ছোটগল্প তার প্রথম বাক্যটি থেকেই সন্ধান করছে একটি বিশেষ মুহূর্ত, একটি চরম মুহূর্ত। ড· শিশিরকুমার দাশ ঠিকই বলেছেন, 'সেখানে পৌঁছে গেলেই তার সিদ্ধি।' বস্তুত সেখানে তার সমাপ্তিও বটে। রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' [আনুমানিক ১২৯৮ বঙ্গাব্দ] গল্পের শেষ অনুচ্ছেদটির শেষ বাক্যটি গল্প সমাপ্ত হওয়ার পর বাহুল্য-উক্তি হয়েছে। রতন তারপরে কী করবে এ তথ্য এ গল্পের পক্ষে বাড়তি সংবাদ। কিন্তু 'জীবিত ও মৃত' গল্পে শেষ উক্তিটি —'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই', তার আপন সংক্ষিপ্তির মধ্যে সমস্ত গল্পটির মূল শিল্পরহস্যকে উদ্ভাসিত করে দিল। এই উক্তিটি ঐ গল্পটির মহামুহূর্ত। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে বধূসজ্জায় সজ্জিতা মিনি যখন কাবুলিওয়ালার রসিকতায় হাসল না, তখনি কাবুলিওয়ালা বুঝল তার অতীতে ও বর্তমানে কোথায় ছেদ ঘটে গেছে। ঠিক সেই সময়েই সে বুকের ভিতর থেকে বার করেছে ভুসি মাখানো কচি হাতের ছাপটি। এটাই গল্পটির মহামুহূর্ত। ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা জানতাম না যে, কাবুলিওয়ালাও কন্যার পিতা। চলচ্চিত্র-রূপায়ণে তপন সিংহ কাবুলিওয়ালার কন্যাসংবাদটি আগেই জানিয়ে দেবার ফলে ছোটগল্পের রস চলচ্চিত্রে ধৃত হতে পারেনি।

সুতরাং ছোটগল্পের শিল্পরূপ তার আপন স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত। ছোটগল্পের বিস্তার ঘটালে তার রসহানি ঘটে। তারাশঙ্করের 'না' গল্পের একটি বিস্তারিত রূপ আছে। তা নাট্যরসসিদ্ধ বটে, কিন্তু যথার্থ গল্পরসসিদ্ধ হয়নি। 'না'-এর মহামুহূর্তটি দাঁড়িয়ে আছে ব্রজরাণীর 'না'—এই উক্তির মধ্যে। ছোটগল্পের মধ্যে ছিল তার নাটকীয় দ্রুতগতি। বড়গল্পটিতে সেই গতি এলিয়ে গেছে।

জীবন-বর্ণনার ক্ষেত্রেই ছোটগল্পের নাটকীয় স্বভাব বিকশিত হয়। পাশ্চাত্ত্যের একজন ছোটগল্প-রসিক বলেছেন, ছোটগল্প "in its use of action is nearer to the drama than to the novel" জীবনের বস্তুরূপের সঙ্গে ছোটগল্পের সম্বন্ধ যেমন অবিচ্ছেদ্য, তেমনই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক উপন্যাস আর নাটকের। অবশ্য জীবন-রূপায়ণে উপন্যাস বিস্তৃতিধর্মী। অন্যপক্ষে নাটকের ধর্ম সংসক্তি। জীবনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপক সংঘাতের তীব্রতম কেন্দ্রবিন্দুতে সংহত করাই হল নাট্যকারের মুখ্য প্রয়াস। ছোটগল্পও জীবনকে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত, অর্থাৎ একটিমাত্র কেন্দ্রে সুস্থিত করে তুলতে চায়। এবং তারপর সেই অবিচল স্থিরতার গভীরে ডুব দিয়ে অনন্ত জীবনের স্বাদ গ্রহণ করাই তার শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা। ছোটগল্পের জীবন বর্ণনা তাই উপন্যাসের ব্যাপ্তির পথ পরিহার করে চলে। নাটকের কেন্দ্রাভিমুখী সংসক্তির প্রতিও এজন্য তার স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা। উপন্যাসের মতো বিস্তার ও বিশ্লেষণ ছোটগল্পের আঙ্গিকনির্মিতির পক্ষে বাধাস্বরূপ। 'পো' ঠিকই বলেছিলেন পাঠতন্ময় মুহূর্তে পাঠকের চিত্ত সম্পূর্ণভাবে ছোটগল্পের লেখকের অধিগত।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের স্ট্রাকচারের প্রথম গুণ তিনি গল্পের প্রথম বাক্যেই একেবারে গল্পের ঘটনার মাঝখানে চলে যেতে পারতেন। তাঁর ঊনশত গল্পের মধ্যে এমন একটা গল্পও নেই যেখানে তাঁর ধরতাই বিবর্ণ। তাঁর গল্পের দ্বিতীয় গুণ—ছোটগল্পের চরিত্রপাত্রদের সংলাপে তাঁর দক্ষতা। অব্যর্থতা ও পরিমিতি তাঁর গল্পের সংলাপের প্রধান বৈশিষ্ট্য। গল্পের নাটক আর গল্পের কবিতা এই সংলাপেই তিনি সিদ্ধ করে তোলেন। ছোটগল্পে জীবনোদ্‌ভাসনে এই জাতীয় সংলাপের গুরুত্ব কম নয়। কিন্তু এগুলিই রবীন্দ্রনাথের গল্পের প্রসঙ্গে শেষ কথা নয়। তাঁর গল্পের ক্ষেত্রে তিনি আমাদের জীবনের অনুমেয় অনুপুংখগুলির মাঝে কোথায় লুকিয়ে আছে অননুমেয় চরিত্রসম্ভাবনা—তাকে আবিষ্কার করেছেন বারে বারে। প্লটকে প্রবল ঝুঁকির মাঝখানে ফেলেও তাকে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে দিতে পারেন এ কারণে। এটাই তাঁর গল্পের প্রধান গুণ যে তা কখনো গল্পে নিঃশেষিত হয় না।

প্রভাতকুমার গল্প বলেছেন গল্পের জন্যই। প্রথম মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালি মধ্যবিত্তের যে নিশ্চিন্ত দিনগুলি হারিয়ে যাচ্ছিল, তার শেষ অস্তরাগ আভা ছড়িয়েছে প্রভাতকুমারের গল্পে। নিটোল গল্পেই তাঁর অনুরক্তি ছিল সমধিক। জীবনে যে নিটোলত্ব তখন আরেকটু পরেই দুমড়ে মুচড়ে যাবে, ঠিক তার আগের দিনগুলির ছবি প্রভাতকুমারকে বেশি টেনেছিল। কোর্ট থেকে শেষ বিদায়ের আগে জয়রাম মোক্তারের চিত্র যেন সেই পুরানো গোল দিনগুলিরই বিদায় দৃশ্য। রবীন্দ্রনাথের বেগ এবং আবেগের যুগল উত্তরাধিকার থেকে 'ভারতী'-র লেখকেরা অধিকতর পক্ষপাত দেখিয়েছেন আবেগের প্রতি। তার যেটুকু সুফল সেটুকু তাঁরা নিশ্চয় আমাদের দিয়ে গিয়েছেন। প্রভাতকুমার ডিকেন্সীয় কৌতুকদৃষ্টি ও সংসার অভিজ্ঞতায় আমাদের অনেক সজীবতা উপহার দিয়েছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে পরেই অস্থির হয়ে উঠল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আসন্ন অপরাহ্ণ। কালের ধূসর দিগন্তে সে সজীবতা চোখের সামনেই মুছে যেতে শুরু করেছে।

কল্লোল গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে এই সময়ে। মধ্যবিত্তের সামনে তখন বিশ্ব জোড়া মন্দা, তার সামনে তখন হতাশ্বাস গতানুগতিকতা—'অলাতচক্রে চংক্রমণ'। বিপন্নতা তাকে ভিতরে ও বাইরে তখন গ্রাস করেছে। কোন মরীচিকাও তাকে তখন আর সেধে স্বপ্ন দেখাতে এগিয়ে আসবে না। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, শৈলজানন্দ সর্বার্থে না হলেও প্রধানার্থে ভগ্নশাখ মধ্যবিত্ত নীড়ের গল্পকার। বাংলা গল্পের কালান্তর ও রূপান্তরের একটি বড়ো ধরণের পথসন্ধি এবং পথসঙ্কট তখন ঘোরালো হয়ে উঠেছে। কত বাদ প্রতিবাদ, কত স্রোত প্রতিস্রোতের সংঘাত সঙ্কুল আবর্ত তখন ফেনিল। বিচার সভা থেকে তো সাহিত্য মীমাংসা হয় না—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বিচারপতি হলেও হয় না। এক্ষেত্রেও হল না। কিন্তু তর্ক দিয়েও তো রাস্তা তৈরি হয় না—রাস্তা তৈরি হবে গল্প লিখেই। সেটাই দেখালেন তিন বাঁড়ুয্যে—বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মানিক। কিন্তু অস্থির সময়ের অভিঘাতে অনেক কিছুর সঙ্গে সঙ্গে পরিপ্রেক্ষিতও পালটে যাচ্ছিল। পালটে যাচ্ছিল বলেই পুরুষার্থও আর অপরিবর্তিত থাকছিল না। থাকছিল না বলেই জগদীশ গুপ্ত লিখেছিলেন 'রোমান্থন'-এর মতো গল্প, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'আগন্তুক'এর মতো গল্প। বিভূতিভূষণ যখন লেখেন 'ভণ্ডুল মামার বাড়ি'র মতো গল্প তখন তা হয়ে ওঠে গাল্পিক বিষয় অতিক্রমী এক ব্যঞ্জনাবহ গদ্য। ভণ্ডুল মামার বাড়ি তৈরি কোন দিন শেষ হয় না। শেষ অবধি অসমাপ্ত বাড়িটা পড়েই থাকে। আমাদের সকল অচরিতার্থতা, সকল অকৃতার্থতা ফেলে

গল্পসমগ্র

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

গল্পসমগ্র

বরযাত্রী

১

ত্রিলোচনের বিবাহ। বরযাত্রীদের মধ্যে রাজেন, কে. গুপ্ত, গোরাচাঁদ আর ঘোৎনা আসিয়া হাজির হইয়াছে, গন্‌শার অপেক্ষা ; সে আসিলেই এদিককার দলটা পূর্ণ হয়। ত্রিলোচন সাজগোজের মধ্যে এর পূর্বেও আসিয়া কয়েকবার খোঁজ লইয়া গিয়াছে, আবার তর্জনীর ডগায় একটু স্নো লইয়া মুখ বাঁকাইয়া দক্ষিণ গলাটা নির্মমভাবে ঘষিতে ঘষিতে আসিয়া হাজির হইল ; প্রশ্ন করিল, "এল ব্যা ?"

ঘোৎনা বলিল, "ওর মামা ওকে যে রকম আগলে বসে আছে দেখলাম—"

এমন সময় হালদারদের বাড়ির পাশের গলিটায় সাইকেলের ঘণ্টির আওয়াজ হইল, এবং গন্‌শা সবেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এবং সবেগেই দলটির মাঝখানে প্রবেশ করিয়া ব্রেক চাপিয়া নামিয়া পড়িল। জবাবদিহি হিসাবে বলিল, "গ-গ গন্‌শাকে আটকায়, সে এখনও মা-ম্মায়ের পেটে।"

ছোকরা একটু তোতলা ; রাগিলে কিংবা উৎসাহিত হইলে এক-একটা অক্ষর প্রায়ই দ্বিত্ব-প্রাপ্ত হয়। ডান দিকের ভ্রূটায় একটা হেঁচকা টান দিয়া সামলাইয়া লয়।

রাজেন বলিল, "তোর কিন্তু না গেলেই ভাল হত গন্‌শা। এতদিন হাঁটাহাঁটি করে সাহেব যদি বা ইন্টারভিউয়ের জন্যে আজ ডাকলে, বরযাত্রী যাওয়ার লোভে—"

ঘোৎনা বলিল, "তাতে আবার আজকাল চাকরির যা বাজার।"

গন্‌শা বলিল, "তিলুর বিয়েতে আমি যাব না ! এর পর আমার নি-ন্নিজের বিয়েতে বলবি গ-গ গন্‌শা, তোর গিয়ে কাজ নেই, তুই চা-চ্চাকরির খোঁজ করগে।"

গনেশের কথাটা বলিবার হক আছে। সে ত্রিলোচনকে তাস খেলিতে শিখাইয়াছে, সিগারেট খাইতে শিখাইয়াছে, চলন্ত ট্রামে উঠা-নামা করিতে শিখাইয়াছে, এবং নিয়মিতভাবে বায়স্কোপের সিরিয়াল-অসিরিয়ালে লইয়া গিয়া পৃথিবীর যত সিনেমা-জ্যোতিষ্কদের নাম মুখস্থ করাইয়া তাহাকে সকল দিক দিয়া নায়েক করিয়া তুলিয়াছে।

শুধু তাহাই নহে। আপাতত এ কয়দিন ধরিয়া দাম্পত্য-নীতিতে জোর তালিম দিতেছে সে-ই, এবং বিশেষ করিয়া দাম্পত্য-রাজ্য করায়ত্ত করিবার পূর্বে বাসর-দুর্গটি কি করিয়া অতিক্রম করিতে হইবে, তাহারও কৌশল-কানুন অধিগত করা হইতেছে ঐ গন্‌শারই নিকট।

ত্রিলোচন কৃতজ্ঞচিত্তে বলিল, " না না, এসে ভালই করেছিস। বউদি আবার বাসরঘরের যা ভয় লাগিয়ে দিয়েছে, ভাবছি আর গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, আর জল খাচ্ছি। যার সঙ্গে বিয়ে, সে একলাটি থাকলেই দিব্যিটি হত। কার কথার যে কী উত্তর দোব, কার কানমলা সামলাব, কে গোঁফজোড়াটা নেড়ে দেবে, তার ওপর আবার গানের ফরমাশ আছে, কারুর হেঁয়ালি আছে।"

কে. গুপ্ত ত্রিলোচনের পাশাপাশি তাহাদের ফুটবল-টীমে ব্যাক খেলে। বলিল, "তা বটে : পাঁচটা ফরওয়ার্ডকে সামলাতেই হিমসিম খেয়ে যেতে হয় !..."

ত্রিলোচন বলিল, "ছজনে মিলে, আর এ একলা। গোঁফজোড়াটা নয় ফেলে দোব গন্‌শা, যতটা হালকা হয় ! বিয়ে হয়ে গেলে আবার না হয় তখন—"

গোরাচাঁদ বলিল, "তা হলে তো নাক-কান কেটে, মাথা মুড়িয়ে বাসরঘরে ঢুকতে হয়।"

গন্‌শা বলিল, "বরং ক-ক্কন্ধকাটা হয়ে ঢুকলে তো আরও ভাল হয। দেখবে, বরের গ-গ্‌-গলারই বালাই নেই, গাইতে বলা মিছে।"

ত্রিলোচন চিন্তিতভাবে বলিল, "তোদের তামাশা বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু আমার এদিকে যে কী হচ্ছে তা—। আবার তার ওপর সকাল সকাল লগ্ন পড়ে গেছে কপালগুণে।"

কে. গুপ্ত বলিল, "খুব স্টেডি থাকবেন মশাই, নার্ভাস হলেই প্রেস করে ধরবে। একটা বড় দেখে নিতবর সঙ্গে নিলে—"

গন্‌শা একটু রাগিয়া উঠিল ; বলিল, "বা-ব্বাড়ির দারোয়ান কি গা-গ্‌-গাড়ির সহিসকে তো আর নিতবর করবে না মশাই ; সে সব আপনাদের ছা-চ্ছাতুর দেশে চলে।"

বেহারের ছেলে। সুদূর ছাপরার এক মহকুমার স্কুল হইতে পাস করিয়া কলিকাতার কলেজে পড়িতে আসিয়াছে, বাংলার ছেলেদের সঙ্গে এখনও কথায় পারিয়া উঠে না। কে. গুপ্ত চুপ করিয়া গেল।

ঘোঁৎনা বলিল, "বাসরঘরের ভয়ে যদি বিয়ে ছাড়তে হয় তো কলিশানের ভয়ে গাড়ি চড়াও ছাড়তে হয়।"

গোরাচাঁদের কথাবার্তায় প্রায়ই একটু আহার্যের গন্ধ থাকা নিয়ম ; বলিল, তা হলে কাঁটার ভয়ে মাছ খাওয়া ছাড়তে হয়।"

কবি রাজেন বলিল, "কন্টকের ভয়ে গোলাপফুল ছাড়তে হয়।"

গন্‌শা সাইকেলটা রাখিতে গিয়াছিল, আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বরযাত্রীদের মালা এসেছে ?"

ত্রিলোচন বলিল, "সে সব ঠিক আছে—মালা, গোলাপজল, এসেন্স। আর আমি যাই দেখিগে, সবাই একটু মিষ্টিমুখ করে যাবি তো ?"

গোরাচাঁদ বলিল, "হ্যাঁ, যা শীগ্‌গির যা, কী কী আছে র‍্যা ?"

ত্রিলোচনকে ফিরাইয়া ঘোঁৎনা বলিল, "আর শোন্, ওদিকে কে কে যাচ্ছে বল্ তো ? বেশি ভেজাল বাড়লে আবার ফুর্তি জমবে না।"

ত্রিলোচন বাঁ হাতের আঙুলের পর্ব গুনিতে গুনিতে বলিল, "বাবা এক, মেসো দুই, সেজপিসে, সহায়রামবাবু, এই হল চার, আর আর—"

বাংলা দেশ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কে. গুপ্ত ভয়ে ভয়ে মনে করাইয়া দিল, "একজন পুরুত যাবে না ?"

ত্রিলোচন গুনিল, "পুরুত পাঁচ, দীনে নাপতে ছয়। পুরুতমশাই নিজে যেতে পারবেন না, তাঁর কাকা ন্যায়রত্নমশাই যাবেন।"

গোরাচাঁদ একটু অস্বস্তির সহিত বলিল, "এই দুজনেও মিষ্টিমুখ করবে তো ?"

ঘোঁৎনা বলিল, "পুরুত-ঠাকুরের কাকা ? সে বুড়ো তো রাতকানা, আবার কালাও তার ওপর ; কার সঙ্গে বিয়ে দিতে কার সঙ্গে দিয়ে দেবে !"

ত্রিলোচন বলিল, "তাকে দীনে সামলাবে।"

রাজেন বলিল, "একা দীনে ব্যাটা কজনকে সামলাবে ? ওদিকে সহায়রাম চাটুজ্জের যাওয়া মানে বোতলের শ্রাদ্ধ।"

ত্রিলোচন বলিল, "সহায়রামবাবু আর সেজপিসে রাত্তিরেই চলে আসবে ; কাল তাদের আপিসের মেল-ডে কিনা, ছুটি পেলে না। আর বোতল ? দু পাঁট সাফ হয়ে গেছে, দু ডজন

চপ কাটলেট—"

গোরাচাঁদ বিরক্ত হইয়া বলিল, "কেন মিছিমিছি তিলুকে আটকাচ্ছিস সবাই ? সাজগোজে দেরি হয়ে যাবে, ভাল করে একটু সাজতে হবে তো ? কথায় বলে বরসজ্জা !....ঐ সঙ্গে কিছু চপ কাটলেট সরিয়ে ফেলগে ত্রিলোচন, ট্রেনে কাজ দেবে।"

উপর হইতে ছোট বোন ডাকিল, "দাদা, গল্প করছ, জামাকাপড় পরতে হবে না ? বউদি চন্দন-টন্দন নিয়ে বসে আছেন যে !"

গোরাচাঁদই উত্তর দিল, "তোদেব সব তাড়াতাড়ি।" ত্রিলোচনের গেঞ্জিতে একটা টান দিয়া বলিল, "আগে গিয়ে কি যেন মিষ্টিমুখের কথা বলছিলি, দেখে শুনে দিগে। তাড়াতাড়িতে ভুলে গেলে তোর মাব মনে আবার শুভদিনে একটা খটকা থেকে যাবে। ও সাজগোজের জন্যে ভাবিস নি, আজকাল আবার মেলা সাজগোজ করাটা ফ্যাশান নয়, না রে গন্‌শা ?"

গন্‌শা বলিল, "তা বইকি, আজকাল যত—"

ত্রিলোচন পা বাড়ালই, গন্‌শা হঠাৎ সামলাইয়া বলিল, "মা-ম্মালা, গোলাপজল, এসেন্স পাঠিয়ে দিগে, আর আমাব জন্যে একটা সিল্কের রুমাল আব ভা-ভ-ভালো শাল পারিস তো, পা-প্পালিয়ে এসেছি কিনা ; আর দেখ..."

ত্রিলোচন দরজাব নিকট ফিরিয়া দাঁড়াইতে গন্‌শা বাঁ হাতটা তুলিয়া সিগারেটের টিন আঁটে এই পরিমাণ একটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি মুদ্রা সৃজন করিয়া বলিল, "বা-ব্বাগাবি একটা !"

উত্তরে ত্রিলোচন বাঁ হাতের তর্জনী আব মধ্যমা আঙুল দুইটা তুলিয়া ধবিয়া হাসিয়া সংক্ষেপে বলিল, "সে হয়ে গেছে- এই !"

গন্‌শা বিরক্ত হইয়া গোরাচাঁদের দিকে চাহিয়া বলিল, "বে-ব্বেচাব! বিয়ের সময় একটু সাজগোজ করবে না তো ওর দিদিমাকে গঙ্গাযাত্রা কববার সময় কববে ? খ্যাঁটেব গন্ধ পেলে তোর জ্ঞান থাকে না গোরে ?" আমায় আবাব সা-স্‌সাক্ষী মানতে কে বলছিল র‍্যা ? একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম, অমনই 'না বে গনশা' ?"

২

যেখানে বিবাহ সে গ্রামটার মূল নাম গোকূলপুর ঃ পবে 'কালসিটে গোকুলপুরে' দাঁড়ায়। কবে নাকি গ্রামের লোকেরা এক মাতাল গোরার দলকে উত্তম-মধ্যম দিয়া এই সামরিক খেতাবটা অর্জন করে। মুখে মুখে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এখন শুধু 'কালসিটে'তে দাঁড়াইযাছে।

বরযাত্রীর দলও প্রায় গোরার মতো শত্রুস্থানীয়, তাই গ্রামে কোন বরযাত্রী আসিলেই ছেলে-ছোকরারা সুযোগমত কানে তুলিয়া দেয়, "এ জায়গাব নাম কালসিটে মশাই, একটু সমঝে চলতে হবে।"

গ্রামটা ডায়মণ্ডহারবারের কাছাকাছি স্টেশন হইতে মাইল তিন-চাব দূব।

বাড়িটা নিবিড় জঙ্গলে ঢাকা। গ্রামের সব বাড়িই এই বকম। যেখানে জঙ্গল নাই, সেখানে খানা-ডোবা ; দুই-একটা মাঝারি সাইজের পুকুরও আছে, সব জল টইটুম্বুব। জলটা ঘাটের কাছে একটু দেখা যায়, তাহার পরই ঘন সতেজ পানার কার্পেট।

সদর আর অন্দর আলাদা আলাদা, রসি দুয়েকের তফাত হইবে। উৎসব উপলক্ষে সদরবাড়ির সামনে একটি ছোট শামিয়ানা পড়িয়াছে। শামিয়ানাব চারিদিকে খুঁটিতে কাচের পাত্রে মোমবাতির নিষ্প্রভ আলো, মাঝখানে একটা তীব্রজ্যোতি গ্যাসের আলো—বকমধ্যে হংস

যথা শোভা পাইতেছে। অন্দরবাহির মিলিয়া আরও গোটাকতক গ্যাসের আলো।

শামিয়ানার মধ্যে বরের আসর। বর বিষণ্নমুখে বসিয়া আছে এবং দূরে পাড়ার কোন মেয়ের দল বাড়ির মধ্যে যাইতেছে দেখিলেই বাসরঘর স্মরণ করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিতেছে, "বাপ রে, দফা সারলে আজ !" তাহাকে ঘিরিয়া তাহার বন্ধুবর্গ। সবচেয়ে কাছে গনশা একটা মখমলের বালিশ বুকে চাপিয়া ত্রিলোচনের দিকে ঝুঁকিয়া বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে ত্রিলোচনও মুখটা বাড়াইয়া আনিতেছে এবং একটু আধটু কথাবার্তা হইতেছে।

একটু দূরে কর্তরা। বলা বাহুল্য, সকলেই অপ্রকৃতিস্থ কম-বেশি করিয়া। সহায়রামবাবু কন্যাযাত্রীদের কয়েকজনের সঙ্গে বেশ জমাইয়া লইয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য তিনি কতশত জায়গায় বরযাত্রী হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু এমন ভদ্র কন্যাপক্ষ কোথাও দেখেন নাই। নানারকম উদাহরণ দিয়া অশেষ প্রকারে কথাটা সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মুশকিল, তাহারা কোন রকমেই কথাটা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। তাহাদের মধ্যেও সব অল্পবিস্তর নেশা করিয়াছে এবং ধরিয়া বসিয়াছে, তাহারা অতি দীনহীন ইতর ; বরপক্ষীয়েরা ববং অতিশয় ভদ্র ও সম্মানার্হ, এ গ্রামে এ রকম বরযাত্রী কখনও আসে নাই।

কথাটা অমায়িক মৃদু হাস্যে, হাতজোড় প্রভৃতি বিনয়োচিত প্রথায় হইয়াছিল ; ক্রমেই কিন্তু সে ভাবটা তিরোহিত হইয়া যাইতে লাগিল, এবং একটা জেদাজেদির সঙ্গে সবার মুখ গম্ভীর হইয়া আসিতে লাগিল। ত্রিলোচনের পিসে একটু উষ্ণ হইয়া জড়িতস্বরে বলিলেন, "কেমনতর লোক আপনারা মশাই ? একটা ভদ্রলোক সেই থেকে বলছে, আপনাদের মতো ভদ্রলোক দেখি নি, তা কোনমতেই মানবেন না ? ভারি জ্বালা তো !"

এদিককার একজন তাঁহারই মতো ভারী আওয়াজে উত্তর করিল, "আর আমাদেব কথাটা বুঝি কিছু নয় তাহলে মশাই ? আমরা এতগুলো ভদ্রলোক মিথ্যেবাদী হলাম ?"

ত্রিলোচনের পিসের পোষকতা পাইয়া সহায়রামবাবুর আত্মসম্মান ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। রাগিয়া গলা চড়াইয়া বলিলেন, "কটা ভদ্রলোক আছে আপনাদের মধ্যে গুনে দিন তো দেখি, চিনতে পারছি না। ভদ্রলোকেব মান রাখতে জানেন না, আবার ভদ্রলোক বলে পবিচয় দিতে যান !"

বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে, তাঁহার উচ্চারণ আরও বেশি গাঢ় এবং অস্পষ্ট।

পিছন হইতে একটা ছোকরা শাসাইল, "এটা কালসিটে মসাই, মনে থাকে যেন !"

একটা বাড়াবাড়ি রকম কিছু হইতে যাইতেছিল, কন্যাবাড়ির লোকেবা এবং কয়েকজন বয়স্ক লোক আসিয়া তাড়াতাড়ি থামাইয়া দিল। সহায়রামবাবু আর ত্রিলোচনের পিসেকে ধরিয়া সদর-বাড়ির ঘরে উঠাইয়া লইয়া গেল, এবং ওদিককার কয়েকজনকেও সরাইয়া আসরের নিদারুণ ভদ্রাভদ্র সমস্যাটা কতক হালকা করিয়া দিল।

রাজেন তাহার নিজের লেখা কবিতা বিলি করিতে যাইতেছিল, ঘোৎনা তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে বসাইয়া দিল, কানের কাছে মুখ দিয়া বলিল, "এই, সব ক্ষেপে রয়েছে, এখন আর ঘাঁটাস নি। যারা পড়তে জানে না, ভাববে ঠাট্টা করছে।"

রাজেন ক্ষুণ্নমনে বলিল, "তাহলে এগুলো কী হবে ? এত কষ্ট করে লিখলাম ছাপালাম, কেউ পড়বে না ?"

গোরাচাঁদ আশ্বাস দিল, "ভাবিস নি, আমি কাল শেয়ালদার মোড়ে বিলি করিয়ে দোব'খন। আজকাল একটা ছোঁড়া জ্যাঠার 'সন্ন্যাসী-প্রদত্ত দদ্রুভৈরবে'র হ্যাণ্ডবিল বিলোয় কিনা, সঙ্গে একখানা করে তোর 'হর্ষোচ্ছ্বাস' দিয়ে দেবে।"

রাজেন কোন উত্তর দিল না, নাক-মুখ কুঞ্চিত করিয়া পদ্যের বাণ্ডিলটা হাতের মধ্যে ঘুরাইতে লাগিল।

ত্রিলোচন ভীতভাবে গন্‌শার দিকে মুখটা সরাইয়া লইয়া গিয়া বলিল, "দেখলি তো পিসে আর সহায়রামবাবুর কাণ্ডটা, ওঁদের আর কী ? ওঁরা দুজনেই তো এই গাড়িতে লম্বা দেবে, সব ঝোঁকটা গিয়ে পড়বে আমার ওপর। ভাবটা বুঝেছিস তো ? ব্যাটারা বাড়িতে সব মেয়েদের খবর দিতে গেল, আসরের শোধ বাসরে তুলবে।...আঃ, গোলমালে আবার গানের অন্তরটা দিলে ভুলিয়ে। তারপর কি র‍্যা গন্‌শা, 'মুহা পঙ্কজ সোঙ্‌রি' ? একটু মাথাটা সরিয়ে আন, সুর করেই বল্।"

গন্‌শা মখমলের বালিশের উপর তর্জনীর টোকা দিতে দিতে ত্রিলোচনের মুখের উপর ভাব-ব্যাকুল চোখ দুইটা তুলিয়া গুনগুন করিয়া গাহিতে লাগিল, "মুহা পঙ্কজ সোঙ্‌রি সোঙ্‌রি চিত মোর ব্যা—ব্যা—ব্যা।"

রাজেন সরিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতেছিল, এই গাঁটের মাথায় নিজের গলাটা জুড়িয়া দিল, "ব্যাকুল হোয়, নয়না নিদ জানত নেহি, মানত নেহি—"

গন্‌শা গাহিতেছিল, "জ-জ্জ-জ্জানত নে-ন্নে—"

রাজেনের হাতটা টিপিয়া বলিল, "তুই থাম, এগিয়ে যাচ্ছিস তা-ড়াতাহুড়ো করে।"

রাজেন এই রকম চারিদিকেই থাবা খাইয়া নেহাত অপ্রসন্ন ভাবে মুখটা ঘুরাইয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিল, এমন জানিলে কখনই আসিত না। গন্‌শার ব্যবহারে তাহার দুঃখটা বিশেষ এইজন্য যে গানটি তাহার স্বরচিত, যদিও গন্‌শার সুর দেওয়া। রাজেন 'বাসর তাণ্ডব' নাম দিয়া ঝালোয়ার প্রদেশের রাজপুত-কাহিনী অবলম্বন করিয়া একটা নাটক লিখিতেছে। ঝালোয়ার সামন্ত সুব্বা সিং বাসরঘরে রাজপুত বীরাঙ্গণা-পরিবৃত হইয়া অবগুণ্ঠনবতী বধূ মীরাবাঈয়ের উদ্দেশ্যে তন্ময় হইয়া গানটি গাহিতেছেন, এমন সময় খবর পাওয়া গেল, দুর্গপাদদেশে মুঘল সৈন্য।

এই সময় ত্রিলোচনের বিবাহের হাঙ্গামা আসিয়া পড়ায় নাটকটা আর অগ্রসর হয় নাই। রাজেন স্থির করিয়াছিল, রাজপুতদের জিতাইবে ; কিন্তু গন্‌শার দুর্ব্যবহারে মেজাজটা অত্যন্ত তিক্ত হইয়া যাওয়ায় মনে মনে ভাবিতেছে, গনেশশঙ্কর নাম দিয়া একটা তোতলা দাগাবাজ ব্রাহ্মণকে দাঁড় করাইয়া রাজপুতবাহিনীকে মুঘলের হাতে বিধ্বস্ত করাইয়া দিবে।

গোরাচাঁদ কে. গুপ্তকে বলিতেছিল, "লুচি ভাজার গন্ধ বেরুচ্ছে, কি রকম খাওয়াবে কে জানে !"

এমন সময় ত্রিলোচনের পিতা ডাক দিলেন, "বাবা গোরাচাঁদ, শুনে যাও একটা কথা।"

গোরাচাঁদ কাছে গিয়া বসিল। ত্রিলোচনের পিতার চোখ দুইটি বেশ একটু রক্তাভ, বেশ অনায়াসেই যে চাহিয়া আছেন এমন বোধ হয় না। গোরাচাঁদের কাঁধের উপর কোমলভাবে স্পর্শ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "বাবা, আমার ত্রিলোচন আর তোমরা কি আলাদা ?"

গোরাচাঁদ এ প্রশ্নের কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইল না ; কিন্তু প্রশ্নকর্তার অবস্থা দেখিয়া সহজে অব্যাহতি পাইবার আশায় উত্তর করিল, "আজ্ঞে না, আমরা সবাই আপনার ছেলের মতন, কিছু তফাত নেই তো। তিলু'কে নিজের ভাই জেনেই তো এসেছি সব।"

"তা হলে একটি কথা, কেউ তোমরা এখানে অন্নস্পর্শ কোরো না আজ।"

গোরাচাঁদ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ আবার কি ফ্যাসাদ ! একটু চুপ করিয়া থাকিবার পর তাহার একটা সম্ভাবনার কথা মনে হইল : বলিল, "আজ্ঞে, আমরা যা ত্রিলোচনও

তাই ; কিন্তু ওর আজকে বিয়ে বলে কিছু খেতে নেই, আর আমরা তো শুধু বরযাত্রী হয়ে এসেছি কিনা—"

"সেজন্যে নয়। এদের আক্কেলটার কথা ভাবছি, আমাদের কি অপমানটা করলে দেখলে না ? আমি যৎপরোনাস্তি রেগেছি গোরাচাঁদ ; এই আমি আর তোমাদের মেসো বসে আছি, বর তুলে নিয়ে যাক তো আমাদের সামনে থেকে !"

গোরাচাঁদ ভীত হইয়া বলিল,"আজ্ঞে, সেটা কি ভাল হবে ? খেতে বারণ করেন সে কিছু শক্ত কথা নয়, কিন্তু এরা যেরকম অবুঝ আর বেয়াক্কেলে লোক দেখছি, বর উঠতে না দিলে একটা হাঙ্গাম—"

"ওরে, এই দিক পানে ; অন্দরে নিয়ে যা, ওই দিক দিয়ে ঘুরে যা !"

কয়েকটা ভারী দই-ক্ষীরের তিজেল বাঁকে লইয়া একবার এদিক একবার ওদিক করিতেছে, কর্তাগোছের একজন তাহাদেরই নির্দেশটা দিল। গোরাচাঁদ সতৃষ্ণনয়নে দেখিয়া লইয়া বলিল, "কি যে বলছিলাম ? হ্যাঁ, বর না উঠতে দিলে একটা হাঙ্গাম—এমন কি, না খেলেও একটা রীতিমত হাঙ্গাম করতে পারে। তাই বলছিলাম—"

ত্রিলোচনের পিতা গন্‌শাকে ডাক দিতে যাইতেছিলেন, গোরাচাঁদ ত্রস্তভাবে বলিল, "আমি দিচ্ছি ডেকে, আপনি কষ্ট করতে যাবেন কেন ? হ্যাঁ , ও বরং চালাক আছে, যা বলে—

গিয়া গন্‌শাকে বলিল, "তিলুর বাবা ডাকছেন রে।" একটু চাপা গলায তাড়াতাড়ি টিপিযা দিল, "দেখিস যেন আত্মীয়তা করতে যাস নি ; তা হলে আমার মতন বেকাযদায় ফেলে খাওয়া বন্ধ করবে, ভয়ানক খাপ্পা হয়েছে এদের ওপর।"

এই সময় কন্যাকর্তা গলায গামছা দিয়া করজোড়ে বরের আসরের কাছে আসিযা দাঁড়াইলেন। সাধারণভাবে সভাস্থ সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এইবারে বরকে নিয়ে যাবার—। কই, বেহাইমশাই কোথায ? এই যে—"

কাছে গিয়া বলিলেন, "তা হলে দাদা, অনুমতি দিন এইবার।"

গোরাচাঁদ গন্‌শা ত্রিলোচন সকলেই রুদ্ধশ্বাসে একটা বিষম দুর্ঘটনাব অপেক্ষা করিতে লাগিল। ত্রিলোচনের পিতা একটু চুপ করিযা রহিলেন, তাহার পর ধীরে-সুস্থে উঠিযা কন্যাকর্তাকে বুকে জড়াইয়া গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "তিলু তো তোমারই ছেলে ভাই, আজ যদি — ওফ !"—গলাটা অশ্রুরুদ্ধ হইয়া পড়ায় আর বলিতে পারিলেন না।

যাইবার সময ত্রিলোচন বন্ধুদের দিকে একটা বিপন্ন অসহায় ভাবের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেল। কে. গুপ্ত একটু কাছে ছিল, সাহস দিয়া বলিল, "যান, ভগবান আছেন।"

বর চলিয়া গেলে গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি ত্রিলোচনের পিতার নিকট গেল ; ডাকিল, "জ্যাঠামশাই !"

ত্রিলোচনের পিতা শোকাচ্ছন্নভাবে মাথাটা হাতের তেলোয় ধরিয়া বসিয়া ছিলেন, মুখ তুলিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন, "কে গোরাচাঁদ ? গোরা রে, আজ যদি বাবা বেঁচে থাকত—ওফ !"

গোরচাঁদ বলিল,"আজ্ঞে হ্যাঁ। বলছিলাম, আর তবে না-খাওযার হাঙ্গামাটাও করে কাজ নেই, কি বলেন ? যখন মিটেই গেল—"

৩

বর চলিয়া গেলে কন্যাপক্ষের একজন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,"বরযাত্রীদের মধ্যে কারা এই গাড়িতে ফিরে যাবেন যেন ?"

ঘোঁৎনা বলিল, "হ্যাঁ, সহায়রামবাবু আর বরের পিসেমশাই, তাঁরা ঐ ঘরে রয়েছেন।"

প্রশ্নকর্তা বলিল, "দুজন তা হলে ? বলেন তো আপনাদের সবারই জায়গা করে দিই : কজন আছেন সব মিলিয়ে ?"

গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি সামনে আগাইয়া বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয ! আছি, আমি এক, ঘোঁৎনা দুই—

গন্‌শা নিচু গলায ধমক দিয়া বলিল, "খা-খ্ খালি খালি খাই খাই, স্ত্রী-আচার দেখবি নি ? রাজুকে খোঁ-খ্ খোঁজ নিতে পাঠালাম কি করতে ?...আজ্ঞে না, আমরা একটু ফুর্তি-টুর্তি কবি, খাওযা তো রোজই—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ঠিক, একটু আমোদ-আহ্লাদ, গান-বাজনা করুন।...কই হে, এঁদের ডেকে নাও তোমরা। শিবপুব থেকে এসেছেন, গান-বাজানব দেশ ; বলে, গাইযে বাজিযে শূর, তিনে শিবপুর..."

সভার এক দিকে গান-বাজনা হইতেছিল।এক চুড়িদার-পাঞ্জাবি-পবা ছোকবা শীর্ণ কাঁধের উপর কেশভারাক্রান্ত মাথাটা প্রচণ্ড বেগে নাড়িয়া নাড়িয়া গান গাহিতেছে, সাত-আটটি সমবযসী মন্দিরা বাজাইয়া, শিস দিযা, হাততালি দিযা, তুড়ি বাজাইয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতেছে। আশপাশের আর সকলে সমস্ত দলটির মৃত্যুকামনা করিতেছে।

ভদ্রলোকের কথায একজন বলিল, "আমরা তো তাই চাই। আপনাবা দযা করে—"

গন্‌শা সবার মুখপাত্র হইয়া বলিল, "মা-স্মাপ করবেন ; আমাদেব মধ্যে কেউ গা-গ্ গাইতে জানে না।"

ওদিককার একজন বলিল, "সে কথা শুনব কেন মশাই ? সাদা কথাতেই আপনার অমন গিটকিরি বেরুচ্ছে, গাইতে বসলো—"

অপর এক ছোকরা জুড়িয়া দিল, "গিটকিরি ছাড়া তো কিছু বেরুবেই না।"

গন্‌শা একটা রাগারাগি গণ্ডগোল করিতে যাইতেছিল, রাজেন আসিয়া ধীরে ধীরে তাহার কাঁধে হাত দিয়া চাপা গলায় বলিল,"হাঁড় কখানির মাযা রাখ ?"

গন্‌শা ফিরিয়া বলিল, "কেন, কি হয়েছে ?"

"তাহলে স্ত্রী-আচার দেখবার নাম করো না, যা করে বেঁচে এসেছি, আমিই জানি। বাইরে দাঁড়িয়ে যাব কি না যাব ভাবছি, একটা কেলে রোগা ছোঁড়া এসে বললে, ভেতরে চলুন না, বাইরে কষ্ট করছেন কেন ? সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, হঠাৎ কোথা থেকে এসে কাঁধেব উপর হাত দিয়ে—কে মশাই আপনি ? ফিরে দেখি, ইয়া লাস, আমার পায়ের গোছ তার হাতের কব্জি। পবে একজনের কাছে খবর নিয়ে জানলাম, কনের কাকা, নাম জগুদা। থতমত খেয়ে বললাম, বরযাত্রী—স্ত্রী-আচার দেখছি।"

"শুনে সুখী হলাম। একলা যে ?"

"বললাম, 'তারা আসব আসব করছে'।"

"শুনে সুখী হলাম, তাঁদের ডেকে নিয়ে আসুন। একটিতে আমার হাতের সুখ হবে না।...কালসিটেতে এসে স্ত্রী-আচার দেখবে ? মাতলামির আর জায়গা পাও নি ?"

"আমি তো ভযে কেঁচোটি হয়ে সুড়সুড় করে বেরিয়ে এলাম। দেখি,সেই হারামজাদা

ছোঁড়াটা কোণে দাঁড়িয়ে মুচকে মুচকে হাসছে : যদি কখনও শিবপুরে পাই ব্যাটাকে—"

গান-বাজনার কথা লইয়া গন্শার রাগটা চড়িয়াই ছিল, আরও ক্ষিপ্ত হইয়া বলিল, "ইডিয়ট ! ভী-ভ্ ভীরু কোথাকার ! বি-ব্বিয়ে দেখতে এসে যদি স্ত্রী-আচারই দেখলাম না তো— । চল্ সবাই, দে-দ্দেখি কে কি করে !"

গন্শা দৃপ্তভাবে পা ফেলিয়া অগ্রণী হইল, আর সবাই সাহস এবং উৎসাহের অনুপাতে আগু পিছু হইয়া চলিল। রাজেন শুধু ভীরু অপবাদটা দূর করিবার জন্য গন্শার পাশে রহিল।

সদর ছাড়াইয়া একটু দূরে যাইতেই তাঁহার সঙ্গে দেখা। গায়ে একটা সোয়েটার মাত্র, সবল পেশীগুলো জাগিয়া আছে। একটা গামছা কাঁধে ফেলিয়া এদিকেই আসিতেছিলেন, রাজেন দূর হইতে চিনাইয়া দিল ; অবশ্য চিনাইয়া না দিলেও কোন ভুল হইত না।

কাছে আসিয়া রাজেনকে লক্ষ্য করিয়া একটা খসখসে গম্ভীর আওয়াজে বলিলেন, "এই যে, সবাইকে ডেকে এনেছেন !"

রাজেনের মুখটা ফ্যাকাশে হইয়া গেল, আমতা-আমতা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে না, মানে হচ্ছে এরাই সব বললে—"

ঘোঁৎনা আগাইয়া আসিয়া বলিল, "গোরাচাঁদ বললে, বরং খেয়ে নিলে হত ; আমি বললাম, তা হলে কনের কাকাকে গিয়ে বললেই হবে, তিনি সব করছেন কম্মাচ্ছেন--"

রাজেন বলিল, "আমি বললাম, আর জগুদা লোকও বড় ভাল।"

গন্শা বলিল, "লো-ল্লোক ভাল শুনে আমি বললাম, চ-চ্চল তা হলে আম্মো যাই, জগুদার সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয়ও হবে। সে-স্সে একটা মস্ত সৌভাগ্য কিনা।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "বেশ বেশ ; কিন্তু দু-একটা জিনিস এখনও বাকি আছে। যদি ক্ষিদে পেয়ে থাকে তো গোরাচাঁদবাবু না হয়—"

ঘোঁৎনা বলিল, "সেই খুব ভাল কথা। গোরাচাঁদ, তুই তা হলে— । কোথায় গেল গোরাচাঁদ ?"

শুরুতেই যেই ঘোঁৎনা 'গোরাচাঁদ বলল' বলিয়া আরম্ভ করিয়াছিল, গোরাচাঁদ বহির্মুখী একটি ছোট্ট দলে ভিড়িয়া বেমালুম সরিয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে পাওয়া গেল না।

ভদ্রলোক চলিয়া গেলে কেহ আর কোন কথা কহিল না। শুধু কে.গুপ্ত একটু ছাপারেয়ে ইডিয়ম মিশ্রিত করিয়া বলিল, "খুব হট্টাকট্টা জোয়ান, গ্র্যাণ্ড ফুল ব্যাক হয়, গোষ্ঠ পালের জোড়া !"

আরও ঘণ্টা দুয়েক কাটিল। দলটা খানিকটা স্রোতের কুটাকাঠির মতো এদিক সেদিক করিয়া কাটাইল। দুই একজন সহায়রামবাবুদের সঙ্গে চলিয়া যাইতেও চাহিল ; বাকি সবাই তাহাদের আটকাইয়া রাখিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই আবার আসরে আসিয়া জুটিল। ভাঙা আসর, এখানে সেখানে এক-আধজন শুইয়া গড়াইয়া আছে। আশেপাশের লোক বিরল, আলোও বেশির ভাগ নির্বাপিত। গোরাচাঁদ একটা বালিশের উপর কাত হইয়া বলিল, "খাইয়েছে মন্দ নয়, তবে একটু একটেরেয় পড়ে গিয়েছিলাম, এই যা।"

খানিকক্ষণ খাওয়ার আলোচনাই চলিল।

গোরাচাঁদ আবার বলিল "রাজু তোর পদ্যটা পড় তো একটু, শুনি। গোড়াটায় বেশ লিখেছিস—'আজকে সখা দিল-পেয়ালায় ফুর্তি-সরাব উছলে ওঠে' !"

ঘোঁৎনা বিরক্তভাবে বলিল, "আরে দুৎ, উছলে ওঠে ! তিলুর বিয়েটা জমতেই পেলে না,

পদে পদে বাধা ; এ যেন—। গন্‌শা কোথায় ? দেখছি না যে ?"

রাজেন বলিল, 'তাই তো !"

শুইয়া বসিয়াই চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল।

কে.গুপ্ত হঠাৎ ঘোঁৎনার কাঁধটা নিজের কাছে টানিয়া বলিল, "দেখুন তো, গণেশবাবুর মতোই না ?"

ঘোঁৎনা বলিল, "তাই তো বোধ হচ্ছে ; অন্ধকারে ওখানে কি করছে ছোঁড়া ?"

সদর-বাড়ির বাঁ দিক দিয়া একটা রাস্তা স্টেশনের দিকে গিয়াছে এবং তাহারই একটা সরু ফেঁকড়া ঘন বনজঙ্গল রাবিশ প্রভৃতির মধ্য দিয়া অন্দর-বাড়ির পিছন দিকে হারাইয়া গিয়াছে। সেই রাস্তাতেই একটা বিচালির গাদার আড়ালে গন্‌শাকে দেখা গেল, অতি সন্তর্পণে চারিদিকে সর্তক দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে আসিতেছে। বিচালিটা পার হইয়া বেশ সহজ ভাব ধারণা করিল। দলের মধ্যে আসিয়া উৎসুক প্রশ্ন নিবারণ করিয়া চাপা গলায় বলিল,"চুপ !"

বলিয়া নিজেও একটু চুপ করিয়া রহিল। ঘোঁৎনা তাহার কাপড় হইতে একটা চোরকাঁটা ছাড়াইয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, "কোথায় গিয়েছিলি রে গন্‌শা ?"

গন্‌শা মুখটা একটু নিচু করিল, সবাই ঘেঁষিয়া আসিল বলিল, "তি-ত্রিলুর বাসরঘর দেখে এলাম।"

'সে কি !' 'দুৎ, মিছে কথা !' 'মাইরি ?' —বলিতে বলিতে সবাই আরও ঘেঁষিয়া আসিল : কে. গুপ্ত বলিল, "ত্রিলোচনবাবু আছেন তো ?—কানটান—জামায় রক্তটক্ত—"

"আপনার ত্রিলোচন এখন সহস্র-লোচন ইন্দ্র হয়ে বসে আছে, চা-চ্চারিদিকে অপ্সরী, কিন্নরী, ঠানদিদি !"

রাজেন কল্পনায় চিত্রটা আঁকিয়া লইয়া বলিল, "উঃ, যেতে হবে মাইরি !"

গন্‌শা জানাইয়া দিল, অভিযানটা বেজায় শক্ত। সরু রাস্তাটা একটু গিয়া আর নাই। তাহার পর দূরের গান বাজনা আর মাঝে মাঝে হাসির শব্দ লক্ষ্য করিয়া, ঘন আগাছার মধ্য দিয়া ছাই, গোবর, ভাঙা ইঁট, সুরকির গাদা প্রভৃতির উপর দিয়া বাড়ির পিছন দিকে পৌঁছিতে হইবে। সে আরও মারাত্মক জায়গা, চাপা জঙ্গল, ঘুটঘুটে অন্ধকার। দুইটা ঘর পার হইয়া বাসরঘরটা। খড়খড়ি দেওয়া পাশাপাশি দুইটা জানালা শীতের জন্য বন্ধ। একটার জোড়ের কাছটা একটু ফাঁক হইয়া গিয়াছে, আর অন্যটাতে একটা খড়খড়ির নিচের দিকে একটা ছোট্ট ফালি উড়িয়া গিয়াছে। "ভ-ভগবানের দয়া"—বলিয়া গন্‌শা বিবরণ শেষ করিয়া প্রশ্ন করিল, "বো-বোঝ : চাও যেতে কেউ ?"

ঘোঁৎনা বলিল, "আলবত যাব, এর আর বোঝাবুঝি কি আছে ?"

কে. গুপ্ত বলিল, "সাপখোপ—"

ঘোঁৎনা ধমক দিয়া বলিল, "রাত্তিরে ঐ নাম করছেন ? আচ্ছা কাঠগোঁয়ার তো !"

কে. গুপ্ত ধাঁধায় পড়িয়া চুপ করিয়া গেল।

গন্‌শা বলিল, "তবে হ্যাঁ, জঙ্গলের ওদিকে খানিকটা ফাঁকা মা-ম্মাঠ আছে, যদি তাড়া করে তো—"

গোরাচাঁদ প্রশ্ন করিল, "কি দেখলি জানালার ফাঁক দিয়ে গন্‌শা ? এক ঘর বুঝি সব সুন্‌—"

রাজেন বাধা দিল, "থাক, বর্ণনা করলে আবার বাসি হয়ে যাবে !"

"সে করাও যায় না !"—বলিয়া গন্‌শা সকলের উৎসুক কল্পনাকে একেবারে চরমে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল।

দুইটা জানালার মধ্যে হাত চারেকের জায়গা। একটা রাজেন আর গন্‌শা, অপরটা ঘোৎনা আর কে. গুপ্ত দখল করিল।

পথে গোরাচাঁদের পা দুইটা হাঁটু পর্যন্ত একটা গোবরগাদায় ডুবিয়া গিয়াছিল। গন্‌শার কানের কাছে ফিসফিস করিয়া বলিল, "ওরে গন্‌শা, বড্ড কুটকুট করছে ; উঃ, কি করি বল্ তো ?"

গন্‌শার মন তখন অন্য রাজ্যে। একটি ষোড়শী আসিয়া কনের মুখের ঘোমটা তুলিয়া ত্রিলোচনকে বলিতেছে, " এই দেখ ভাই। আহা, বেচারী এইজন্যে মনমরা হয়েছিল গো। দেখ দিকিন কেমন !"

গোরাচাঁদ গন্‌শার কাঁধটা একটু টিপিয়া বলিল, "শুনেছিস ? গেলাম, গেলাম মাইরি, গোবরটা নিশ্চয় পচা ছিল।"

গন্‌শা ছিদ্রপথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অন্যমনস্ক ভাবে প্রশ্ন করিল, "কি করে জানলি ?"

গোরাচাঁদ খিঁচাইয়া বলিল, "কি করে জানলি ! ভয়ানক কুটকুট করছে যে পা দুটো।"

গন্‌শা চোখ দুইটা ছিদ্রপথে আরও ভাল করিয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

গোরাচাঁদ নিরাশ হইয়া অপর জানালায় চলিয়া গেল, ঘোৎনার জামার খুঁটে একটা টান দিয়া বলিল, "ঘোতু, পচা গোবরের কোন রকম ওষুধ—"

"না, হয় না ; ফেলে দে।"—বলিয়া ঘোৎনা তাড়াতাড়ি আবার দৃষ্টিটা গবাক্ষবদ্ধ করিল।

ষোড়শী ঢলঢলে চোখ দুইটি তখন বরের মুখের উপর রাখিয়া আবদারের সুরে বলিতেছে, "হ্যাঁ ভাই বর, অমন চাঁদপানা মুখখানা দেখিয়ে দিলাম, মজুরি হিসেবেও একখানা গান—"

একটি কিশোরী বলিল, "হ্যাঁলা সরীদি, জানিস না, দয়া করলে কি আকে রস দেয় ? কানে মোচড় না দিলে কি গান বেরোয় ?"

ঘোৎনা কে. গুপ্তকে টিপিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "দেখলেন, ঐটুকু মেয়ে অবলীলাক্রমে বিদ্যাসুন্দর আউড়ে দিল !"

কে. গুপ্ত প্রশ্ন করিল, "সে আবার কি ?"

ঘোৎনা মুখ ঘুরাইয়া মনে মনে বলিল, "তোমার মুণ্ড, কাটখোট্টা !"

ওদিকে রাজেন গন্‌শাকে প্রশ্নে প্রশ্নে বোঝাই করিতেছিল, "পোষ মাসে বিয়ে হয় না, না রে গন্‌শা ? ধর যদি তেমন জরুরি হয় ? আচ্ছা মাঘ মাসে ? মাসের গোড়ায় দিনটিন আছে কিনা খোঁজ রাখিস্ ?"

ঘরের ভিতর কানমলার অনেকগুলি সমর্থনকারিণী জুটিয়া গেল। ত্রিলোচন ভয়ে ভয়ে হাত বাড়াইয়া বলিল, "থামুন, আমি গাইব, তবে কথা হচ্ছে, গানের অন্তরটা হারিয়ে যাচ্ছে, বাংলা নয় কিনা। যদি একবার ভেতরের বারান্দায় গন্‌শাকে ডাকিয়ে পাঠান তো—"

গন্‌শা তাড়াতাড়ি মুখটা সরাইয়া লইয়া অতিরিক্ত উৎকণ্ঠার সহিত ফিসফিস করিয়া বলিল, "কি সর্বনাশ বল্ দিকিন ! ইডিয়ট ! এক্ষুনি ওদিকে ডাক পড়বে, এখন কি করা—"

রাজেন দেখিতেই ছিল, হাতটা একবার 'না'স ভঙ্গিতে নাড়িয়া গন্‌শাকে টানিয়া লইল। গন্‌শা শেষের দিকটা শুনিতে পাইল, "আমরা গন্‌শা কি ঢ্যাপসা, এদের ডাকতে যাই আর কি !—"

গোরাচাঁদ গন্‌শা আর রাজেনের মাঝখানে মুখটা গুঁজিয়া দিয়াছিল। হঠাৎ পায়ের চিড়চিড়ানিটা বাড়িয়া যাওয়ায় একরকম নাচিতে নাচিতেই সরিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে গন্‌শাকে

টানিয়া লইয়া চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "আবার চাগিয়েছে রে, গেলাম মাইরি !"

"তুই সব মাটি করলি ; আয় তো এদিকটায় ফাঁকায় একটু সরে। সেই মেয়েটা এতক্ষণ বোধ হয়—"

পাশেই হঠাৎ দুয়ার খোলার আওয়াজ হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই একরাশ এঁটো পাতা, খুরি, গেলাস দুইজনের মাথায় কাঁধে পিঠে সজোরে আছড়াইয়া পড়িল। তাহার পর তাহাদের ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই, "ওগো বাবা গো, ডাকাত !"—বলিয়া স্ত্রীকণ্ঠে একটা চীৎকার, ঝনাৎ করিয়া দুয়ার বন্ধ, সশব্দে পতন, গোঙানি, বিভিন্ন কণ্ঠে হাঁকাহাঁকি, বিভিন্ন দিকে ছুটাছুটি, সবগুলা যেন একমুহূর্তে সংঘটিত হইয়া বাড়িটাকে তোলপাড় করিয়া তুলিল।

দলটার যে যেখানে ছিল, একটু হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিবার সময় নাই, শুদ্ধ জীবধর্মের প্রেরণায় কাজ। কোন রকমে বাঁচিতে হইবে, যেমন করিয়া হোক না কেন।

কে.গুপ্ত যেদিক হইতে আসিয়াছিল, সোজা সেই দিকে ঘুরিয়া ছুট দিল ; সদরের দিকে নয়, একেবারে সোজা।

"ঐ পালায়, পেছু নাও !"

"উত্তর দিকে ছুটেছে !"

ঘোৎনা পলাইবার উপক্রম করিয়া ঘুরিতেই একটা গাছে ধাক্কা লাগিল। বোধ হয় পেঁপে গাছ, খুব মোটা।

ওদিকে কে হাঁকিল, "না, বন্দুক না নিয়ে বেরিও না ; খবরদার ! টোটা ভরে বেরুবে।"

ঘোৎনা তরতর করিয়া পেঁপেগাছটার উপর উঠিয়া পড়িল। একটু উপরে উঠিয়াই টের পাইল, কতকগুলা ডাল বাহির হইয়া একটা ঝোপ ; আপাতত সেখানটায় একটু থামিল।

গনশা গোরাচাঁদের কোমরের ব্যাপারটা টানিয়া বলিল,"স-সসামনেই ফাঁকা মাঠটা, শীগগির নেমে পড।"

রাজেন বলিল, "তার চেয়ে চেঁচিয়ে বল, আমরা বরযাত্রী।"

"তুই আলাপ ক-করগে মুখ্যু।—বলিয়া গনশা গোরাচাঁদকে একরকম টানিতে টানিতেই পা বাড়াইল।

পাশেই বাসরঘরে একটু যেন ধস্তাধস্তি হইতেছে। একজন বয়স্কার গলার আওয়াজ, "ওরে না না, জানালা খুলিস নি, ওদের হাতে বন্দুক থাকে, ওরে অ নীহার ! কি নির্ভয় মেয়ে সব বাবা আজকালকার।"

জানালাটা টানা হিঁচড়ানির মধ্যে খুলিয়া গেল। রাজেন এক রকম লাফ দিয়াই গনশা আর গোরাচাঁদকে ধরিয়া ফেলিল। তাহার পরেই পাতলা আগাছাটার মধ্য দিয়া ছুট। হাত কয়েক পরে জমিটা সামনে একটু নামিয়া গিয়াছে, তাহার পরেই ফাঁকা। তিনজনে ঢালুটুকু একরকম লাফ দিয়াই কাটাইল ; পরক্ষণেই ঝপাং ঝপাং ঝপাং করিয়া তিনটা শব্দ।

"ওরে পুকুরে পড়েছে—খিড়কির পুকুরে, তিনটে !"

খিড়কির দরজা খুলিয়া গেল।

"লালঠেনে হবে না, গ্যাস-লাইটার নিয়ে আয়।"

"একটা টর্চ হলে হত,—বরযাত্রীদের কাছে একটা আছে, নিয়ে আয় ; তারা ঘুমোচ্ছে বোধ হয়, জাগিয়ে দে।"

তিনজনে প্রাণপণে সাঁতার কাটিতে লাগিল। রাজেন চাপাস্বরে বলিল, "এই তোর মাঠ ? কী ভীষণ পানা রে বাবা ! উফ !"

গন্‌শা বলিল."ঘা-ঘ্ ঘাস ভেবেছিলাম। ডুব-সাঁতার কাট্।"

সমস্ত পাড়ায় সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বেটাছেলের গলার আওয়াজ ক্রমেই বেশি শোনা যাইতেছে। নানা রকম প্রশ্ন, উত্তর, হুকুম।

"এই পুকুরে ?"

"হ্যাঁ, ঘিরে ফেল। লাঠি শড়কি যাই হোক সবাই একটা একটা হাতে রেখো, ভয়ঙ্কর লাস এক-একটা।"

"রঘো বাগ্‌দীকে খবর দেওয়া হয়েছে ?"—এটা যেন জগুদার স্বর।

এক কোণ হইতে গগনবিদারক আওয়াজ আসিল, "এজ্ঞে, এই যে মুই রামদা নিয়ে রয়েছি। নেমে পড়ব ?"

এপার হইতে উত্তর হইল, "না, ঘিরে ফেল চারিদিক থেকে।...ওরে,কুকুর দুটোকে খুলে দে।"

"দেখতে পাচ্ছ কেউ ?"

রঘো বলিল, "যেন তিনটে মাথা ওদিকপানে।..."

গন্‌শা ডুব দিল।

"দুটো !"

রাজেন ও গোরাচাঁদ ডুব দিল।

"গোঁত্তা দিয়েছে সব।"

"নজর রাখিস।"

রাজেন মুখ তুলিয়া প্রশ্ন কবিল, "কতক্ষণ ডুবে থাকা যায় ?"

গোরাচাঁদ প্রতিপ্রশ্ন কবিল, "কতক্ষণ ভেসে থাকা যায় ? আমাব পেটে জাযগাই ছিল না,—তার ওপর জল।"

রাজেন বলিল, "পানার জল।...উঃ, কি কামড়ায রা্য !"

গন্‌শা বলিল, "মা-ম্মাছ—বোধ হয পো-প্লোযা মাছ।"

রাজেন বলিল, "উঃ, পোম্নাই বটে ওদের, ছিঁড়ে ফেললে।"

গোরাচাঁদ বলিল, "আবার পচা গোবরের চার পেয়েছে কিনা ?"

যে টর্চ আনিতে গিযাছিল, খিড়কির নিকট হইতে চেঁচাইযা বলিল, "বরযাত্রীরা তো নেই জগুদা, দু-জন খালি মদ খেযে নাক ডাকাচ্ছে। ডাকাত পড়েছে বলতে বললে, পড়ে থাক, উঠিও না।"

পুকুরের এদিক হইতে জগুদার কর্কশ আওযাজ হইল, "আপনারা তা হলে কোন দিকে আছেন মশাই ? একবার টর্চটা বের করুন না ?"

অপর একজন বলিল, "তারা আবার এই সময কোথায গেল ? পরের ছেলে—ভাববার কথা তো।"

গোরাচাঁদ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "এই গনশা, এই তালে জানিযে দে, আমরা এখানে, কোন ভাবনা নেই।"

রাজেন বলিল, "আর টর্চটা ভিজে গেছে।"

গন্‌শা বোধ হয় জানাইতে যাইতেছিল, কিন্তু ঠিক এই সময়ে পাশে একটা ঢিল আসিয়া পড়ায, সে সঙ্গে সঙ্গে জলের মধ্যে ডুবিয়া পড়িল।

"ঐ যে ঐখানেই একটা ঘায়েল হয়েছে !"—সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটা ছোট বড় ঢিল

আসিয়া আশপাশে পড়িল। একটা বন্দুকের আওয়াজও হইল।

আর দেরি করা চলে না। গোরাচাঁদ হাঁপাইতে হাঁপাইতে চেঁচাইয়া বলিল, "ঢিল ছুঁড়বেন না আপনারা।"

রাজেন বলিল, "বন্দুকও ছুঁড়বেন না।"

একজন কথা বাঁকাইয়া বলিল, "বটে বটে, কি ছুঁড়তে তা হলে হুকুম হয় ?"

একজন ইয়ারগোছের ছোক্‌রা ও কিনারা হইতে বলিল, "ফুল ছুঁড়ুন, চন্দনে ডুবিয়ে।"

গোরাচাঁদ একটু নিস্তব্ধ হইয়া গেল, আধমিনিটটাক মাত্র। তাহার পর সকলের বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল। ওপারে কে একজন বলিল, "রসিক আছে তো !"

পেঁপেগাছ হইতে ঘোৎনা এই তালে বলিতে যাইতেছিল, "আমি একজন আছি এখানে"—কিন্তু অবিশ্বাসের বহর দেখিয়া আর বলা হইল না।

পাশের কিনারা হইতে উত্তর আসিল, "ঐ যে শুনেছে বরযাত্রীদের পাওয়া যাচ্ছে না—ওরে আমার চালাক রে !"

তিনজন এই দিকেই অগ্রসর হইতেছিল, পায়ে মাটি ঠেকিল। রাজেন বলিল, "না, দিব্যি করে বলছি, আমরা বরযাত্রী, উঠলেই টের পাবেন।...থু থু, কি পানা রে বাবা !"

গনশা লম্বা ডুব দেওয়াতে অতিরিক্ত হাঁপাইতেছিল। রাজেন বলিল, "রঘু বাগদী এদিকে নেই তো ?"

আবার সেই উৎকট বক্রোক্তি, "বটে ! ওরে রঘুকে ডাক।"

তিনজন আবার ঝপাঝপ করিয়া জলে পড়িল। তখন জগুদার কণ্ঠের আওয়াজ হইল, "আচ্ছা উঠে আয়, কিন্তু এক এক করে। রঘু, তুই একটু ওদিকেই থাক, তোয়েব থাকবি কিন্তু !"

রাজেন প্রথমেই উঠিল। হাত-পা এক রকম অবশ হইয়া গিয়াছে, সর্বাঙ্গে পাঁক, পানা, কুটাকাঠি। ঠকঠক করিয়া কাঁপুনি। কোমরে জড়ানো র‍্যাপারের পরতে একটা বড় চাঁদামাছ লণ্ঠনের আলোয় চকচক করিতেছে। বুকটা হাপরের মতো উঠানামা করিতেছে, কোন রকমে দুইটা কথা ধাক্কা দিয়া বাহির করিল, "এই দেখুন।"

পূর্বপরিচিত সেই কালো লম্বা ছেলেটা বলিল, "বাঃ, কি চমৎকার।"

আর একজন বলিল, "চোখ জুড়িয়ে গেল !"

গোরাচাঁদ উঠিয়া আসিল। রাজেনেরই মতো, অধিকন্তু কাপড়টা খুলিয়া গিয়াছে, নীচে আণ্ডারওয়ার। রাজেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "এ গোরা।"

সেই ফাজিল ছেলেটা বস্ত্রের সংক্ষিপ্ততা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "হাইল্যান্ডার গোরা বলুন !"

গনশা ফিরিয়াই আবার ডুব দেওয়ায় পিছনে পড়িয়া গিয়াছিল ; অর্ধমৃত অবস্থায় উঠিয়া আসিল। গোরচাঁদেরই অনুরূপ, বাড়তির মধ্যে মাথায় একটা ছোট্ট কচুরিপানার চূড়া।

সেই ছেলেটা পিছন হইতে সম্ভ্রমের স্বরে বলিল, "কমান্ডার-ইন্‌-চীফ।"

"উঠেছে উঠেছে, ওই দিকে।"—শব্দ করিতে করিতে চারিদিকের লোক আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

একজন বলিল, "কি বলছে ? এরাও বরযাত্রী ? দড়ি নিয়ে এস।"

অন্য একজন বলিল, "বরযাত্রীরা নেই কিনা, ধরা পড়ে তাদের জায়গা দখল করে নিচ্ছে।"

সেই দুষ্টবুদ্ধি ছোকরাটা সামনে আসিয়া বলিল, "আরে, তাদের যে ইস্টিশানের দিকে যেতে দেখলাম। আর তাদের দেখলেই জগুদা তক্ষুনি চিনে ফেলত, না জগুদা ?"—বলিয়া

একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

"দেখতেও হত না, গলা শুনেই চিনতাম।"—বলিয়া একবার তাহার দিকে কেমন একভাবে চাহিয়া, হঠাৎ নিজের গলাটা পরিষ্কার করিবার দরকাব পড়ায় জগুদা সরিয়া পড়িল।

কন্যাকর্তা বৃদ্ধগোছের। ছেলেটার দিকে পিটপিট করিয়া চাহিয়া বলিলেন,"তুই যেতে দেখলি তাদের ? তা হবে, কয়েকজন চলে যাবে বলে তখন গোঁ ধরেছিল, আর তারা ছিল ছ-সাতজন।"

গোরচাঁদ বলিল, "পাঁচজন ছিলাম।"

জগুদা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আর তাদেব মধ্যে একজন তোতলা ছিল সবচেয়ে হারামজাদা।"

গন্‌শা তাড়াতাড়ি দম লইয়া বলিল, "এই যে ম-ম্মশাই, আম্মো রযেছি : বে-ব্বেজায়—"

"মা-ম্মাইরি ! অমনিই তো-ত্তোতলা সেজে গেলে !"

কন্যাকর্তা বলিলেন, "অত তোতলা ছিল না তো।"

দুই-তিনজন ধূর্তামি করিয়া বলিয়া গেল, "একজন বোবা ছিল।"

"একজন খোনা ছিল।"

"একটা খোঁড়া ছিল।"

"তা এখনও হতে পারে।"

কন্যাকর্তা প্রশ্ন করিলেন, "বরযাত্রী তো ওদিকে কী করছিলেন সব ?"

তিনজন পরস্পরের মুখ চাওযা-চাওযি করিতে লাগিল। রাজেন গন্‌শাকে একটু ঠেলিয়া বলিল, "বল না রে।"

গন্‌শা মুখটা খিঁচাইয়া বিরক্তভাবে কহিল, "আবে দুৎ, আমার কথা বে-ব্বেশি আটকে যাচ্ছে, বি-ব্বিশ্বাস করবে না।"

গোরাচাঁদ কহিল,"রাজেন বললে, দিব্যি খাওযালে ভদ্দরলোকেরা ; চল, ত্রিলোচন বোধ হয এতক্ষণ বাসরে গান ধরেছে, দিব্যি নিরিবিলিতে—"

গন্‌শা যোগাইয়া দিল, "পু-প্পুকুরধারটিতে বসে--"

"দিব্যি নিরিবিলিতে পুকুরধারটিতে বসে একটু—"

রাজেন থাকিতে পারিল না, বলিল, "আমি বললাম, থাক, দরকার কি ? মেয়েছেলেরা রয়েছেন—"

গোরাচাঁদ গন্‌শার দিকে একটা তির্যক দৃষ্টি হানিল : একটু উপস্থিত বুদ্ধি খরচ করিয়া বলিল,"আমি বললাম, মেয়েছেলেরা গান ধরলে উঠে পড়ব, তাঁরা তো আমাদের বোনেবই তুল্য।"

গন্‌শা বলিল, "মা-ম্মার পেটের বোনের—"

কন্যাকর্তা গর্জন করিয়া উঠিলেন, "সব ধাপ্পাবাজি ! মার পেটের বোনের ! কেউ গেল থানায় ? রঘু !"

রঘু বাগদী পিছনেই দাঁড়াইয়া ছিল : বলিল, "এজ্ঞে, এই যে আছি মুই। আপনাদেরও যেমন হযেছে কত্তা, ঐসব কথা পেত্তয করেন। আয়েশ করে গান শোনবার কি নন্দনকানন রে ! সব একেলে সৌখীন ডাকাত, দেখছেন না ?"

রঘুর উপস্থিতিতে এবং কথাবার্তায সবাই আরও ঘাবড়াইয়া গেল। রাজেন বলিল, "আচ্ছা পুলিশ ডাকবার আগে আমাদের কর্তাদের কাছে নিয়ে চলুন না একবার, তাঁরা তো ভুল করবেন না।"

গোরাচাঁদ বলিল, "না হয় বরের কাছে।"

কর্তা শাসাইয়া উঠিলেন,"খবরদার, বরের কাছে যেন না নিয়ে যাওয়া হয়।"

পিছন হইতে একজন বৃদ্ধগোছের লোক বলিলেন,"আর দেখ, বর যেন ঘর থেকে না বেরোয় ; কোথায় কে আছে, কত রকম বিপদ হতে পারে, দুর্গা দুর্গা।"

জগুদা বলিল, "আচ্ছা বরকর্তার কাছেই নিয়ে চল সবাইকে। রঘু, পাশে পাশে থাকিস।"

তিনজনেই নিজের নিজের মূর্তির দিকে চাহিয়া বলিল, "তা হলে একখানা করে শুকনো কাপড় আর জামা—"

সমস্ত দলটাতে একটা চেঁচামেচি গোছের পড়িয়া গেল।

"মাইরি ?"

"ওদের জামাই সাজিয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

"একটা চৌঘুড়ি নিয়ে এস।"

"যেমন ভাবে পুকুর থেকে উঠেছিলে সেই রকম ভাবেই যেতে হবে, তাতেও যদি চেনে, তবেই—"

সেই দুষ্টবুদ্ধি ছেলেটা বলিল, "দময়ন্তী নলকে অমন অবস্থাতেও কি করে চিনেছিলেন ? বরং যে পানাগুলো খসে গেছে, আবার চাপিয়ে দাও।"

অগত্যা সেই অবস্থাতেই অগ্রসর হইতে হইল। দলটা রঙবেরঙের মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে আগে-পিছে চলিল।

সদর বাড়িতে মাঝখানের ঘরটিতে কর্তা ও বরের মেসো এক জায়গায় মড়ার মতো পড়িয়া। এক কোণে পুরুতঠাকুর তাঁহার বধিরতার কল্যাণে গাঢ় নিদ্রায় অচৈতন্য। বাহিরের বারান্দায় দীনে নাপতে কাজকর্ম সারিয়া কর্তাদের বোতলঝাড়া একটু প্রসাদবিন্দু পাইয়াছিল, তাহাতেই তাহার ষোল আনা ফলপ্রাপ্তি হইয়াছে।

দলটা বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল। জগুদা 'বেয়াই-মশাই!' বলিয়া বরকর্তাকে জাগাইতে যাইতেছিল, সেই ছেলেটা হঠাৎ সামনে আসিয়া বলিল, "দাঁড়ান দাঁড়ান, ওরাই আগে দেখাক কে বরের বাবা, কে বরের মামা, কে বরের বোনাই, কে বরের—"

তিনজনে কটমট করিয়া তাহার পানে চাহিল। গোরাচাঁদ বলিল, "কেন, ঐ তো বরের বাপ।"

গনশা টীকা করিল, "ভ-ব্‌ভতারণবাবু।"

"ঐ বরের মেসো অনন্তবাবু, ঐ পুরুতমশাই—কালা, রাতকানা ; বাইরে দীনে নাপতে।"

ছেলেটা দমিবার নয়, চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, "সব খোঁজ নিয়েছে রে!"

একজন বলিল, "বোধ হয় শিবপুর থেকে ধাওয়া করেছে!"

অনেক ডাকাডাকি এবং পরে ঠেলাঠেলির পর ভবতারণবাবু 'উ' করিয়া একটা শব্দ করিলেন। দুই-তিনজন চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিল, "দেখুন তো, এই কি আপনাদের বরযাত্রী ?"

অনেকবার প্রশ্ন করায়, অনেক কষ্টে কর্তা রক্তাভ চক্ষু দুইটি চাড় দিয়া অল্প একটু উন্মীলিত করিলেন ; আরও অনেক চেষ্টার পর প্রশ্নটার মর্মগ্রহণ করিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "কে বাবা, লন্দি-ভিরিঙ্গি, থিলোচনের বরযাত্রা এশ্চো! এক শিল্‌ম চড়াও তো বাবা!"

তিনজনেই একরকম আর্তস্বরেই চীৎকার করিয়া বলিল, "জ্যাঠামশাই, আমরা গোরাচাঁদ, রাজেন, গনেশ—"

"গজানন, শিঃ, তুই শেক্কালে বাপের বিয়ে দেখতেলি ?"--বলিয়া অবশ অঙ্গুলি দিয়া সবাইকে সরিয়া যাইতে ইশারা করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। বৃথা পরিশ্রম ভাবিয়া তাঁহাকে আর কেহ জাগাইতে চাহিল না।

বরের মেসো অনন্তবাবুর একটুও সাড়া পাওয়া গেল না। গোরাচাঁদ নিরাশভাবে বলিল, "হা ভগবান !"

পুরোহিত মহাশয়কে তোলা হইল। কথাটা তাঁহাকে শুনাইতে এবং ভাল করিয়া বুঝাইতে সবিশেষ বেগ পাইতে হইল। তিনি বলিলেন, "ডাকাতরা বলছে বরযাত্রী ? তা আমি তো রাত্রে দেখতে পাই না বাবা, প্রাতঃকাল পর্যন্ত তাদের বসিয়ে রাখ না হয়।"

গোরাচাঁদ অগ্রসর হইয়া পদধূলি লইয়া বলিল, "ন্যায়রত্নমশাই, আমি গোরাচাঁদ।"

"গোরাচাঁদ ? এস দাদা, আজকের দিনে আর কি আশীর্বাদ করব ? শীঘ্র একটি বিবাহ হোক, কন্দর্পকান্তি হও—"

সেই সর্বঘটের ছেলেটা একটু কাছে ঘেঁষিয়া চেঁচাইয়া বলিল, "কন্দর্পকান্তি আশীর্বাদের আগেই হয়ে বসে আছে !"

পাশ থেকে কে একজন বলিল, "মানস-সরোবরে চান করে।"

ন্যায়রত্নমশাই ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বইকি, তোমরা সুপুরুষ তো আছই, তা গোরা রে, এরা কি বলছেন, ডাকাতরা নাকি বলছে, তারা বরযাত্রী ? কি অনাসৃষ্টি ! চিনে দাও তো দাদা।"

রাজেন বলিল,"এরা বলছে--এরা বলছেন বরযাত্রীরা ডাকাত।"

ন্যায়রত্ন মহাশয় একটু ধাঁধায় পড়িয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ঠিক অর্থ গ্রহণ হচ্ছে না, ডাকাতরা বরযাত্রী, না বরযাত্রীরা ডাকাত !"

দলের একজন ডান হাতটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বলিল, "সামলাও ন্যায়ের ধাক্কা এখন, তৈলাধার পাত্র, না পাত্রাধার তৈল ? ডাকাতরা বরযাত্রী, না বরযাত্রীরা ডাকাত ?"

গনশা মরীয়া হইয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, "ম-ম্মশাই আমি পারলে সো-সসোজা করেই বলতাম, কি-কিন্তু সত্যিই তোতলা ; দয়া করে একবার বর তি-ত্তিলুর কাছে নিয়ে চলুন,তারপর প্-প্প, লিশে দিয়ে দেবেন না হয়। উঃ,শী-শ্-শীতে কালিয়ে গেলাম !"

বলা বাহুল্য, কথাবার্তার ভঙ্গিতে অনেকের সন্দেহটা মিটিয়ে আসিতেছিল, বিশেষ করিয়া বয়স্থদের মধ্যে। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "তাই নিয়ে চল না হয়, রঘুকে এগিয়ে দাও।"

কর্তা বলিলেন,"জগু, বাড়ির মেয়েদের তা হলে বলগে।"

দলটি তিনজনকে ঘিরিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠানদিদি আর মেয়েরা বরের চারিদিকে ব্যূহ সৃষ্টি করিয়া বাহির-হইতে-পাওয়া খবরের টুকরাটাকরাগুলা লইয়া নিজের নিজের কল্পনাশক্তির পরিচর্চা করিতেছিল, কর্তা চেঁচাইয়া বলিলেন, "একবার বরকে বাইরে পাঠিয়ে দাও !"

"ওমা , কি অমঙ্গলের কথা, কি হবে ! কোনমতেই না"—বলিয়া সবাই ব্যূহটা আরও সুদৃঢ় করিয়া ঘিরিয়া ফেলিল। কন্যাকর্তাকে নিজেকেই ভিতরে যাইতে হইল।

এমন সময় একটা কাণ্ড হইল। ঘোৎনা পুকুরের দিকটা খালি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুব সন্তর্পণে পেঁপেগাছ হইতে নামিয়া চুপিসাড়ে সদর-বাড়িতে দলটির পেছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেখানকারই কথাবার্তায় আত্মপ্রকাশের উৎসাহ না পাইয়া খুব সাবধানে বাড়ির মধ্যে আসিয়া

উপস্থিত হইয়াছিল। ত্রিলোচনের দ্বারা সনাক্ত হইবার সুযোগটা হারানো কোনোমতেই সমীচীন হইবে না ভাবিয়া "কি হয়েছে র‍্যা গন্‌শা ? এত গোলমাল কিসের ?"—বলিতে বলিতে ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া সামনে দাঁড়াইল, এবং সঙ্গে "অ্যাঁ, তোদের এ কি দশা !"—বলিয়া হাত চোখ কাঁধের ভঙ্গি সহকারে একখানি নিখুঁত অভিনয় করিল।

তিনজনেই বলিয়া উঠিল, "ঘোঁৎনা যে ! কোথায় ছিলি ? দেখ না,এ ভদ্দরলোকেরা কোনমতেই—"

ঘোঁৎনা গাছের উপর হইতে পুকুরপাড়ের সব কথাই শুনিযাছিল ; বলিল, "তোরা যখন আমার বারণ না শুনে পুকুরের দিকে গান শুনতে গেলি—"

মুরুব্বিয়ানায় গোরাচাঁদের গা জ্বলিয়া উঠিল, গন্‌শা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে টিপিয়া থামাইল।

"আমি ভাবলাম দুত্তোর একটু বেড়িয়ে আসা যাক। খানিকটা দূরে গেছি, এদিকে একটা সোরগোল। তাড়াতাড়ি ফিরলাম। একে অজানা জাযগা,তায় রাত্তির, খানিকটা এদিক, খানিকটা ওদিক করে শেষে পথ ভুলে—"

"একটা পেঁপেগাছে উঠে পড়লাম !"

সবাই এই শেষের বক্তা সেই ফাজিল ছোকরাটির পানে চাহিল। তাহার ঠিক মোক্ষম জাযগাটিতে আসিয়া দাঁড়াইবার কেমন গূঢ় শক্তি আছে. ইতিমধ্যে কখন ঘোঁৎনার পাশটিতে আসিয়া জুটিযা গিযাছে। সে নিজেব টিপ্পনীর পর আর কিছু না বলিযা ঘোঁৎনার চারিদিকের লোকদেব সরাইযা দিযা ঘোঁৎনাকে একটু সামনে আগাইযা দিল। সকলেই দেখিল, তাহার পিছনে কোমরে জড়ানো র‍্যাপারের সঙ্গে বাঁধা দুইটা ডাঁটাসুদ্ধ পেঁপের পাতা, একটা শুকনো,একটা পাকা—মাঝারি সাইজের। গাছে থাকিতে কখন আটকাইযা কাপড়ের সঙ্গে বাঁধা পড়িযা গিযাছে, ঘোঁৎনার সাড় হয নাই।

"দোসরা ধাপ্পাবাজ ! লাগাও চাঁটি।"একটা গোলমাল উঠিতেছিল, এমন সময শ্বশুরের সঙ্গে ত্রিলোচন আসিয়া রকে দাঁড়াইল।

"সত্যিই যে তোরাই দেখছি ! আমি বলি, বুঝি ডাকাতই পড়ল। তা জলে ঝাঁপ দেওযার কুবুদ্ধি হল কেন ? আর কে. গুপ্ত কোথায় ? গোরা, তোর দাড়িতে কী ঝুলছে. মুখ তোল তো !"

দাড়িতে বোধ হয একটা পানার শিকড় ঝুলিতেছে, কিন্তু মুখ তুলিবার [illegible] আর গোরাচাঁদের অবস্থা ছিল না,—গোরাচাঁদেরও নয , গন্‌শারও নয, বাজেনেরও নয়, ঘোঁৎনারও নয।

সন্দেহ সম্পূর্ণ কাটিয়া যাওযা মাত্র একটা রব পড়িয়া গেল—

"ওরে, শুকনো কাপড় নিযে আয তিনখানা।"

"কাপড় জামা, র‍্যাপার,—শীগগির।"

"চা করতে বলে দে, দেরি না হয।"

"আহা, ভদ্দবলোকের ছেলে, বাসরঘর দেখবাব ইচ্ছে হযেছিল তো—"

সেই ছেলেটা বলিল, "স্পষ্ট করে বললেই হত জগুদাকে।"

"ওরে, নিয়ে এলি কাপড় ? দেরি কেন ?"

কাপড় আসিল দুই দিক হইতে। বাসরঘরের ভিতর হইতে লইযা আসিল একটি কিশোরী। চারিখানি বেশ চওড়াপেড়ে শাড়ি, চারিটি সাযা, চারিটি ব্লাউজ। একটু মিষ্ট ধারালো হাসি হাসিয়া বলিল, "বাসরঘরে ওঁদের চারজনকে ডাকছেন।"

বর ও নফর

১

গন্‌শা বলিল,"আমার ক-ক-ক্কপালে পরের শ্বশুর-বাড়ি গিয়ে সুখ লেখা নাই। সেবারে কালসিটে তিলুর বরযাত্রী হয়ে গিয়ে সুখ ঐ হল ; পরশু মাসীর বাড়ি গেছলাম। মা-ম্মাসী ডেকে ডেকে তেইশ জনকে পেরনাম কবালে, তিনজন ফাউ, সেখানে অত গুরুজন আছে জানলে ওদিক মাড়াতাম না। কো-ক্কোমরের ফিকব্যথাটা এসা আউড়ে উঠেছে !"

ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল, "ফাউ মানে ?"

"তি-ত্তিনটে তাদের মধ্যে দাসী ছিল, মানে, ঘাড় তুলে দেখবার তো আর ফুরসুত ছিল না !"

কে. গুপ্ত বলিল, "ভিড় জিনিসটা ফুটবলের মাঠেই ভাল মশাই। গাড়িতে বলুন, শ্বশুরবাড়ি কুটুম-বাড়িতে বলুন—"

গোরাচাঁদ বলিল, "নেমন্তন্নয় বল, বড্ড অসুবিধেয় পড়তে হয়।"

রাজেন জিজ্ঞাসা করিল, "নিজের বিয়ের কি হল র‍্যা গন্‌শা ? মামা বলে কি ?"

গন্‌শার মুখটা অদ্ভুতভাবে বিকৃত হইয়া পড়িল। একটু পরে সংক্ষেপে বলিল, "কুষ্টির মিল হয় তো গু-গুগুষ্টির মিল হয় না ; ওরা বলে এক, মামারা বলে আর। বিয়ের কথা হচ্ছে, কিন্তু ব-ব্বউয়ের কথা চাপা পড়ে গেছে।"

ঘোৎনা বলিল, "আসলে ওর মামারা ঠাউরেছে, এর মধ্যে একটা চাকরি-বাকরি হয়ে গেলে দাঁও মারবে। গ্যাঞ্জেস মিলে তো সেদিন গিছলি, কি বললে ?"

গোরাচাঁদ বলিল, "ভিড়েব কথা যদি বললি তো আমার শ্বশুরবাড়ি ভাল। বউ, শাশুড়ী, খুড়শাশুড়ী, একটি শালী, শালা আর শালাজ ; পিসেমশাই বলে ডাকবে, তার জন্যে শালাজের একটি ছেলেও দিয়েছেন ভগবান, মানে যে ক-টি দরকার, ঠিক সাজানো, ফালতু ভিড় পাবে না। বাজে মার্কার মধ্যে এক শ্বশুব, তা সে বেচারী সন্ধ্যের পর আফিম খেয়ে পড়ে থাকে, নিশ্চিন্দি।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ গেল, বোধ হয় সবাই মনে মনে গোরাচাঁদের কথাগুলি রোমন্থন করিতে লাগিল। একটু পরে গোরাচাঁদ আবার বলিল, "শীগ্‌গির একবার যেতে লিখেছে, শাশুড়ী অনেক দিন দেখেনি কিনা !"

রাজেন প্রশ্ন করিল, "কবে যাচ্ছিস ?"

"বাবা বলেছে, এটা মলমাস, ক-টা দিন যাক, তারপর।"

গন্‌শা বলিল, "বে-ব্বেটাছেলের আবার মলমাস ! তু-ত্তুই তো আর স্বামীর ঘর করতে যাচ্ছিস না !"

রাজেন শিস্ দেওয়া আরম্ভ করিয়াছিল, থামাইয়া বলিল, "আমি [illegible] বুঝি শ্বশুড়বাড়ি যাব, ঠিক যখন কেউ ভাববে না যে জামাই আসছে। তা হলেই তো যার জন্যে যাওয়া, তাকে ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় দেখতে পাব। বলা নেই, কওয়া নেই, হুট করে গিয়ে [illegible]লাম, বউ বোধ হয় তখন গা ধুয়ে উঠে কালো চুলে রাঙা গামছা জড়িয়ে, জল নিংড়োচ্ছে—

গন্‌শা বলিল, "ঘুম থেকে উঠে ক-ক্কড়াইমুড়ি চিবোতেও তো পারে, নয়তো মুখ ভেংচে ঝগড়া করছে কারও সঙ্গে—"

গোরাচাঁদ রাজেনের মত কবি না হইলেও রাজেনের কথাটা তাহার মনে লাগিল। নূতন বিবাহ তো! একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কিন্তু তাতে খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে হয়, যোগাড়যন্ত্রর কিছু থাকে না কিনা, আর আমার শ্বশুর-বাড়ি একটু আবার পাড়াগাঁ গোছেরও!"

ত্রিলোচনের নববিবাহের রসচেতনায় একটু আঘাত লাগিল। বিরক্তভাবে বলিল, "তোর শুধু খ্যাঁটের চিন্তা গোরা। বিয়ে না দিয়ে কাকা যদি তোর একটা হোটেল-ওয়েটারের চাকরি করে দিত তো—"

গোরাচাঁদ বলিল,"গন্‌শা, কি বলিস, যাব একবার কাউকে কিছু না জানিয়ে ?"

গন্‌শা অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতেছিল, বলিল, "চ-চ্চল্ না।"

সকলেই একজোটে বলিয়া উঠিল, "চল্ না মানে ?"

গন্‌শা উত্তর করিল, "আম্মো তা হলে একবার দেখে আসি গোরার শ্বশুর-বাড়ি।"

গোরাচাঁদ একেবারে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, গন্‌শার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "চল্ মাইরি। আমার বন্ধু জানলে তারা—"

গন্‌শা বলিল, "হ্যাঁ,তোর বন্ধু হয়ে গিয়ে বাইরের চালার বাতা গুনি আর তোর আফিমখোর শ্বশুরের বক্তার শুনি!"

রাজেন প্রশ্ন করিল, "তবে ?"

"ভাবছি, চা-চ্চাকর সেজে গেলে কেমন হয়।"

ত্রিলোচন একটু অন্যমনস্ক ছিল ; বোধহয় বিনা খবরে শ্বশুর-বাড়ি যাওয়ার কথাটা লইয়া মনে মনে আলোচনা করিতেছিল। আর সবাই উল্লসিত ভাবে বলিয়া উঠিল, "গ্র্যাণ্ড হয়, উঃ!"

ঘোঁৎনা বলিল," যাবি যে,গোরার বাড়িতে কি বলবে ? দু-দিন থাকবো তো ? তুই বা কি বলবি ?"

রাজেন বলিল, "গোরা বলবে, আমাদের কারুর জন্যে মেয়ে দেখতে গেছল কোথাও।...তোর শালীর বয়েস কত র‍্যা গোরা ?"

কে.গুপ্ত বলিল, "আর গণেশবাবুর বললেই হবে, চাকরি খুঁজছিলো।"

গন্‌শা বিরক্ত হইয়া বলিল, "চা-চ্চাকরি কি হারানো গাই-গরু মশাই যে, তিন দিন ধরে দিন নেই রাত নেই খুঁজতে থাকবে ? বলে দিলেই হবে একটা কিছু ? মা-ম্মামাদেব তো ঘুম হচ্ছে না গন্‌শার ভাবনায়!"

২

সঙ্গে চাকর যাইতেছে, গোরাচাঁদের মনে একটা মস্ত লোভের উদ্রেক হইয়াছিল, সন্ধ্যাবাজারের নিকট পৌঁছিয়া সেটাকে আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না ; বলিল, "যখন দুজনেই যাচ্ছি গন্‌শা, কিছু গলদা চিংড়ি, দার্জিলিঙের কপি, কড়াইশুঁটি আর নৈনিতাল আলু নিয়ে গেলে হত না ? আর কিছু মিষ্টি ? মানে তোর খাবার না কষ্ট হয়, একটু পাড়াগাঁ গোছের জায়গা কিনা! আমরা পৌঁছবও সেই যার নাম আটটা, রাত হয়ে যাবে।"

গন্‌শা বলিল, "কিন্তু গাড়ির আর মোটে আধ ঘণ্টাটাক দেরি।"

যাহা হউক, বাজারটা একেবারে হাতের কাছে, কেনাই ঠিক হইল। আন্দাজের একটু বেশি সময়ই লাগিল। গোরাচাঁদ তরকারির ঝুড়িটা লইল, গন্‌শা খাবারের হাঁড়িটা। তারপর ক্ষিপ্রতার জন্য গন্‌শা যে বাসটায় উঠিয়া বসিল, কতকটা ক্ষিপ্রতার অভাবে ও কতকটা ঝুড়িটার জন্যও গোরাচাঁদ সেটা ধরিতে পারিল না। দুটি পস্ট পার হইয়া যাওয়ার পর গন্‌শা সেটা টের পাইল। ফিরিয়া আসিতে, গোরাচাঁদকে খুঁজিয়া বাহির করিতে এবং গায়ের ঝাল মিটাইতে আরও খানিকটা সময় গেল। স্টেশনে আসিল প্রায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে। প্ল্যাটফর্মে ঢুকিয়া গন্‌শা জিজ্ঞাসা করিল,"ডা-ডডানদিকেরটা, না বাঁদিকেরটা র‍্যা গোরে ?"

পাশাপাশি দুইটা গাড়ি দাঁড়াইয়া। ঢুকিবার সময় প্ল্যাটফর্মের নম্বর দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছে, সন্দেহ আছে বুঝিলে গন্‌শা আবার পাছে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, সেই ভয়ে গোরাচাঁদ পরিণাম চিন্তা না করিয়াই বলিল, "না, বাঁদিকেরটা ।"

গাড়িতে ভিড় ছিল একটু। একেবারে ভিতরের দিকে এক কোণে গিয়া দুইজনে একটু জায়গা পাইল। গোরাচাঁদ চুপড়িটা উঠাইয়া বাঙ্কের এক কোণে রাখিয়া ; গন্‌শার হাত হইতে হাঁড়িটা লইয়া চুপড়ির মধ্যে বসাইয়া দিল।

কয়দিন বৃষ্টি হয় নাই, বেশ গরম পড়িয়াছে ; তায় দৌড়াদৌড়ি, তাহার উপর ভিড়। গন্‌শা ঠেলিয়া-ঠুলিয়া আসিয়া প্ল্যাটফর্মের উপর পায়চারি করিতে লাগিল। একটি বৃদ্ধ যাত্রী বলিল, "ফাস্টো বেল হয়ে গিয়েছে হে বাপু।"

গণেশ দোরটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ প্রশ্ন করিল, "যাওযা হবে কনে ?"

"সিঙ্গুর।"

"সিঙ্গুর ! সে তো বাবা তারকেশ্বরের লাইনে। এই গাড়ি তো নয, ঐ সামনেরটা। এ গাড়ি তো পশ্চিমে যাবে।"

গন্‌শা কতকটা অবিশ্বাসে, কতকটা উদ্বেগে বলিল, "কে বললে ?"

দ্বিতীয় ঘন্টা পড়িল।

বৃদ্ধ বোধ হয় একটু রগচটা, বলিল, "কেউ বলে নি ; তুমি উঠে এস। ওতে যাবে না, শেষে এটাও হাতছাড়া করবে। গাঁটের পয়সা দিয়ে যখন টিকিট কিনেছ, উঠে পড়।"

হুইস্‌ল দিয়া গাড়ি স্টার্ট দিল। গন্‌শা চীৎকার করিয়া বলিল,"গোরা, শী-শী-শীগগির নেমে পড়, বলছে—"

গোরাচাঁদের খটকা লাগিয়াছিল একটা। "কে বলছে ? কে বলছে র‍্যা ?"—বলিতে বলিতে হন্তদন্ত হইয়া লোকেদের পা মাড়াইয়া মোট ডিঙাইয়া আসিয়া কোনমতে নামিয়া পড়িল। গন্‌শা চোখ রাঙাইয়া বলিল, "ত-ত্তবে যে তুই বললি, বাঁদিকেরটা ?"

গোরাচাঁদ চলন্ত গাড়িটার দিকে চাহিয়া বলিল, "যাঃ, চুপড়িটা গেল ছেড়ে, হাঁড়িসুদ্ধ ! হায় ! ..."

একটু অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "মশাই, চুপড়িটা ফেলে দিন না এদিকে,ঐ বাঙ্কে রয়েছে—উত্তর দিকে, মানে পূর্ব দিকের উত্তুর, মানে উত্তুর কোণটায় আর কি—"

গন্‌শা দাঁতমুখ খিচাইয়া বলিল, "ছো-চ্ছোট, দৌড়ো দিল্লী পর্যন্ত ঐ বলতে বলতে !"

পাশের গাড়ির প্রথম বেলটা পড়িল। রেলকর্মচারী একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল ; গন্‌শা জিজ্ঞাসা করিল, "এটা তারকেশ্বর লাইনের গাড়ি তো সার্ ?"

"হ্যাঁ, শীগগির উঠে পড় গিয়ে।"

ভুলের সমস্ত সম্ভাবনা এড়াইবার জন্য গোরাচাঁদ প্রশ্ন করিল, "যে তারকেশ্বর লাইনে

সিঙ্গুর আছে ?"

গনশা উত্তরটা শুনিবার জন্য ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, একটা ধমক খাইয়া দুইজনে তাড়াতাড়ি গিয়া উঠিল। গনশা প্ল্যাটফরমের দিকের বেঞ্চটায় বসিয়াছিল ; গোরাচাঁদ পকেট হইতে মানিব্যাগ বাহির করিতে করিতে বলিল, "গলা বাড়িয়ে দেখ তো গনশা, খাবারের ভেণ্ডারটা আছে কাছেপিঠে ? বেশ খানিকটা ছুটোছুটি হয়রানি হল কিনা।"

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল,হুইস্‌ল দিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

গোরাচাঁদ ব্যাগটা যথাস্থানে রাখিয়া দিল। একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, "সে চুপড়িটা এতক্ষণ বোধ হয় লিলুয়া পেরিয়ে গেল হাঁড়িসুদ্ধ। কেনা পর্যন্ত খালি দৌড়াদৌড়ি, একটাও যে মুখে ফেলে দোব, এমন ফুরসৎ হল না।"

যাহা হউক গাড়িটার গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুইজনেরই মনমরা ভাবটা কাটিয়া গেল। গনশা চাকরের মুখে মানায় এই রকম ভাব ও ভাষার একটা গান ধরিল, 'পরান যদি লিলেই রে প্রাণ—।' সেটা জমিয়া উঠিতে দুই-একজন উঠিয়া যাওয়ায় কোলের কাছে যখন একটু জায়গা খালি হইল, গোরাচাঁদ সেইখানটিতে বসিল। প্রথম গুনগুন গানে একটু যোগ দিল,কিন্তু গনশার তোৎলামির জন্য কোরাসে অসুবিধে হওয়ায় গাড়ির বাহিরে হাত বাড়াইয়া শুধু তবলা বাজাইতে লাগিল।

গাড়ি রিষড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলে একদল বরযাত্রী নামিল। খানিকটা উল্লসিত চেঁচামেচি ; এসেন্সের জুঁইয়ের গোড়ের গন্ধ ; চেলি-পরা, কপালে চন্দনের ফুটকি দেওয়া বর। গনশার গানটা মৃদু হইতে হইতে থামিয়া গেল। গাড়ি ছাড়িয়া খানিকটা গেলে বলিল, "হ্যাঁ, হঠাৎ মনে পড়ে গেল ; তোর শা-শা শালীর বয়েস কত র‍্যা গোরা ? মানে, যদি বিয়ের যুগ্যি হয় তো ; শিবপুরে পাত্তর-টাত্তোর দেখি ; একটা ভদ্রলোকের উপকার করতে পারা মস্ত একটা ভাগ্যি কিনা।"

গোরাচাঁদ বলিল, "বউয়ের ষোল যাচ্ছে, এ কার্তিকে সতরোতে পড়বে ; শালী হল দু বছর তিন মাসের ছোট, তা হলে—"

গনশা হিসাবের গোলমালের দিকে না গিয়া বলিল, "বিটুইন তেরো অ্যাণ্ড চোদ্দো। হেল্‌থ কেমন ?"

"বউয়ের চেয়ে ভালই বলতে হবে। বউটা ম্যালেরিয়ায় বড্ড ভু'লে কিনা, একেবারেই হাড্ডিসার হয়ে গিয়েছিল ; ধন্যি বলতে হবে পান্নালাল ডাক্তারকে, যাকে বলে মরা মানুষ চাঙ্গা করে—"

গনশা প্রশ্ন করিল, "দে-দ্দেখতে কেমন ?"

গোরাচাঁদ একটু লজ্জিতভাবে ধমক দিয়া বলিল,"যাঃ ! আহা, উনি যেন দেখেন নি ! তবে যে বললি সেদিন, গোরা, তিলুর বউয়ের চেয়ে তোর বউয়ের রংটা আরও..."

গনশা আর বিরক্তি চাপিতে পারিল না, "তোর শালীর কথা জিজ্ঞেস করছি না ! স্রেফ বউ বউ করে সেই থেকে—"

গোরাচাঁদ অপ্রতিভ হইয়া বলিল,"তাই বল। আমি এদিকে ভেবে সারা হচ্ছি, গণেশ জেনেশুনেও ওকথা জিজ্ঞেস করছে কেন !... শালী হচ্ছে যাকে বলে—হ্যাঁ, সুন্দরী।"

"লেখাপড়া কেমন ? ক-ক্কথা হচ্ছে, কেউ জিজ্ঞেস করলে আমায় খুঁটিয়ে বলতে হবে কিনা ! নইলে বলবে, খুব খোঁজ রাখেন তো মশাই ! আবার সম্বন্ধে করতে এসেছেন !"

"ছাই লেখাপড়া,ওর চেয়ে বউ অনেক পড়েছে ; কিন্তু মুখের কাছে দাঁড়াও দিকিন

শালীর !"

গন্‌শা হাসিয়া বলিল,"সত্যি নাকি ?"—মৃদু হাস্যের সঙ্গে মাথা দুলাইয়া কি চিন্তা করিল খানিকটা, তাহার পর ধীরে ধীরে ত্রিলোচনের বিয়ের সেই হিন্দী গানটা ধরিল, "মুখা পঙ্কজ সোঙরি সোঙরি..."

শেওড়াফুলিতে পৌঁছিতে গোরাচাঁদ বলিল, "তোর খিদে পায় নি গন্‌শা ? সে চুপড়িটা বোধহয় এতক্ষণ চন্দননগরে—তোর কি আন্দাজ হয় ?"

গন্‌শা বলিল, "খিদের চেয়ে তেষ্টা পেয়েছে বেশি। একটা লেমনেড হলে হত।"

গোরাচাঁদ বলিল,"তুই তবে তাই খা, ঐ ভেণ্ডারটা আসছে ; আমি দেখি নেমে, যদি খাবার-টাবার পাওয়া যায় কিছু।"

গন্‌শা ধমক দিয়া উঠিল, "গ-গ-গর্দভ কোথাকার ! আর একটুখানি সহ্যি করে থাকবে, তা নয়, পথে যা-তা খেয়ে পেট ভরাচ্ছে !"

কথাটা গোরাচাঁদের খুব সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। প্রকাশ করিয়া বলিলেও,"ঠিক বলেছিল গন্‌শা, পাড়াগাঁয়ের রাত হলেও জামাই মানুষ পৌঁছচ্ছে, যতদূর সাধ্য করবেই তারা, একটা মস্ত আহ্লাদের কথা তো ! কিছু না হলেও পুকুরের মাছ আর গোরুর দুধটা তো আছেই। আমিও তা হলে একটা লেমনেডই খাই এখন ; খিদেটা জলে চাপা রইল। তাতে কোন ক্ষতি হবে না, কি বলিস ?"

লেমনেড ছিল না, দুজনে সোডাই পান করিল। গন্‌শা ঢেকুর তুলিয়া বলিল,"চা-চ্চাপা কি ! খিদের একেবারে শান দেওয়া রইল। মাছ যদি তেমন ওঠে তো একবার কালিয়া রেঁধে দেখাই গোরে। পাড়াগাঁয়ে কিন্তু আবার চাকরের রান্না খাবে না যে !"

গোরাচাঁদ উল্লসিত হইয়া বলিল,"রান্নাঘরের দোরগোড়ায় বসে তুই বাতলে দে না কেন শালাজকে, সেই রাঁধে কিনা। এক ঢিলে দু-পাখি মারা হবে, গল্পও করতে থাকবি আবার—শালী, বউ সবাই থাকবে। তারা ভাববে, জামাইবাবুর চাকর,ওটার কাছে আবার লজ্জা ! চাকর-বাবু যে এদিকে শিবপুরের ডাকসাইটে গণেশরাম—"

দুইজনেই সজোরে হাসিয়া উঠিল।

সিঙ্গুরের আর দেরি নাই। গাড়ির এদিকটায় তাহারা মাত্র দুইজনে বসিয়া। গন্‌শা উঠিয়া জামাকাপড় ছাড়িয়া একটা ময়লা ধুতি ও একটা ঘুন্টি-দেওয়া ফরসা পিরান পরিল, মাথার টেরিটা মুছিয়া ফেলিয়া কানে একটা বিড়ি গুঁজিয়া দিল। জামাকাপড় এবং ক্যাম্বিসের জুতা-জোড়াটা ছোট্ট সুটকেসটায় গুছাইয়া ফেলিল ; তাহার পর হঠাৎ চোখ দুইটা ট্যারা করিয়া লইয়া গোরাচাঁদের দিকে চাহিয়া ডাকিয়া উঠিল, "দাঠউর !"

দুইজনে আবার একচোট হাসিয়া উঠিল।

৩

রাত প্রায় সাড়ে আটটার সময় গাড়ি সিঙ্গুরে পৌঁছিল।

গল্প করিতে করিতে স্টেশনের বাহির হইয়া দুইজনে চলিতে আরম্ভ করিল। বউয়ের কথা, শালী-শালাজের কথা, খাওয়ার কথা যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, গোরাচাঁদ বলিল, "হ্যাঁ, আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছি যে ? এদিকে এসেও পড়েছি অনেকটা ; তোকে কি বলে ডাকব র‍্যা শ্বশুরবাড়িতে ? মানে, বউটা আবার তোর নাম জানে কিনা !"

হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "এ কোথায় এলাম র‍্যা গন্‌শা, এ যে অনেক ভদ্দরলোকের বাড়ি !"

গন্‌শা বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ব্যঙ্গের স্বরে প্রশ্ন করিল, "তুই কি বা-ব্বাগদীপাড়া-কেওড়াপাড়ায় শ্বশুরবাড়ি খুঁজছিলি ?"

বেশ অন্ধকার। গোরাচাঁদ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া চারিদিকে দেখিতে দেখিতে বলিল, "সে কথা নয়, মানে শ্বশুর-বাড়িটা একটেরেয় কিনা, নিজ সিঙ্গুর ছাড়িয়া খানিকটা ভেতরের দিকে। বাড়িঘর কি দোকানপাট তো নেই সেদিকে। চল্ আবার ইস্টিশানে, গল্প করতে করতে একেবারে উলটো রাস্তায় এসে পড়েছি। এদিকটা তো আমার জ্ঞাতি পিসশ্বশুরের বাড়ি।"

"না হয় পিসশ্বশুরের বাড়িই রাতটা কাটাবি চল্ না, সকালে তখন—"

গোরাচাঁদ শিহরিয়া উঠিল, কহিল, "ওরে বাব্বা ! তারা তো চায়ই তাই। টের পেলে রাস্তা থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে বাতারাতি কাজ সাফাই করে লাস গুম করে ফেলবে। জমি নিয়ে শ্বশুরের সঙ্গে ভয়ংকর খুনে মোকদ্দমা চলছে কিনা ! ওরা তো চায়ই, কেউ একবার আসুক এদিকে বাগে, জামাই পেলে তো লুফে নেবে।"

গন্‌শা তাড়াতাড়ি তাহাকে টানিয়া লইয়া ফিরিল। খুবই চটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু স্টেশনে না পৌঁছানো পর্যন্ত কিছু বলিল না। স্টেশনের কাছে আসিয়া খুব একচোট গালিগালাজ করিল গোবাচাঁদকে। আবার ঠিক রাস্তা ধরিয়া দুইজনে যাইতে আরম্ভ করিল। চলিতে চলিতে দুই তিন জায়গায় খবর লইয়া যখন বুঝিল যে, ঠিক রাস্তাতেই যাইতেছে, তখন মনের রাগটা এবং পিসশ্বশুরের আতঙ্কটা অল্পে অল্পে কাটিয়া গেল। যখন বুঝিল, কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, গন্‌শার মনটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, কথাবার্তা ও সরস হইয়া আসিল। সাহস পাইয়া গোরাচাঁদ বলিল, "তুই তো ঐ সব বলে ঠাট্টা করছিস শুধু, আমার এদিকে নাড়ি জ্বলে গেল খিদেয, ভুল রাস্তার পাল্লায় পড়ে রাতও হয়ে গেল বড্ড !"

"না-ন্নাড়ি কি আমারই জ্বলছে না ? দেখছি কালিঘাটা আর হবে না রাত্তিরে। যদি বড় মিরগেল ওঠে তো ভেজেই দিক আপাতত , লুচি তো করবেই—স্রেফ মিরগেল মাছের পেটি ভাজা আর লুচি।"

গোরাচাঁদ মুখে রস জমিয়ে উঠায় একটা ঝোলটানা গোছের শব্দ কবিয়া বলিল, "দুটোই বড় শুকনো হয়ে গেল ; তা রাতটা কাটুক ঐভাবেই, সকালে তখন দেখা যাবে। বউকে বরং বলব, দুধটাকে নটক্ষিরে করে...হাতে একটা আধলা ইট তুলে নে তো গন্‌শা, এসে গেছি, আমি এই বাঁশের আগালেটা বাগিয়ে ধরছি।"

গন্‌শা দাঁড়াইয়া পড়িয়া বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল, "কেন র‍্যা, আবার কি ?"

"কুকুরটা বড় রোখা। রাত্তিরে কেউ এলে ধরে নেয, চোর কিংবা পিসশ্বশুরের বাড়ির কেউ ; দাঙ্গার পর থেকে ওদের্ ওপর বড় চটা কিনা ! ঐ ডাকতে আরম্ভ করেছে। তুই যে থান-ইট তুলে নিয়েছিস, একেবারে থেঁতো হয়ে যাবে যে !...আয়, বাঘা বাঘা, চ্যু চ্যু—আমি রে, তোদের জামাইবাবু। ...আচ্ছা বাড়ি একেবারে নিষুতি কেন বল্ তো গন্‌শা ?"

"ঘুমিয়েছে নিশ্চয, রাত দশটা হয়ে গেল।"

গোরাচাঁদ বলিল, "ঘুমুলে কুকুরটার এ রকম ডাকেও ঘুম ভাঙবে না ?"

দুইজনে কুকুরটাকে আটকাইতে বাহিরের উঠানে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন একজন ভিতর-বারান্দা থেকে জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কে ? কে র‍্যা বাঘা ?"

গোরাচাঁদ বলিল, "আমি শিবপুর থেকে আসছি।"

সেই রকম নিদ্রালু স্বরে প্রশ্ন হইল, "কি দরকার রাতদুপুরে ?"

এরূপ অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের উত্তর গোরাচাঁদের মুখে টপ করিয়া যোগাইল না। গন্‌শা বলিল, "না, দ-দ্দরকার তেমন কিছু নেই, তবে ইনি—তোমার গিয়ে দা-দ্দাদাঠউর এ বাড়ির জামাই।"

গোরাচাঁদ ফিসফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়িটা ঠিক তো ? 'জামাই' আবার একটা গালাগাল কিনা !"

ওদিকে আর কোন সাড়া নাই। লোকটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে নিশ্চয়, ঘুমের মধ্য হইতে প্রশ্ন করিয়াছিল। দুইজনে কুকুরটাকে কখনো তাড়না, কখনো খোসামোদ করিতে করিতে বারান্দার খোলা রকে উঠিয়া গেল। গোরাচাঁদ লোকটাকে লক্ষ্য করিয়া একটু চড়া গলায় বলিল,"জামাই মানে, শিবপুরের জামাই গোরাচাঁদ আমি ; সঙ্গে এ গন্—, আমার চাকর।"

গন্‌শা কানের কাছে মুখ লইয়া বলিল,"দুদ্দুখীরাম।"

"আমার চাকর দুখীরাম। তুমি কে কথা কইলে ?"

সেই নিদ্রালু স্বর একটু ধমকের সুরে প্রশ্ন করিল, "বলি, তুমি কে ?"

গোরাচাঁদ হতাশ হইয়া গন্‌শার দিকে চাহিয়া বলিল,"বললাম তো একচোট সব খুলে। কি গেরো বল্ তো !"

একটু থামিয়া গলা আর একটু চড়াইয়া বলিল, "বাঘা, এখনও চিনতে পারছিস না জামাইবাবুকে ? সেই লুচি খেতিস হাত থেকে ?"

গন্‌শা বলিল, "পিসশ্বশুরের বাড়ির লোক নয় রে বাঘু।"

এবার ঘরের ভিতর হইতে ভারী গলায় প্রশ্ন হইল, "বাইরে কে ব্যাড়র-ব্যাড়র করছে ? কাঁচা ঘুমটা ভাঙ্গিয়ে দিলে ?"

গোরাচাঁদ গন্‌শাকে বলিল,"শ্বশুরের আওয়াজ। আফিমের ঘুম কিনা, ঠিক ধরতে পারছে না।"

চেঁচাইয়া বলিল,"বাবা আমি আপনাদের গোরাচাঁদ, শিবপুর থেকে আসছি।"

"কে, বাবাজী ? এস বাবা, এস এস।...নিধে ! এই বেটা হারামজাদা, পড়লে আর হুঁস থাকে না ! রকে জামাই দাঁড়িয়ে যে !"

তাড়া খাইয়া নিধিরাম ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িল। বাঁ হাতে কালি-পড়া লণ্ঠনটা লইয়া দুয়ার খুলিল, তাহার পর আলো তুলিয়া ধরিয়া চোখ পিট-পিট করিতে করিতে টানা জড়িত স্বরে কহিল, "তাই তো জামাইবাবু যে ! এস এস, আস্তেজ্জে হোক, পেন্নাম হই। তা বলা নেই, কওয়া নেই—যেন গিয়ে বিনি মেঘে বজ্রাঘাত, বাঃ, কি সৌভাগ্যি ! ওটি কে ?"

গন্‌শা বলিল, "আমি দাঠাউয়ের নফর নিধুদা ; গড় করি।"

৪

তিনজনে ঘরে আসিল। গোরাচাঁদ শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া সামনের একটা পায়া-মচকানো চেয়ারে, প্রতি মুহূর্তেই পড়িয়া যাইবার আশঙ্কায় সতর্ক হইয়া বসিয়া রহিল। গন্‌শাও খুব ভক্তিভরে পায়ের ধূলা লইয়া নীচে উবু হইয়া বসিল। নিধু ঘরের এক কোণে গিয়া তামাক সাজিতে লাগিল।

শ্বশুর খানিকটা নিঝুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। অস্বস্তি বোধ হওয়ায় গোরাচাঁদ প্রশ্ন

করিল, "আপনি—আপনারা কেমন আছেন ?"

কোন উত্তর হইল না।

গন্‌শা ইশারায় তাগাদা করিল, হাতের কাছে অন্য কোন প্রশ্ন না পাওয়ায় গোরাচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, "এবার এদিকে বিষ্টি কেমন হল ?"

নড়চড়ন পর্যন্ত নাই। গন্‌শা আবার প্রশ্ন করিতে তাগাদা করিল, গোরাচাঁদ ভীতভাবে হাত নাড়িয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, "চটে যায়।"

আবার খানিকক্ষণ নিঝুম। একটা ঝোঁক কাটিয়া গেলে শ্বশুর হঠাৎ মাথা তুলিয়া বলিলেন, "হুঁ, গোরাচাঁদ এসেছ, না ?"

গোরাচাঁদ ব্যাকুলভাবে একবার গন্‌শার দিকে চাহিয়া উত্তর করিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তাই তো !"—আবার খানিকটা চুপচাপ, শুধু গোরাচাঁদের চেয়ার সামলানোর ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হইল দুই-তিনবার।

নিধিরাম তামাক সাজিয়া দিয়া এক পাশে বসিল।

হুঁকায় কয়েকটা টান দিয়া গোরাচাঁদের শ্বশুর একটু চাঙ্গা হইলেন। বলিলেন, "তখন থেকে চুপ করে তাই ভাবছি। হাঁরে নিধে, বাড়ির সবাই বিয়ে-বাড়ি নেমন্তন্নে গিয়ে বসে রইল. জামাই খাবেন কি ?"

নিধিরাম কলিকাটির দিকে অর্ধমুদ্রিত সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া ছিল, নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলিল, "সেই কথাই তো ভাবছি !"

গোরাচাঁদের মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। গনশা একটু চাপা, তবু তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, সেও হতভম্ব হইয়া গিয়াছে। দুইজনেই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া শ্বশুর কি স্থির করে, সেই প্রত্যাশায় একটু চুপ করিয়া রহিল। আরও খানিকক্ষণ তামাক টানিয়া নিধিরামের দিকে হুঁকাটা বাড়াইয়া শ্বশুর বলিলেন, "ভাবিয়ে তুললে যে ! উপোস করে থাকবেন ?"

নিধিরাম কলিকাটা পাক দিয়া হুঁকা হইতে খুলিতে খুলিতে বলিল, "রামঃ, সে কি হয় ?"

"উপায় ?"

নিধিরাম পরম ভক্তিভরে কলিকাটা মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, "বাবা আছেন।"

বাবা—এ প্রান্তে তারকেশ্বরের সাধারণ নাম।

গন্‌শা গোরাচাঁদের পানে ঠোঁটটা কুঞ্চিত করিয়া মাথা নাড়িল, অর্থাৎ আর কোন আশা নাই।

"আমি বলি,"—বলিয়া গোরাচাঁদ কি বলিতে যাইতেছিল, নিধিরাম হাসিয়া বলিল, "তুমি যা বলবে, বুঝতেই পারছি দাঠাকুর, খবর দিয়ে আসতে পার নি বলে আর খুব রাত হয়ে গেছে বলে পথে শেওড়াফুলিতে খেয়ে এসেছ, এই তো ? শুনেছেন জামাইবাবুর কথা কর্তা ?"

নেশাটা চটিয়া যাইতেছে, জামাইয়ের হাঙ্গামা না মিটাইলে অব্যাহতি নাই ; বৃদ্ধ মিটিমিটি করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "দুৎ ! সে তুই আমি করতাম বলে কি ও ছেলেমানুষেরাও করবে ? না সেটা উচিত হত ?"

অর্থটা দিনের আলোর মতই স্পষ্ট, গন্‌শা ও গোরাচাঁদ বিমূঢ়ভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল।

গোরাচাঁদ কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, পেটুক মানুষ, পাছে বেমানান কিছু বলিয়া বসে—সেই ভয়ে গন্‌শা তাড়াতাড়ি বলিয়া দিল, "আজ্ঞে বললে বিশ্বাস যাবেন না, দাঠাউর সত্যিই

খেয়ে এসেছেন।"

গোরাচাঁদ গন্‌শার দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া মরীয়া হইয়া আবার কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কপালদোষে হঠাৎ একটা ঢেঁকুর ঠেলিয়া বাহির হইল। তবু যথাসম্ভব সামলাইয়া লইয়া বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা সোডা—"

গন্‌শা তাহার দিকে একটা ভ্রূকুটি করিয়া মুখ ঘুরাইয়া লইয়া বলিল,"খাবেন না সোডা ? তি-তিন গণ্ডা রসগোল্লা পোয়াটাক কচুরি-সিঙারা মিলিয়ে, পো-খানেক মিহিদানা—এইসব খেলেন, শেষে আমি বললাম—"

গোরাচাঁদ হতাশভাবে চাহিযাছিল। তার মুখের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া গন্‌শা বলিল, "শেষে আমি বললাম, দা'ঠাউর একটা সোডা খেয়ে নাও ; তাঁরা তো সেখানে খাবার জন্যে জেদাজেদি করবেনই—"

নিধিরাম বলিল, "করব না জেদাজেদি ? ঘরের জামাই এলেন, বাঃ !"

গন্‌শা ক্রমাগত চোখ-টেপানি দিতেছে। আর কোনও আশা নাই দেখিযা গোরাচাঁদ নিরুৎসাহ কণ্ঠে যতটা সম্ভব জোর দিযা বলিল, "দুখীরামের কথা শুনে আমি বললাম, হাজার জিদ করলেও আমি আর খেতে পারব না। শেষকালে কি মারা যাব ?"—বলিয়া চেষ্টা করিযা আর একটা ঢেঁকুর তুলিল।

শ্বশুর নিধিরামের নিকট হইতে কলিকাটা লইয়া বলিল, "আমার কিন্তু বাপু বিশ্বাস হচ্চে না যে জামাই পথেই খেয়ে এসেছেন। নিধে কি বলিস ?"

হাঙ্গামা-পোহানোর ভয়ে নিধিরাম অনেকটা সামলাইযা আনিয়াছে, আবার কাঁচিয়া যায় দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "অবিশ্বাসের তো হেতু দেখছি না কর্তামশাই ; লতুন জামাই মিছে কথা বলবেন কি ? তায় আপনার মত দেবতুল্যি শ্বশুর !"

"তাই তো !"—বলিয়া বৃদ্ধ আরও খানিকটা চিন্তা করিলেন, তাহার পর উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন, "আমি বলি কি নিধে,জামাইকে না হয় নেমতন্নবাড়ি নিয়ে যা না কেন, ততক্ষণ আমাতে আর—এটির নাম কি ?"

গোরাচাঁদ উৎসাহভরে বলিল, "দুখীরাম।"

"আমাতে আর দুখীরামে বসে বসে গল্প করি না হয়।...বেহাই বেহানঠাকরুন আছেন কেমন দুখীরাম ?"

"বেশ আছেন।"—বলিয়া গন্‌শা তাড়াতাড়ি বলিল, "আজ্ঞে, আমি তো জা-জ্ঞান থাকতে দা'-ঠাউরকে একলা ছেড়ে দিতে পারব না। এই সাপখোপের দেশ ; কর্তাবাবু বললেন, দুখীরাম, ম-মলমাস, ছেলেটা যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে থাকবি, খ-খ-খবরদার !"

গোরাচাঁদ হাসিবার চেষ্টা করিযা বলিল, "নিধু খুব বিচক্ষণ লোক গন— দুখীরাম, ও আবার ঝাড়ফুঁকও জানে। তোর কোন ভাবনা নাই ; নিশ্চিন্দি হয়ে বাবার সঙ্গে গল্প কর, আমি একটু হয়ে আসি। কথা হচ্ছে, খিদে তো এক্কেবারেই নেই, কিন্তু শাশুড়ী-ঠাকরুণকে দেখবার জন্যে প্রাণটা কেমন আইঢাই করছে ; অনেকদিন পায়ের ধুলো নিই নি কিনা !"

গন্‌শা ভিতরে ভিতরে জ্বলিয়া খাক হইতেছিল ; গোরাচাঁদের দিকে একটা উগ্র কটাক্ষ হানিয়া সংযতভাবে কহিল,"বি-বিবিনি পায়ের ধুলোয় যখন চারটে মাস কাটালে চোখ কান বুঁজে, ত্যাখন আর একটা কি দুটো ঘণ্টা কোন রকমে কাটাও না দা'ঠাউর, মা-ঠাকরুণ এক্ষুনি নেম্তমন্ন খেয়ে ফিরবেন ছিচরণ সঙ্গে নিযে।"

শ্বশুর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সে আজ সমস্ত রাত আসবে না, তারা কেউ না ; সম্পর্কে

আমার নাতনীর বিয়ে কিনা, গিন্নী বাসর জাগবে—ওকি ! ধর ধর।"

শেষ আশা একটু ছিল শাশুড়ীর ; সেটুকুও যাওয়ায়, গভীর নিরাশায় শরীরটা হঠাৎ শিথিল হইয়া পড়ায় গোরাচাঁদ ভাঙ্গা চেয়ার হইতে আছাড় খাওয়ার দাখিল হইয়াছিল, গন্‌শা নিধিরাম ধরিয়া ফেলিল।

শ্বশুর বলিলেন, "আহা, ঘুম ধরেছে !"

নিধিরাম বলিল, "চাপ খাওযা হয়েছে কিনা।"

শ্বশুর উঠিয়া বলিলেন, "তবে বাবাজী চল, দুর্গা-শ্রীহরি বলে শুয়েই পড়বে চল। খিদে যখন নেই-ই বলছ, শুধু প্রণাম করবার জন্যে কোশটাক পথ ভাঙার মাঝরাত্রে কি দরকার ? ওঠ তা হলে। দুখীরামকে না হয় গোটাকয়েক খইচুর এনে দোব।"

গন্‌শা উত্তর দেওযার আগে গোরাচাঁদ প্রতিহিংসাবশে বলিল, "না না, খাওযাব ওপর খেযে একটা কাণ্ড করে বসবে শেষে ; ওর ভরসাযই বাবা আমায় এখানে পাঠিয়েছেন মলমাস অগ্রাহ্যি করে।"

গন্‌শার পানে না চাহিয়া শ্বশুরের পিছনে পিছনে ভিতরে চলিয়া গেল।

৫

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক কাটিল। গোরাচাঁদ ভিতর-বাড়িতে ক্ষুধার জ্বালায এবং খাদ্য সম্বন্ধে হতাশায বিছানাতে পড়িয়া এপাশ-ওপাশ করিতেছিল, এমন সময়ে ঘরেব দুযারেব কাছে গন্‌শা ডাকিল, "দা'ঠাউর !"

গোরাচাঁদ উত্তর দিতে যাইতেছিল, নিধিরামের গলার আজয়াজ শুনিল, "ঘুমে এলিযে পড়েছেন, আর তুলে কাজ নেই। তুমি তা হলে এই দোবগোড়াটায় শুয়ে থাক দুখীরাম ভাই, আমি যাই কর্তার কাছে ; এই শতরঞ্চি রইল।"

নিধিরাম চলিয়া গেলে গন্‌শা ভিতর-বাড়ির কপাট বন্ধ করিযা যখন ফিরিয়া আসিল, গোরাচাঁদ তখন ধীরে ধীরে ডাকিল, "গন্‌শা !"

"জেগে আছিস ?"—বলিয়া গন্‌শা দুযার ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল।

গোরাচাঁদ চিঁচিঁ করিয়া বলিল, "ঘুমুতে পারছি না ভাই, আর সা...ও হচ্ছে না। এসসা খিদে গন্‌শা ! মনে হচ্ছে ঘুমুলে আর ওঠা হবে না, জামাইকে ওদের সকালে ধরাধরি করে টেনে বের করতে হবে।"

গন্‌শা মশার কামড়ে চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "চাকর সেজে এলে আবার মশারি দেবে না মনে ছিল না রে—উঃ ! তার ওপর দু বেটা আফিমখোরের বক্তাব ! নেশা চটে গেছে কিনা।"

গোরাচাঁদ বলিল, "তাও যেমন ভগবান দযা করে ভুল গাড়িতে চড়িযে দিযেছিলেন, যদি রেখে দিতেন—। পেটটা খালি থাকলে পুড়ে যাওয়ার মত জ্বালা করে রে ! জানতাম না। নিধেটা কি ধড়িবাজ দেখেছিস ?"

গন্‌শা বলিল, "দুটোই। খিদেয় মরছি, অথচ কেমন বলিয়ে নিলে, খেযে এসেছি। এসা কোণঠাসা করে এনেছিল যে, না-ন্না বললে আর মান থাকত না।"

খানিকটা চুপচাপ গেল। তাহার পর গন্‌শা মাথাটা মশারির মধ্যে গলাইয়া দিয়া পূর্বের চেয়েও চাপা গলায় বলিল, "গোরে, এক মতলব বের করেছি ; ভাবছি, রাজী হবি কিনা, তোর

আবার শ্বশুরবাড়ি কিনা !"

গন্শার মতলব বাহির করায় কত বড় বড় সমস্যার সমাধান হয়। গোরাচাঁদ পরম আগ্রহে বলিয়া উঠিল, "কি মতলব রে গন্শা ?"

"বুড়ো সেই খইচুবের কথা বলেছিল— ?"

"দিয়েছে নাকি ?"—বলিয়া গোরাচাঁদ মশারি জড়াইয়া এক রকম পড়-পড় হইয়া নামিয়া গন্শার সামনে দাঁড়াইল।

গন্শা বলিল, "দেয় নি, ত-ত্তবে বাড়িতেই তো আছে।"

গোরাচাঁদ গন্শার দিকে একটু বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া থাকিয়া একেবারে গলা নামাইয়া বলিল, "চুরি ?"

গন্শা উপরে নিচে মাথা নাড়িল।

গোরাচাঁদ ঝোল টানার শব্দ করিয়া বলিল, "জামাই হয়ে—তাই বলছিলাম ; কিন্তু কেই বা দেখছে ! আব এসা চমৎকার খইচুর এখানকার গন্শা ; সন্দেশ রসগোল্লা ফেলে—"

"ভাঁড়ার-ঘর কোনটে জানিস ?"

গোরাচাঁদ আবার ভাঁড়ারঘর চিনিবে না—তাও শ্বশুরবাড়ির ! বলিল, "উঠোনের ওদিকে রান্নাঘরের পাশে—হ্যাঁরে গন্শা, আমার একটা-আধটায় হবে না ; কমে গেলে ওরা সব টের পেয়ে যাবে না যে জামাই রাত্তিরে উঠে এই কাণ্ডটি—"

"গা-গা-গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল ; আগে চল্ নিয়ে, যদি তালা দেওয়া থাকে তো আবার—"

গোরাচাঁদের বুকটা যেন ধসিয়া গেল ; ভীত নিরাশ দৃষ্টিতে বলিল, "তা হলে ?"

"চল্ না, ইডিয়ট !" বলিয়া গন্শা তাহাকে একটা ঠেলা দিল। বালিশেব তলা হইতে দেশলাইটা লইল।

প্রদীপ লইয়া সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে গোরাচাঁদ বলিয়া উঠিল, "তোরই মতলবের ওপর আমার এক মতলব এসে গেল গন্শা ; বান্নাঘরটাও অমনই আগে একবার দেখে নিলে হয় না ? কপাল যেমন তাতে যে কিছু পাব—তবু ধব, যদি ওবেলার ভাজা মাছটা আশটা—"

গন্শা বলিল, "হ্যাঁ চল্ ; কখনও কখনও জল দিয়ে পান্তা করেও রাখে মেয়েবা, খুব তোয়াজ বোঝে কিনা, নেমন্তন্ন খেয়ে শরীরটা গরম হবে।"

উঠান পার হইয়া রকে উঠিয়া গোরাচাঁদ উৎফুল্লভাবে বলিল, "তালা দেওয়া নেই বে গন্শা, ভগবান বোধ হয় এবার মুখ তুলে চাইলেন।"

ভগবান সত্যই মুখ তুলিয়া চাহিয়াছিলেন । রান্নাঘরে প্রবেশ করিতেই দুইজনে দেখিল, সামনে একটা শিকেয় টাঙানো একটা বেশ সাইজের হাঁড়ি, তাহার উপর একটা জামবাটি, তাহার উপর একটা কড়া ; পাশে আর একটা শিকেয় একটা পিতলের কড়া।

একটা বিড়াল উনানের পাশে বসিয়াছিল, ইহাদের দেখিয়া লাফাইয়া জানালায় উঠিয়া বসিল।

গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি গিয়া পিতলের কড়াটায় আঙুল ডুবাইয়া বাহির করিয়া লইল, উল্লাসে চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বলিল, "দুধ রে গন্শা—মিল্ক !"

গন্শা বলিল, "নামা !"

চঞ্চল হাতে নামাইতে গিয়া একটু সরসুদ্ধ দুধ চলকাইয়া গোরাচাঁদের কপালের উপরটায় পড়িয়া গেল। বাঁ হাতে সরটি মুছিয়া মুখে দিয়া গোরাচাঁদ বলিল, "বেশ মোটা সর রে ! দুটো

বাটি পাওয়া যেত !"

গনশা বলিল, "আগে হাঁড়ির শিকেটা দেখে নে। এই রে, তোর কপালে কড়ার কালি লেগে গেল যে !"

সৌন্দর্যের দিকে গোরাচাঁদের খেয়াল ছিল না। "ঠিক বলেছিস, দুধটা শেষ পাতের জিনিস কিনা !"—বলিয়া কপালটা ডান হাতে মুছিয়া অন্য শিকাটার দিকে অগ্রসর হইল।

গনশা বলিল, "আমি ধরছি শিকেটা, তুই একটা একটা করে পাড়্। আবার জামায় হাতটা মুছলি বুঝি ? এঃ, ভূত হয়ে গেলি যে !"

গন্শা শিকের একটা দড়ি ধরিল। গোরাচাঁদ উপরের কড়াটায় আঙুল ডুবাইয়া বলিল, "ঝোল, গন্শা !"—আঙুলগুলো চালাইয়া উত্তেজিতভাবে বলিল, "মাছের ঝোল !"

আর তর সহিতেছিল না, গোটাকতক মাছ বাহির করিয়া মুখে ফেলিয়া আনন্দের চোটে গনশার হাতটা ধরিয়া ফেলিল, বলিল, "পুঁটিমাছের টক মাইরি !"

গন্শার উঁচু-করা মুখে জল আসিয়াছিল, একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "তা হ'লে হাঁড়িতে নির্ঘাত পান্তা আছে ; জামবাটিটা দেখ্ তো ? আমার হাত ধরতে গেলি কেন ? দেখ্ তো, আমায়ও বাঁদর বানিয়ে ছাড়লি !"

জানালার উপর একটা বিড়াল বিস্মিত-দৃষ্টিতে এই অভিনব দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করিতেছিল, ডাকিল—মিউ।

গোরাচাঁদ বলিল, "তাড়া তো বেটিকে। ভাগীদার জুটেছেন !"

গন্শা বলিল, "না, না, আমি এক মতলব ঠাউরেছি, যাবার সময় সব ফেলে-ছড়িয়ে বেড়ালটাকে ঘরে বন্ধ করে যাব।"

"তোর এতও মাথায় খেলে মাইরি !"—বলিয়া গোরাচাঁদ সপ্রশংস দৃষ্টিতে বন্ধুর পানে চাহিল, তাহার পর বলিল, "ঠিক করে ধরিস, আমার হাতটা কাঁপছে।"

৬

কড়াটা বাঁ হাতে একটু তুলিয়া জামবাটির মধ্যে হাত দিতে যাইবে, এমন সময় বাহিরের রকের এ কোণটায় বাঘা উৎকট স্বরে ঝাউ ঝাউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। একে ” মকা, তায় চোরের মন, দুইজনেই একসঙ্গে চমকিয়া উঠিল এবং তাহাদের হস্তধৃত দড়ি ও কড়াটা কাঁপিয়া গিয়া কড়াটা বাঁকিয়া প্রায় অর্ধেকটা মাছ আর ঝোল হড়হড় করিয়া গোরাচাঁদের মাথার উপর পড়িল। গন্শা একটা লাফ দিয়া পিছনে সরিয়া গেল, কিন্তু তবু যে নিতান্ত বাদ গেল, এমন নয়।

সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের দরজার নিকট হইতে আওয়াজ আসিল, "বাঘা, আমরা সব ; থাম্।"

ঝোলে-বোজা চোখে কোন রকমে পিটপিট করিয়া চাহিয়া গোরাচাঁদ দেখিল, গন্শা চোখ দুইটা বড় করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে ; অতিমাত্র ভীত ও চাপাস্বরে বলিল, "আমার সম্বন্ধী—শিবুদা !"

গন্শা জিজ্ঞাসা করিল, "উপায় ?"

আওয়াজ অগ্রসর হইতে লাগিল—বিয়েবাড়ির চর্চা। সবাই রকে উঠিল। শিবু বাহিরের দুয়ারের কড়া নাড়িয়া ডাকিল, "বাবা, ও বাবা ! নিধে ! দুজনেই নিঃসাড় ! এই নিধে !"

কর্তার গলারই উত্তর হইল, "এলি তোরা ? জামাই এসেছেন, সঙ্গে চাকর নিয়ে।"

দুয়ার খোলার শব্দ হইল। প্রবেশ করিতে করিতে শিবু প্রশ্ন করিল, "আমাদের গোরাচাঁদ ! কখন এল ?"

গন্‌শা ফিসফিস করিয়া ডাকিল, "গোরে !"

গোরাচাঁদ কাঠ হইযা গিযাছে, একবার নিজের অম্লসিক্ত শরীরটা দেখিযা বিহ্বলভাবে গন্‌শার পানে চাহিয়া রহিল।

সদর দুয়ারে করাঘাত হইল। গোরাচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলব বল্ তো গন্‌শা ? কাপড় জামাটা ছেড়ে—"

গন্‌শা বলিল,"পাগল ! সময়ই বা কোথায ? আর সুট্‌কেশটাও বাইরে !"

ঘন ঘন করাঘাতের সঙ্গে তাগাদা হইল, "গোরাচাঁদ, দোর খোল হে !"

"জামাইবাবু !"

গন্‌শা অতিমাত্র চঞ্চল হইয়া বলিল, "পালাতে হবে গোরে, খিড়কিটা কোন্ দিকে বল তো ?"

এত বিপদেও গোরাচাঁদের এ সম্ভাবনাটা মনে হয নাই ; চরম বিস্ময়ের সহিত বলিল, "পা—লা—তে হবে ! শ্বশুরবাড়ি যে ! আর সত্যিই তো, তা না হলে—"

বাহিরে শোনা গেল, "নিধে, তুই ওদিক থেকে একটু হাঁক দে তো। শালা যেন কুম্ভকর্ণ ! আর চাকরটাই বা কি রকম...দোর খোল হে !"

জোর কড়া নাড়ার শব্দ হইল, কপাটে দু-একটা লাথিরও ঘা পড়িল।

এমন সময, যেখানটায কুকুর ডাকিয়া উঠিযাছিল, সেখানটায নিধিরামের শঙ্কিত কণ্ঠ শোনা গেল, "দাদাবাবু, রান্নাঘরে আলো দেখছি যে ! মা-ঠাক্‌রুণ জ্বেলে রেখে গিযেছিলেন নাকি ?"

"কই, না ! হে বাবা তারকেশ্বর !"—মেযে-গলার কাঁপা আওযাজ হইল।

খানিকক্ষণ একেবারে চুপচাপ। শিবু নিধিরামের কাছে আসিয়া বলিল, "সত্যিই তো ! আর দু—"

গোরাচাঁদ এক ফুৎকারে আলোটা নিবাইযা দিল। গন্‌শা খুব চাপা গলায বালিল, "কি করলি গাধা !"

"নিবিয়ে দিলে ! চোর ! চোর ! বাবা, জেনেশুনে চোর ঢোকালে বাড়িতে !... নিধে !"

"দেখলাম জামাই, সেই রকম মুখ চোখ, কথাবার্তা ; দিব্যি প্রণাম করলে।"

"তবে আর কি ! প্রণাম করলে ! শীগগির খিড়কি আগলাগে নিধে, নিশে বাগ্‌দীকে হাঁক দে। ও রতনের মা ! ও সামন্ত, সামন্ত !"

একটু দূরে বনের মধ্য হইতে আওয়াজ আসিল, "এজ্ঞে !"

"শীগগির এস সড়কিটা হাতে করে, দু শালা ঢুকেছে।"

"এলাম। সটকায না যেন, একসঙ্গে গাঁথব। রতনের মা, তোর সেই কাটারিটা নিযে বেরো।"

গন্‌শা আর গোরাচাঁদ ঘর ছাড়িয়া উঠানের মাঝামাঝি জড়সড় হইযা দাঁড়াইয়া ছিল, গোরাচাঁদ একসঙ্গে গাঁথার কথায় একটু সরিযা দাঁড়াইল।

আওয়াজ হইল, "নিধে !"

"আমি এই খিড়কিতে বাঘাকে নিয়ে।"

গন্‌শা চারিদিকে চাহিয়া নিরাশভাবে বলিল,"কি করা যায় ?" তাহার পর হঠাৎ

গোরাচাঁদের পায়ের নিকট হইতে একটা আধলা ইট কুড়াইয়া লইয়া বলিল, "হয়েছে, চল্ খিড়কির দিকে, তুইও পিঁড়েটা তুলে নে।"

গোরাচাঁদ শঙ্কিতভাবে বলিল, "খুন করে পালাবি নাকি নিধেকে ?"

গনশা বলিল, "আর বাঘাকে। নয়তো কি খু-খু-খুন হব সামন্তর সড়কিতে ? কোনটে খিড়কি ? এগো।"

কি হইত বলা যায় না, কিন্তু এই সময় কুকুরটা হঠাৎ নিধিরামের নিকট হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে কি একটা তাড়া করিয়া রান্নাঘরের পিছনে গেল এবং সেখানে থাবা গাড়িয়া বসিয়া উঁচু মুখে প্রবল সোরগোল লাগাইয়া দিল।

শিবু একটু লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আবার রান্নাঘরে ঢুকেছে। সবাই এই দিকটা চলে এস, এখনও আছে শালারা। নিধে, আয় দিকিন, সামন্ততে আর তোতে পাঁচিল ডিঙিয়ে ওদিকে পড়। বাঘা, ঠিক চোখে চোখে রাখবি ঐ ভাবে।"

বাঘা রাখিতেও ছিল, কালো বিড়ালের মত শত্রু আর তাহার নাই। বাঘাহীন খিড়কিতে নিধিরামের পা থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি সারিয়া আসিয়া সবিক্রমে বলিল, "হ্যাঁ, ওঠ তো সামন্ত খুড়ো ; দাও সড়কিটা ধরে থাকি ততক্ষণ।"

গনশা ও গোরাচাঁদ গিয়া খিড়কি ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। যেই বুঝিল,নিধিরাম সরিয়া গিয়াছে, দোর খুলিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইল। গনশা খুব সন্তর্পণে শিকলটা তুলিয়া দিল। খুব অন্ধকার, ঝোপঝাপ। গোরাচাঁদ অগ্রসর হইল। হাতটা পিছনে করিয়া গনশার জামা ধরিয়া খুব চাপা গলায় বলিল, "আয়, একটু ঘুরে গিয়ে সদর রাস্তা। বাঘা সরে নি, ওরা বাড়ি নিয়েই থাকবে একটু।"

গনশা প্রশ্ন করিল, "খা-খানা ডোবা নেই তো--তি-ত্রিলের শ্বশুরবাড়ির মত !"

গোরাচাঁদ বলিল, "না, তবে বাত্তিরে যাঁদের লতা বলতে হয় তাঁদের উৎপাত আছে ; "আস্তিকস্য মুনির্মাতা" বলতে থাক গনশা,- -চাপা গলায়—যাতে শুধু মা মনসাই শুনতে পান।"

এত বিপদেও বাড়িটার দিকে চাহিয়া তাহার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। বলিল, "একটা রাতও কাটল না , বউ ওদিকে নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছে—"

শিবপুর স্টীমার জেটির রেলিঙে হেলান দিয়া মুখামুখি দাঁড়াইয়া রাজেন, ত্রিলোচন, কে.গুপ্ত, গনশা আর গোরাচাঁদ। রাজেন প্রশ্ন করিল, "তারপর, গোরের শ্বশুরবাড়ি কেমন লাগল গনশা ?"

ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল, "এক রাত্তির থেকেই চলে এলি যে বড় ?"

গোরাচাঁদের মনটা অপ্রসন্নই ছিল, একটু ব্যঙ্গের সুরে উত্তর করিল, "শ্বশুরবাড়ি এক রাত্তিরের বেশী থাকলে মান থাকে নাকি ?"

ত্রিলোচন বলিল, "সে কথা নয়, মানে, দিলে যে বড় আসতে ?"

গনশা কুটা না কি একটা দাঁতে কাটিতেছিল ; গঙ্গার দিকে চাহিয়া বলিল, "আসতে কি দি-দিতে চায় ? অনেক ক-কষ্টে -"

আর শেষ করিতে পারিল না। কথাটা বাড়ি ঘেরাও করিয়া আটকানো, খিড়কি দিয়া পালানোর সঙ্গে এমন মিলিয়া গেল যে, আপনিই যেন তাহার গলার স্বর মাঝপথে বাধিয়া গেল।

স্বয়ংবর

১

শিবপুর স্টীমার ঘাট। জেটির কাছে ঘাসের উপর সব বসিয়া আছে,--গন্শা, ঘোঁৎনা, কে. গুপ্ত, গোরাচাঁদ আর রাজেন। ত্রিলোচন উপস্থিত নাই, শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে।

ছযটা-বাহান্নর স্টীমার আসিয়া লাগিল। আর সব প্যাসেঞ্জার বাহির হইয়া গেলে ছোটখাটো একটি পশ্চিমা বরযাত্রীর দল নামিল, বোধ হয তক্তাঘাট হইতে আসিয়াছে। বরের কানে দুইটা বড বড কুণ্ডল, গাযে ফিনফিনে সবুজ সিল্কের পাঞ্জাবি, গলায় আরও মিহি জাপানী সিল্কের গোলাপী রঙের চাদর। মাথায় প্রচুর তেল এবং চোখে প্রচুর কাজল। জেটি হইতে বাহির হইয়া বোধ হয নিজের বিশিষ্টতাকে আরও ফুটাইয়া তুলিবার জন্য সে চোখে কেমিকেলের ফ্রেমের একটা নীল চশমা আঁটিয়া একটা হাওয়াগাড়ি সিগারেট ধরাইল।

স্টীমার ছাড়িয়া গেলে গন্শারা সব আসিয়া জেটির রেলিঙে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। খানিকক্ষণ চুপচাপের পর রাজেন বলিল, "এদের খুব ছেলেবেলাযই দিব্যি বিয়ে হয়ে যায়, নিশ্চিন্দি।"

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। একটু পরে ঘোঁৎনা জিজ্ঞাসা করিল, "গনৎকারের কাছে তো গেছলি গন্শা, কি বললে র‍্যা ?"

গন্শার মুখটা একটু কুঞ্চিত হইল মাত্র, কোন উত্তর না দিয়া দূরে হাওড়ার পুলের দিকে চাহিয়া রহিল। গোরাচাঁদ বলিল, "আম্মো তো সঙ্গে ছেলাম। বললে, বউ তো ওদিকে ডাগোরডোগোরটি হয়ে তোয়ের রয়েছে, কিন্তু গন্শার আজ্জন্মের একটা দোয আছে, সেটা না খণ্ডালে তো বিয়ে হতে পারে না। তাতে কম করে সারতে গেলেও সওয়া পাঁচ টাকা লাগবে। ...না গেলেই ছেল ভাল, -ওর মামা অত টাকা বের করবে না, মাঝে পড়ে বউ কোথায় ডাগর হয়ে উঠেছে শুনে ভাবনায় ও বেচারীর মনটা..."

রাজেন বলিল, "যা যাঃ, ওসব ধাপ্পাবাজি, বিশ্বাস করি না।"

গন্শা হাওড়ার পুল হইতে দৃষ্টি সরাইয়া অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিল, "তৃ-তুই কি বলতে চাস, এখনও হা-হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে ?"

রাজেন বলিল, "না, তোর বউয়ের কথা বলছি না, সে তো ডাগরটি হবেই শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে। বলছি এই গনৎকারের কথা- তুই বিশ্বাস করিস ? এই দোস খণ্ডানোর কথা ?"

গন্শা কোন উত্তর দিল না। ঘোঁৎনা বলিল, "বিশ্বাস না করে কি করবে ? শানাপাড়ায 'কায়েৎ মহারাজ' বলে এক সাধু এসেছেন। বলছেন নাকি এত দিন আত্মবিস্মৃত হয়ে ছিলেন, হঠাৎ যোগনিদ্রায স্বপ্ন দেখেছেন তিনি আসলে চিত্রগুপ্তের নাতজামাই। মন বড্ড উতলা হয়ে উঠেছে। শীগ্‌গিরই দেহত্যাগ করবেন। সেখানে গিয়ে চিত্রগুপ্তের খাতা থেকে নাম কাটিয়ে দেবেন বলে, যে-সব পুরানো পাপী হাতে-পায়ে ধরেছে তাদের নামধাম একটা খেরোর খাতায লিখে নিচ্ছেন ঃ পনর টাকা ফি--বলেন, দাদাশ্বশুরের একটা মন্দিরের ব্যবস্থা

করেই দেহ রাখবেন—উকিল, ব্যারিস্টার, এটর্নির ভিড লেগে গেছে। বল—তারা ঠকবার লোক ?"

গোরাচাঁদ বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আগে আমিও কয়েক দিন গেছলাম—যা খেতে চাইবে মুঠো খুলে হাতে দিযে দিত। এখন শুনেছি আর সময় পায় না। আর এখন গেলে কেমন যেন গা ছম্‌ছম্‌ করে লোকটাকে দেখে। ওর দাদাশ্বশুর যমের পাশেই বসে খাতা লেখে কিনা !"

গন্‌শা একটা বিডি ধরাইয়া নীরবে টানিতে লাগিল। রাজেন বলিল, "সত্যিই যদি আরজন্মের কোন দোষে বিযে হচ্ছে না তো, কাটাবার কি আর উপায় নেই ? তীর্থ-টীর্থ কবা, গঙ্গাস্নান করা...আর বিডি-সিগারেটগুলোও ছাড গন্‌শা—নেশাও একটা পাপ তো ?..."

কে. গুপ্ত বলিল, "গঙ্গাস্নানের তো একটা মস্ত বড যোগও আসছে—দশহরা..."

ঘোঁৎনা বলিল, "ঠিক হয়েছে বে !" এধারের রেলিং থেকে ওধারের রেলিঙে গিয়া গন্‌শার মুখোমুখি হইয়া বলিল, "সেদিনকাব গঙ্গার ঘাটের মেলাব জন্যে বাজেশিবপুর থেকেও এবার ভলাণ্টিয়াব দল গডছে। চল্‌ না, গঙ্গাস্নানও হবে, লোকসেবাও হবে ; যদি সত্যিই কিছু দোষটোষ থাকেই তো একসঙ্গে দুটো পুণ্যির ধাক্কায..."

গোরাচাঁদ বলিল, "আর ওদেব বেশ খ্যাটের বন্দোবস্তও আছে, শিবপুরের দলের সঙ্গে ওরা টেক্কা দিচ্ছে কি না..."

বাজেন বলিল, "তাহলে দেখ্‌ না গন্‌শা, ন্যাযরত্ন মশাই বলছিলেন—এর পরেই উপরোউপরি তিনটে ভাল লগ্ন রযেছে, যদি সত্যিই কেটে যায দোষটা...অন্ততঃ গনৎকাবের কথাটা হাতে হাতে মিলিযে দেখবাব মস্ত একটা সুবিধে।"

গন্‌শা বোধ হয পুণ্য অর্জনেব হাতেখডি হিসাবে অর্ধদগ্ধ বিডিটা গঙ্গায ফেলিযা দিযা প্রশ্ন করিল, "নে-ন্নেবে ভলাণ্টিযার ? যাই তো কিন্তু সবাই যাব।"

ঘোঁৎনা বলিল, "লুফে নেবে গণেশের দল শুনলে। শিবপুব সেবা-সংঘের এরাই তো কতবাব বলেছে আমায়—ঘোঁতন, তোমাদের সবাই এস না : একটা সৎ কাজ।—তখন গা করি নি। অবিশ্যি এখন আব ওবা নিচ্ছে না, বন্ধ করে দিযেছে।"

২

পরের দিন সকালে ছয়জনে স্বেচ্ছাসেবকদলে ভর্তি হইবার জন্য বাহির হইল। বাত্রে ত্রিলোচন আসিয়াছে। তাহার শ্বশুরবাডির গল্প শুনিতে শুনিতে সকলে চৌধুরী-পাডার রাস্তা ধরিযা বাজেশিবপুরের দিকে অগ্রসর হইল এবং এ-গলি সে-গলি করিযা একটা দোতলা বাডির সামনে আসিযা দাঁডাইল। রেলিং-দিযা-ঘেরা সামনে ছটাকখানেক বাগান। ঘোঁৎনা বলিল, "এই তো সতের নম্বর !"

গন্‌শা জিজ্ঞাসা করিল, "এই বাডিটাই ? লোকজন কাউকে তো দেখছি না !"

ঘোঁৎনা উত্তর করিল, "নম্বর তো সতের ঠিকই রযেছে। আয না দেখাই যাক।" বলিয়া ভেজানো ফটক ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। ইতস্তত করিতে করিতে একে একে সবাই অনুসরণ করিল—শুধু গোরাচাঁদ সব পিছনে ফটকের একটা পাল্লা ধরিযা দাঁডাইয়া রহিল।

বাড়িটার গম্ভীর আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া সবাই একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল।

ত্রিলোচন বলিল, "একটা হাঁক দে না, ঘোঁৎনা।"

ঘোঁৎনা তাহার দিকে ঘুরিয়া বলিল, "তুই দে না। পথ দেখিয়ে নিয়েও আসবে, ডেকেও দেবে, তারপর বলবি গাড়ি করে ফিরিয়ে নিয়ে চল্—আবদার!"

গন্‌শা চটিয়া উঠিয়া বলিল, "প-প্পথ দেখিয়ে কোন্ চুলোয় নিয়ে এলি আগে তাই বল্ তো? ভ-ভলেণ্টিয়ার তো গিজ্-গিজ্ করছে দেখছি!"

এমন সময় উপরের বারান্দায় কালো মোটাগোছের একটি মাঝবয়সী লোক বাহির হইয়া প্রশ্ন করিল, "কি চাই আপনাদের?"

সকলে পরস্পরের মুখের দিকে একবার চাহিল। ঘোঁৎনা বলিল, "আজ্ঞে চাই না কিছু।"

"তবে?"

"একবার নিচে আসবেন?"

গোরাচাঁদ নিঃসাড়ে ফটকের বাহির হইয়া দাঁতে একটা ঘাস চিবাইতে চিবাইতে রাস্তায় পায়চারি করিলে লাগিল। উপর হইতে রুক্ষস্বরে উত্তর হইল, "কিছু চাই না, অথচ নিচে আসতে হবে—মানে?"

রাজেন ঘোঁৎনাকে ফিসফিস্ করিয়া বলিল, "গুছিয়ে বল্ না, চটিয়ে তুলছিস যে!"

নিজেই সামনে একটু আগাইয়া গিয়া বলিল, "আজ্ঞে নামতে হবে না আপনাকে কষ্ট করে,—বলছিলাম গঙ্গাস্নানের মেলা হবে, তাই ভলেণ্টিয়ার..."

আরও রুক্ষ স্বর এবং বিকৃত ভঙ্গিতে উত্তর হইল, "তাই আমায় ভলাণ্টিযারি করতে হবে... ? তা রাজী আছি--বল তো নেমে একটু শক্তির পরিচয়ও দিই গিযে!"

গোরাচাঁদ বাড়ির সুমুখ হইতে সরিয়া গিয়া স্যাণ্ডাল জোড়াটা হাতে তুলিয়া লইয়া এবং মাথা নিচু করিয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁতে বুড়া আঙ্গুলের নখ খুঁটিতে লাগিল।

গন্‌শা ঘোঁৎনার পিছনে নিজের জায়গায় সরিয়া আসিয়া বলিল, "আজ্ঞে না, ইয়ে...ভ-ভলণ্টিয়ার তো আমরা—দশহরার মেলার—গঙ্গার ঘাটে—"

"বাড়িটাকে গঙ্গার ঘাট বলে ভুল করবার মত কিছু পাচ্ছ কি সব?" গলা আরও কর্কশ হইয়া উঠিল, "ভজুয়া... !"

রাজেন গন্‌শার জামার খুঁটে টান দিয়া নিম্নস্বরেই বলিল, "চল্, বুঝতেই পাবা যাচ্ছে এ বাড়ি নয়। সব কথার উল্টো মানে করছে—"

গোরাচাঁদের সহিত এদের দেখা হইল অনেকটা দূরে গলির একটা মোড়ের অন্তরালে। সে স্যাণ্ডালে পা সাঁদ করাইতে করাইতে একটু অপ্রতিভ হইয়া প্রশ্ন করিল, "ভজুয়া বেটা বেরিয়েছিল নাকি?"

গন্‌শা ভেঙচাইয়া বলিল, "তুই আর কথা কস্ নি গোরে, ঘেঁন্না ধরালি! পা-প্পালালি কি বলে র‍্যা? এদিকে ভলেণ্টিয়ারি করবার শখও আছে!"

গোরাচাঁদ পূর্বে পূর্বে এর প্রতিবাদ করিত, আজকাল তাহার এ-দুর্বলতাটুকুর প্রমাণের সংখ্যা নিয়তই বৃদ্ধি পাওয়ায় চুপ করিয়া চলিতে থাকে; সে দলের মাঝখানে একটি নির্বিঘ্ন জায়গা করিয়া লইয়া চলিতে লাগিল। সবাই মন-মরা হইয়া গিয়াছে; কিছুক্ষণ কেহ কোন কথাই কহিল না। শেষে ঘোঁৎনা নিতান্ত যেন মৌনতার অস্বস্তিটা এড়াইবার জন্যই বলিল, "কেন যে এমনটা হল ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।"

কে. গুপ্ত বলিল, "আপনি বোধ হয় ঠিকানাটা ভুল শুনেছিলেন।"

ঘোঁৎনা বিরক্তির সহিত বলিল, "আপনি কি বলতে চান ওটা সতের নম্বর ছিল না? একের পিঠে সাত তাহলে কি হয় বলুন তো শুনি? তেষট্টি?"

কে. গুপ্ত একটু থতমত খাইয়া বলিল, "না, সে কথা বলছি না, বলছি বোধ হয় অন্য কোন নম্বর বলেছিল।"

"অন্য নম্বর বললে আমি সতের বলতে যাব কেন মশাই? আমাকে বলেছিল ছিয়ানব্বই, আমি এসে বললাম সতের?—আপনাকে কেউ যদি বলে গন্‌শাকে একবার ডেকে দিন, আপনি ত্রিলোচনকে ধরে নিয়ে আসবেন?"

কে. গুপ্তর প্রশ্নটা সকলেরই মনে জাগিয়াছিল ; কিন্তু ঘোঁৎনার তর্কের ভাষা ও ভঙ্গি দেখিয়া কেহ আর উত্থাপন করিল না।

কে. গুপ্ত স্বভাবতই একটু মোটাবুদ্ধি, পেঁচালো তর্কের ধাঁধায় পড়িয়া চুপ করিয়া গেল এবং কি ভাবে তাহার মনের কথাটা গুছাইয়া বলা চলে ভাবিতে লাগিল।

ত্রিলোচন গন্‌শাকে বলিল, "তোর বোধ হয় বিয়ের ফুলটা এখনও ফোটে নি গণেশ, নইলে—"

গন্‌শার মনটা অত্যন্ত খিচঁড়াইয়া ছিল, উষ্মার সহিত বলিল, "ন-ন্নৈলে ঐ কেলে যমদূতটা ভলেণ্টিয়ারিতে নাম লিখে নিত? তোর বিয়ের ফুলই ফুটেছে তিলে, বু-বুদ্ধিব ফুল কিন্তু শুকিয়ে আসছে..."

কে. গুপ্ত একটু ভয়ে ভয়ে ঘোঁৎনাকে বলিল, "না, আমি সে-কথা বলছি না ; বলছিলাম ধরুন, যাকে আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন সেও তো ভুল বলতে পারে..."

ঘোঁৎনা আবার একটু ধমকের সুরে বলিল, "পৃথিবীতে এত লোক থাকতে আমি বেছে বেছে এমন লোককেই জিজ্ঞেস করতে যাব কেন শুনি? আর তার নিজেরই যদি সন্দেহ থাকবে তো বলতেই বা যাবে কেন মশাই?"

কে. গুপ্ত আবার চুপ করিযা গেল এবং একটু পরে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ডগা দাঁতে চাপিযা চিন্তা করিতে লাগিল।

গোরাচাঁদ বলিল, "তা হলে শুধু গঙ্গাস্নানই করে নে গন্‌শা। দশহরার দিন ভোর থেকে এসে গঙ্গায় পড়ে থাকা যাবে এখন। মা গঙ্গা যদি মুখ তুলে চান তো পুণ্যির একটু ব্যবস্থা করে দেবেন না?—দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে একটা-আধটা অ্যাক্‌সিডেণ্ট হবে না?—অত বুড়ী-টুড়ী, কচি ছেলেমেযে সব আসবে। আমার হাতের কাছে যেটা পড়বে সেটা তোকেই দিযে দেব।"

রাজেন বলিল, "হ্যাঁ, সেবা করা নিয়ে বিষয়, ভলেণ্টিযার হয়েই যে সেবা করতে হবে শাস্ত্রে এমন কথা তো ধরে লিখে দেয নি?"

ত্রিলোচন বলিল, "স্ত্রী স্বামীর সেবা করে কি করে? সে তো আর ভলেণ্টিয়ার নয়?"

গন্‌শার মাথায় মা-গঙ্গার মুখ তুলে চাওয়ার কথাটা ঘুরিতেছিল : বিরক্তভাবে বলিল, "ধ্যাৎ, আর ঠা-ঠ্ঠাকুর দেবতার ওপর বিশ্বাস চলে যাচ্ছে। যদি দ-দ্দয়াই হবে তো আজ ছ-বছর থেকে ভোগা দিচ্ছে কেন?"

গোরাচাঁদ পাঞ্জাবির পকেটে দুইটা হাত সাঁদ করাইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় কে. গুপ্ত বলিয়া উঠিল, "নিন ঘোঁতনবাবু, এবার কি বলবেন বলুন!"

আর সবার কাছে একটু অপ্রতিভ হইয়া ঘোঁৎনা কে. গুপ্তকে মাঝে মাঝে থাবা দিয়া

একটা তৃপ্তি এবং সান্ত্বনা পাইতেছিল, বলিল, "কি শুনতে চান বলুন ?"

"আপনি বাড়িটা রাধানাথ মিত্তিরের গলিতে বলেছিলেন না ?"

"এখনও তো বলছি মশাই, কারুর ভয়ে নাকি ?"

"ঐ দেখুন।"

কয়েক পা সামনে গলিটা মোড় ফিরিয়াছে, আর সেই মোড়ে অন্য দিক দিয়া একটা সরু গলি বাহির হইযাছে। সেই মোড়ে একটা জরা-জীর্ণ কাঠের ফলকে গলিটার নাম লেখা রাহিয়াছে। পাশের দেওয়ালের পিছন থেকে একটা পেঁপের ডাল ভাঙ্গিযা পডিযাছে বলিয়া ফলকটা ভাল করিয়া দেখা যায না ; ক্রমাগত ঠকিযা কে. গুপ্তেব নজব ঐদিকে ছিল বলিযা সে দেখিতে পাইয়াছে—সকলে পড়িল, 'রাধানাথ ঘোষ লেন'।

সকলে একটু হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ঘোঁৎনার মনে হইতেছিল, কে. গুপ্তকে চিবাইযা খায়। নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলিল, "তাই তো দেখছি, একটু যেন ভুল হয়ে গেছে।"

গন্‌শা অত্যন্ত চটিযা গিয়াছিল। মুখটা বিকৃত করিযা বলিল, "তুই কি ভেবেছিলি যখন ঘোষ-মিত্তির দুই-ই কু-কুলীন কায়েৎ, তখন গলিতেও বেশি তফাৎ হবে না ?"

দলের মধ্যে এক ঘোঁৎনাই গন্‌শাকে সব সময খাতিব করে না, রাগিযা কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় ত্রিলোচন দুজনের মাঝখানে দাঁডাইয়া বলিল, "একটা শুভ কাজে নেমে তোরা ঝগডা করতে লাগলি ! আমার একটা মতলব এসেছে- থাম্ দিকিন তোরা।"

সকলে উদ্‌গ্রীব হইযা তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। ত্রিলোচন বলিল, "এই কইপুকুরেব কাছাকাছি ন্যায়রত্ন মশায থাকেন। তাঁকে খুঁজে বের করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে-- পুরুতমানুষ, শিবপুর বাজে-শিবপুরের অলিগলি নখদর্পণে।"

গোরাচাঁদ একটু উৎসাহিত হইল, বোধ হয পুরোহিতবাড়ির সন্দেশ, কলা, নারকেলনাড়ুর কথা মনে পড়িল। বলিল, "মন্দ নয়, জলতেষ্টাও পেযেছে বেজায।"

রাজেন বলিল, "তাহলে সামনে কেমন দিন-টিন আছে সেটাও একবাব দেখিযে নেওয়া যায়।"

গন্‌শার মেজাজটা ঠিক হয নাই। রুক্ষস্বরে বলিল, "খুব মতলব খাড়া করেছিস-- সতের নম্বর বাড়ির জন্যে ন্যাযরত্ন মশায়ের বাড়ি খোঁজ, ন্যাযরত্ন মশাযেব বাড়ি খোঁজবার জন্যে শিষ্যিদের বাড়ি খোঁজ, তা-ত্তাদের বাড়ি খোঁজবার জন্যে..."

এমন সময় রাজেন, ত্রিলোচন, কে. গুপ্ত তিনজনে একসঙ্গে চীৎকাব কবিযা উঠিল, "ওই ন্যাযরত্ন মশায আসছেন !—নাম করতেই !"

৩

সত্যই দেখা গেল, তালতলার চটি পায়ে নামাবলী গাযে ন্যায়রত্ন মহাশয সামনের একটা বাড়ির বারান্দা হইতে নামিতেছেন। সবাই যেন হাতে স্বর্গ পাইল, অবশ্য এক গোবাচাঁদ ভিন্ন। ঘোঁৎনা অগ্রসর হইয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কানের উপযোগী আওযাজ করিয়া বলিল, "প্রণাম হই ন্যায়রত্ন মশাই।"

সবাই ফিরিয়া দাঁড়াইল।

ন্যায়রত্ন মহাশয় ডান কানটা আগাইয়া আনিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি বলছ ?"

ঘোঁৎনা বলিল, "প্রণাম হই, প্রণাম।"

আরও কাছে কানটা আনিযা ন্যায়রত্ন মহাশয বলিলেন, "ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না, কাল উপবাস ছিল কিনা, কাহিল হযে রয়েছি বলে কানটা একটু..."

গন্‌শা বলিল, "ক-ক্কপালে হাত ঠেকিযে বল্ না বাপু—'কাহিল হযে রযেছি!'...করে যে কা-ক্কাহিল কম তা তো বুঝি না!"

রাজেন বলিল, "পেন্নামের হাঙ্গামা তুলে দিয়ে কাজের কথাটাই পাড়্ না একেবারে—তোরও যেমন ভক্তির বোখ চেপে গেছে!"

গোরাচাঁদ বলিল, "তার চেযে ওঁর বাড়িই নিযে চল ওঁকে; মাঝরাস্তায চেঁচামিচি করার চেয়ে বরং...একে তো এমনিই গলা শুকিয়ে কাঠ..."

ঘোঁৎনা কপালে যুক্তকর ঠেকাইয়া বলিল, "এই প্রণাম করছি!"

"দীর্ঘজীবী হও, রাজরাজেশ্বর হও, তা কোথায এসেছ তোমরা? রোদে ঘুরে ঘুরে মুখ যে রাঙা হযে গেছে।....গণেশ...?"

গন্‌শা বাজে কথার দিকে গেল না, চেঁচাইয়া বলিল, "রাধানাথ মিত্তিরের গলি জানেন? ঘোঁৎনা বে-ব্বেশি ওস্তাদি করতে গিযে রাধানাথ ঘোষের গলিতে এনে চচ্চরকি ঘোরাচ্ছে।"

ঘোঁৎনা বিরক্ত ভাবে মুখটা ঘুরাইয়া লইল।

ন্যাযরত্ন মহাশয হাসিযা রাজেনের দিকে চাহিলেন। সে আরও চেঁচাইয়া বলিল, 'জিগ্যেস করছে—রাধানাথ মিত্তিরের গলি চেনেন?"

"খুব চিনতুম, সে তো মারা গেছে।"

রাজেন নিরাশ ভাবে একটু এলাইয়া পড়িযা বলিল, "এ এক দোসরা ফেসাদে পড়া গেল। 'রাধানাথের গলি চেনেন না?'—না সে তো মারা গেছে!'

এমন অবস্থায ন্যাযরত্ন মহাশয কখনো কখনো চটিযাও যান আবার।

সেই দিকটা সামলাইযা ত্রিলোচন বলিল, "মারা গেছেন শুনে বড কষ্ট হল। তাঁর গলিটা চেনেন?" রাস্তাটার উপর ইশারায হাতটা চালাইয়া বলিল, "গলি—গলি!"

"ও বুঝেছি, সে তো এখানে নয। আমার সঙ্গে এস; ওই দিক হয়েই না-হয় চৌধুরীদের বাড়ি চলে যাব। তারু চৌধুরীর খুড়ীর বড কঠিন পীড়া শুনেছি, চান্দ্রায়ণ করবার জন্যে একবার বলে দেখি।....এই গোরাচাঁদ, তোমাদেরই তো পাড়ার; কেমন আছে বলতে পার যদুনাথের পরিবার? আহা, যদু চৌধুরী ছিল..."

গোরাচাঁদের মুখটা যেন শুকাইযা গেল, সহজ ভাব দেখাইবার চেষ্টা করিযা বলিল, "আজ্ঞে, তিনি তো দিব্যি সেরে উঠেছেন। কাল গেছলাম—ডেকে গাযে হাত বুলিযে কত জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আপনি কষ্ট করে আর যাবেন না; বুড়োমানুষ,—এই কাঠফাটা রোদ্দুর। আমাদের গলিটা দেখিযে ফিরে আসুন।"

পিছনে সরিযা আসিযা অত্যন্ত চটিযা হাত-পা নাড়িযা গন্‌শাকে বলিল, "দেখ্ তো বে-আক্কেলপনা!—সে ধুঁকছে—এখন-তখন—সঙ্গে কেত্তনপার্টি বেরুবে, সব ঠিকঠাক করছি—কদ্দিনকার আশা—ওর মাঝে পড়ে আবার তাকে চান্দ্রাযণ করে চাঙ্গা করে তোলবার চেষ্টা! এ কি শত্রুতা বল্ দিকিন!...এর ওপরও যদি যেতে চায বলব পাঁচটা সাহেব ডাক্তারে ঘিরে আছে, তাদের কুকুর নিযে—বাজে লোককে ভিড়তে দিচ্ছে না—বিশেষ করে পুরুতদের।...কদ্দিন পরে একটা চান্স্! শুনছি নাকি আবার বৃষোৎসর্গ করবে!"

গন্‌শা ব্যঙ্গ-হাসিতে ঠোঁট দুইটা একটু কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তুই বোকা, বুঝিস না। ও চা-চান্দ্রায়ণ করলে আরও শীগ্‌গির টেঁসে যাবে বরং। একে বদ্ধ কালা হয়ে গেছে, তায় আবার ভয়ঙ্কর ভুলো মন, একটা বিঘ্নিটিঘ্নি হবেই, ভ-ভ্‌-ভগবান না করুন।"

গোরাচাঁদের মুখটা আবার পরিষ্কার হইল। তবুও একটু সন্দিগ্ধ হাসি হাসিয়া বলিল, "যা, ঠাট্টা করছিস্‌! ওদিকে একজন মরতে বসেছে আর গন্‌শার যেন ফুর্তি বেড়ে গেছে! যা..."

গন্‌শা ভারিক্কে হইয়া বলিল, "গগ্‌-গন্‌শা সব কথা নিয়ে ঠাট্টা করে না।"

রাস্তার ডান দিকে একটা গলি আরম্ভ হইয়াছে, ন্যায়রত্ন মহাশয় দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন, "এই রাধু মিত্তিরের গলি, আমি তা হলে চললাম। তাহলে যদুনাথের পরিবার ভালই আছে বলছ গোরাচাঁদ? শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। আজ আর হল না, অপর এক দিন দেখে আসব'খন।"

গন্‌শার অভিমত শুনিয়া গোরাচাঁদের মনটা খুঁৎখুঁৎ করিতেছিল। সে চিন্তিতভাবে নিজের দলের সঙ্গে খানিকটা অগ্রসর হইল, তাহার পর ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া দাঁতে বুড়ো আঙুলের নখ খুঁটিল এবং দ্বিধা না করিয়া ফিরিয়া দ্রুতপদে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পাশে গিয়া বলিল, "একটা কথা ভুলে যাচ্ছিলাম ন্যায়রত্ন মশাই, দরকারী কথা—ভাগ্যিস মনে পড়ে গেল। ওই যে বললাম কিনা—যদু চৌধুরীর স্ত্রী—চৌধুরী-জ্যাঠাইমা আমার গায়ে হাত বুলিয়ে কত কথা জিগ্যেস করলেন!—সে সময় একটা কথা বলে দিয়েছিলেন—মাথার দিব্যি দিয়ে—বললেন, গোরে, বাবা, ওদিকে যখন যাবি একবার ন্যাযরত্ন ঠাকুবকে ডেকে দিস; সেরে তো উঠলাম, কিন্তু কবে আছি কবে নেই—তাঁব দযার শরীর; একবারটি বললেই আসবেন। কুলের পুরুত, দেবতার সমান কিনা!...তাহলে না-হয় এখুনি হয়ে আসবেন একবার—ঠাণ্ডা থাকতে থাকতে?"

৪

গঙ্গাদশহরা। এবাব যোগটা বিশেষ গোছের; অত্যন্ত ভিড় হইয়াছে। একে ভিড তায ছোটবড় অনেকগুলি ভলাণ্টিয়ারের দল; রেষারেষির ঝোঁকে তাহারা প্রায় বাড়ি হইতেই সেবার জন্য পিছনে লাগিয়াছে। সমস্ত যাত্রীর—বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকদের এবং তাহার মধ্যেও আবার আরও বিশেষ করিয়া বৃদ্ধাদের—মনটা প্রায়ই বড খিচডাইযা রহিয়াছে ব্যাচওলা ভলাণ্টিয়ারদের ওপর।

ভলাণ্টিয়ারদের চেষ্টা অণুমাত্র ত্রুটি হইতে দিবে না। ঘাটের কাছে বাঁশ দিযা মেয়েপুরুষের রাস্তা আলাদা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে প্রবেশ-পথের মুখে বাছাইযের জন্য ভিড় জমিয়া উঠিযাছে। এসব মেলায় একটু ষাঁড়-গোবুর আমদানি হয। অন্যান্যবার তাহাদের অগ্রাহ্য করা হইত, এবার তাহাদের গতিবিধিতেও ভেদাভেদ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করায় গোলমাল বাড়িয়াছে। একটা ষাঁড় মেয়েদের নির্দিষ্ট পথে কোন্‌ দিক দিয়া প্রবেশ করিয়া ফেলিয়াছিল। সে গোবু নয় বলিয়া তাহাকে বাহির করিতে সবাই লাগিয়া যায়। সেও বাঁশের বেড়া ভাঙিয়া, যাত্রী-ভলাণ্টিয়ার মর্দিত করিয়া জানাইয়া গেল—সে সত্যই গোবু নয়।

লোকে—বিশেষ করিযা বৃদ্ধারা—স্নান করিয়া যেটুকু পুণ্য অর্জন করিতেছে, সেটুকু

অভিশাপে সদ্য সদ্য ব্যথিত করিয়া বাড়ি ফিরিতেছে।

বাজেশিবপুরের দল তেমন জমে নাই—তেমন কেন, মোটেই জমে নাই বলা চলে। ওরা শিবপুর সেবাসংঘের সঙ্গে টেক্কা দিয়া কেতাদুরস্ত ভাবে গঠনকার্য করিতে চাহিয়াছিল। সকালে বিকালে মিলাইয়া ঝাড়া পাঁচ ঘণ্টা ড্রিল, তার পর সামনের ধোপাপুকুরে সাঁতার। যাহারা সাঁতার জানিত, তাহাদের অনেকের সর্দিগর্মি হওয়ায় ছাড়িয়া দেয়। যাহাদের হাতেখড়ি হইতেছিল তাহাদেরও বেশির ভাগ সাজিমাটি গোলা পানাপুকুরের জল উদরস্থ করিয়া পীড়িত হইয়া পড়ে। এখন কয়েকজন ব্যাজ লাগাইয়া মনমরা হইয়া কাশিতে কাশিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শত্রুপক্ষের ভলাণ্টিয়াররা রটাইতেছে, "কাশি-ই ওদের ব্যাজ !"

গন্‌শা প্রভৃতি পুণ্যার্জনের পূর্বে প্রায়শ্চিত্তের বহর দেখিয়া ছাড়িবে ছাড়িবে করিতেছিল, এমন সময়ে খবর পাইল সমস্ত ভলাণ্টিয়ারের মধ্যে সাহস এবং কার্যকুশলতার জন্য কয়েকটি স্বর্ণপদক দেওয়া হইবে বলিয়া কে একজন নাম গোপন করিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

রাজেন কবি, বলিল, "মেডেল পেলে আবার অনেক সময় প্রেমও হয়ে যায় গন্‌শা ; ধর, কোন বড়লোকের মেয়ে যদি ভালবেসে ফেললে, তখন তোর মামাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে পারবি।"

মেডেলের লোভেও, আবার অন্য কোন কাজের অভাবেও ওটা আর ছাড়া হয় নাই।

গন্‌শা, ঘোঁৎনা আর রাজেন জেটির উপর দাঁড়াইয়া আছে। উপকারের সুবিধাও হইতেছে না এবং কিভাবে করিতে হয় জানাও নাই। মোটামুটি একটা ধারণা ছিল, এমন বড় বড় যোগে খুব ডুবিয়া মরে ; কিন্তু যাহাকেই ডুব দিতে দেখিতেছে তাহারই মাথা আবার জল ফুঁড়িয়া উঠিতে দেখিয়া বেজায় নিরাশ হইয়া পড়িতেছে। শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়াইয়াছে যে, পুণ্য অর্জনে হতাশ হইয়া মনে হইতেছে এক-একটা মাথা জলে টিপিয়া ধরিতে পারিলে গায়ের জ্বালা মেটে। দুবার আক্রোশের দাঁত কড়মড়ানি শোনা গেল : কার ঠিক ধরা গেল না—সম্ভবত গন্‌শা কিংবা ঘোঁৎনার।

গোরাচাঁদ, কে. গুপ্ত এবং ত্রিলোচন এখানে নাই ; তাহারা তিনজনে দুর্ঘটনার প্রত্যাশায় ভিড়ের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু কোন দুর্ঘটনাই তাহাদের হাতে ধরা পড়িতেছে না। অথচ দুর্ঘটনার যে নিতান্ত দুর্ভিক্ষ পড়িয়াছে এমন নয়। একটা বৃদ্ধা কি রকম ভাবে হঠাৎ উঁচু-নীচুতে পা মচকাইয়া বেসামাল হইয়া যায় ; প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল, শিবপুরের দল সন্ধান পাইয়া এম্বুলেন্স খাটে করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল। একটা গুণ্ডা একটি ছোট মেয়ের কানের দুল ছিঁড়িয়া লইয়া পালাইতেছিল, শিবপুরের ব্যাজ-পরা একটি ভলাণ্টিয়ার ধরিল ; এমন কি একটি স্ত্রীলোক স্নান করিতে করিতে মৃগী-রোগাক্রান্ত হইয়া প্রায় সাবাড় হইবার দাখিল হইয়াছিল, যেন পাতাল ফুঁড়িয়া কোথা হইতে সেবাসঙ্ঘের একটা ভলাণ্টিয়ার তাহাকে বাঁচাইল এবং বেশ ঘটা করিয়াই তাহাকে ক্যাম্পে লইয়া গেল।

গোরাচাঁদ বলিল, "এরা বেশ কপাল করে নেমেছে, টপাটপ কেমন পেয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের পোড়া অদৃষ্টে..."

ত্রিলোচন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "গন্‌শাটার জন্যে কষ্ট হচ্ছে। নিজে না পা'ক, যদি আমরাও একটা হাতে তুলে দিতে পারতাম, তবুও ষোল আনা না-হোক কতকটা পুণ্যি হল মনে করে বুক বাঁধতে পারত ! এ যেন দেখছি একেবারে মুষড়ে পড়বে বেচারা।"

গোরাচাঁদও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে যাইতেছিল, মাঝপথে থামিয়া সম্মুখে একস্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল এবং ত্রিলোচনের কাঁধে হাত দিয়া উৎসুকভাবে প্রশ্ন করিল, "তিলে দেখেছিস ?"

ত্রিলোচন গলাটা উঁচু করিয়া সামনে দেখিল, কিন্তু কিছু বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন কবিল, "কি র‍্যা ?"

"ওই যে মেয়েটা..."

"হুঁ, তা কি ?"

"ইডিয়ট্—দেখতে পাচ্ছিস না ? নিশ্চয় কোন অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে, নাহলে ও রকম ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চারিদিকে চাইবে কেন ?"

"তাহলে নিয়ে আসব গন্‌শাদের ডেকে ?"

"হ্যাঁ, এমন না হলে আর বুদ্ধি ! আমবা ডাকতে যাই আর সেই তালে শিবপুর এসে কেল্লা ফতে করে নিক্। ওকে হাত করে বরঞ্চ কাছে নিয়ে যাওয়া যাক্ !"

গোরাচাঁদ পা বাড়াইল, ত্রিলোচনও অগ্রসর হইল এবং শ্যেনদৃষ্টি শিবপুরের দলের ভয়ে কাহারও ঘাড়ের উপর দিয়া, কাহাবও কাঁকালের নিচে দিয়া, ঠেলিয়া, মাড়াইয়া দুইজনে লক্ষ্যস্থলে এক রকম ছুটিয়া চলিল—কেহ গাল দিল, কেহ বা রাগের চোটে গালাগাল খুঁজিয়া না পাইয়া উগ্র বিষাক্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল,—দুজনেব মধ্যে কেহই সেদিকে দৃক্‌পাত করিল না।

একটি ফুটফুটে বছর পাঁচেকের মেয়ে জল থেকে খানিকটা দূরে ইঁটের গাঁথুনি যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানে একটা শুক্‌না কাপড়, নামাবলী আর ঘটি কোলেব কাছে কবিয়া বসিয়াছিল। গোরাচাঁদ উৎকণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করিল, "কি হয়েছে তোমার খুকী ?"

মেয়েটি ভ্যাবাচাকা খাইয়া দুজনের মুখের দিকে চাহিল।

গোরাচাঁদ বলিল, "বল কি হয়েছে, তোমার কিছু ভয় নেই।"

একটি পশ্চিমা স্ত্রীলোক স্নান করিয়া মাথা ঝাড়িতেছিল, তাহার পাশ দিয়া সামনে আসিয়া ত্রিলোচন বলিল, "ভয় কি ? আমবা ভলেণ্টিয়ার, এই দেখ।" বলিয়া বুকে পিন-আঁটা রেশমের ফুলটা দেখাইয়া দিল।

মেয়েটি শুক্‌নো মুখে ব্যাজটির দিকে চাহিয়া রহিল।

গোরাচাঁদ বলিল, "তুমি কার সঙ্গে এসেছিলে বল তো খুকুমণি ?"

ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল, "মার সঙ্গে ?...বাবাব সঙ্গে ?...ঠাকুমার সঙ্গে ?"

মেয়েটি মুখ চুন করিয়া একটু রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "না, দিদিমার সঙ্গে।"

মেলার ব্যাপার, ততক্ষণে ছেলেরা, মেয়েব, বুড়োয় অনেকগুলি লোক ইহাদের ঘিবিয়া ফেলিয়াছে। একজন প্রশ্ন করিল, "কি হয়েছে মেয়েটির ?"

গোরাচাঁদ বলিল, "ওর দিদিমার সঙ্গে এসেছিল, সে ডুবে গেছে।....তুমি কেঁদ না খুকু। আমরা তোমায় তোমার মার কাছে বেখে আসব।"

কে. গুপ্ত সান্ত্বনা দিবার জন্য বুদ্ধি করিয়া বলিল, "আর দিদিমা তো বুড়োও হয়ে গিয়েছিল খুকুমণি..."

একটি নিম্নশ্রেণীর লোক উৎসুকভাবে শুনিতেছিল ; বলিল, "সে কথা কইলে কি ছেলেমানুষ শোনে বাপু ? তাছাড়া দিদিমা আর কার লবযুবতী হয়ে থাকে বলুন তো !"

মেয়েটি এতক্ষণে কোন রকমে সামলাইয়া ছিল, এবার "ও দিদিমা গো" বলিয়া

একেবারে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। আরও লোক জমা হইয়া গেল এবং মাঝখানে পড়িয়া নানাবিধ প্রশ্নের আবর্তে মেয়েটি ক্রমেই ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। উত্তর আর দিবে কে ? অঝোরঝোরে কান্নার মধ্যে তাহার কেবলই এক কথা "দিদিমাকে এনে দাও...দিদিমার কাছে যাব !"...

খাঁটি, দুর্লভ অ্যাক্সিডেন্ট্। আবিস্কার করার জন্য গোরাচাঁদ আর ত্রিলোচন ভিতরে ভিতরে ফুলিতেছিল, সবার মোড়লিতে একটু বিরক্তও যে না হইতেছিল এমন নয়। ত্রিলোচন বলিল, "আপনারা যে যার কাজে যান না মশাই। বাজেশিবপুর সেবক-সংঘের হাতে পড়েছে, ও আর কোন ভয় নেই।...কোনখানে তোমার দিদিমা ডুবেছিল, খুকু ?"

মেয়েটা একদিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইতে সেখানে ভিড়টা পৃথক হইয়া গেল, গঙ্গার উপর নজর পড়ায় মেয়েটি আরও জোরে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "ওইখানটায়...ওগো দিদিমা গো !"

বৃত্তটা আবার জুড়িয়া গিয়া মেয়েটাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। একজন আধবয়সী নিম্নশ্রেণীর লোক বলিল, "ওখানে তো জল বেশি নয়, তবে...'

একজন বয়স্থগোছের লোক বলিল, "কাল পূর্ণ হলে—বলে গোষ্পদেই ডুবে মরে, ওখানে তবুও তো এক কোমর জল রয়েছে..."

সেবা-সংঘের হাতের জলে-ডোবার কেসটা দেখিয়া ত্রিলোচনের হিংসা লাগিয়াছিল ; বলিল, "মিরগি ছিল সে বুড়ীর, নাহলে কখনও কি আর অতটুকু জলে ডোবে !"

একজন পরামর্শ দিল, "তা হলে জাল ফেলে জায়গাটা একবার ছেঁকে ফেলা দরকার ; পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে ?"

ত্রিলোচন বিরক্তভাবে বক্তার দিকে চাহিয়া বলিল, "পুলিসে জাল ফেলার কি জানে মশাই, জাল ফেলা কাকে বলে যদি দেখতে চান তো একটু দাঁড়ান।" কে. গুপ্তর পানে চাহিয়া বলিল, "যান তো, গন্শাকে ডেকে নিয়ে আসুন তো, আর তার আগে আমাদের ক্যাম্পে—(ভিড়ের দিকে চাহিয়া) বাজেশিবপুর সেবা-সংঘ ক্যাম্পে বলে যান যে শীগ্গির একটা জালের বন্দোবস্ত করে পাঠিয়ে দিক্।"

কে একজন বলিল, "তবেই হয়েছে ! ওনাদের গণেশঠাকুর আর জাল এসতে এসতে বুড়ী ত্যাতক্ষণ উলবেড়েয় ঠেলে উঠবে। আর তানারে ক্লেশ দেওয়া কেন বাপু, তিনি তো মা-গঙ্গার কিরপেয় দিব্যি গিয়েছে, এখন মেয়েটারে ঘরে লিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন, বেজায় কাঁদতেছে।"

ত্রিলোচন গন্শার অবর্তমানে বড় অস্বস্তি বোধ করিতেছিল ; অনেক কষ্টে পাওয়া কেস, কি করিতে হইবে ঠিকমত জানা নাই, তাহা ভিন্ন সেবা-সংঘের দল হাঁ করিয়া আছে, পুলিস আছে। বলিল, "তবে গনশাকেই শীগ্গির ডেকে আনুন।...আর মিরগি রুগী, বাঁচিয়েই বা কি হবে ? আজ বাঁচাও কাল আবার জল ঘুলিয়ে মরবে—মেহনৎই সার...চুপ কর খুকু তুমি, এক্ষুনি তোমার মার কাছে নিয়ে যাচ্ছি !"

গোরাচাঁদ বলিল, "হ্যাঁ, মাঝে পড়ে সে বেচারীর বুড়ো বয়সে দুবার মরবার কষ্ট, একে তো একবার মরতেই লোকের কণ্ঠাগত প্রাণ !"

গোরাচাঁদ অগ্রসর হইবে এমন সময় সামনে ভিড়ের প্রান্ত হইতে প্রশ্ন হইল, "এখানে কি র‍্যা গোরে ?"

গন্শার আওয়াজ, মুহূর্তেই সে ভিড় চিরিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, পেছনে বাকি

দুইজন।

ত্রিলোচন, গোরাচাঁদ একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "একটা পেয়েছি গন্‌শা!"

গোরাচাঁদ বলিল, "তোকে ডাকতে যাচ্ছিলাম।"

রাজেন উৎসুকভাবে প্রশ্ন করিল, "কাদের মেয়ে?"

গোরাচাঁদ ফুর্তির চোটে বিশেষ ভাবিয়া না দেখিয়া উত্তর করিল, "ওর দিদিমার। মিরগি রুগী, ডুবে মরেছে।"

"ডু-ড্ডুবে মরেছে! কোন্‌খানে?"

ভিড়ের মধ্যে থেকে কয়েকজন অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "ঐ ওখানে বলছে খুকী।"

"একটা জাল নিয়ে আসুন না মশাই।"

"এরা তো তখন থেকে শুধু জল্পনাই করছে।"

"ভারি আমার চোটের ভলেণ্টিয়ার সব!"

গন্‌শা বলিল, "একমুঠো তি-ত্তিল ছুঁড়লে এখন একটাও জলে পড়বে না এমন ভিড়, জাল ফেলবেন কোথায় মশাই? আর সে কি ততক্ষণ জা-জ্জালের ভরসায় বসে থাকবে? চল ঘোঁৎনা—"

ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইতে হইতে বলিল, "আর তোরা দুজন মেয়েটাকে আগ্‌লা, তিলে আর গোরা।"

ইঁটের গাঁথুনির পরেই ভয়ানক কাদা, পিছল, ভিড। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে জেটির পণ্টুনের কাছে জল। টলিতে টলিতে সামলাইতে সামলাইতে চারজনে অগ্রসর হইল। ভিড়ের মধ্য হইতে কয়েকজন সঙ্গ লইল; তাহাদের কথাবার্তায় দু-চারজন করিয়া আরও লোক জমিতে লাগিল। জলের ধারে আসিয়া গন্‌শা পিছন ফিরিয়া জামা খুলিতে খুলিতে চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিল, "এইখানে তিলে?"

এদিকে ত্রিলোচনদের, ওদিকে গন্‌শাদের ঘিরিয়া দুটা ভিড় জমিয়া গিয়াছে, অত দূরে দেখা যায় না। ত্রিলোচন শব্দ লক্ষ্য করিয়া উত্তর দিল। এমন অপ্রত্যাশিত সাফল্যে একটু ইংরাজীর লোভ সামলাইতে পারিল না, ভিড়ের মধ্য হইতে হাত তুলিয়া গলাটা উঁচু করিয়া বলিল, "ইয়েস, দেয়ার!"

ঘোঁৎনা, কে. গুপ্তও জামা খুলিল, রাজেন ডাঙায় সকলের জামা লইয়া থাকিবে।

বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। গন্‌শা আবার গঙ্গামুখো হইতেই একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক প্রশ্ন করিল, "ওখানে ভিড কিসের বাছা?" স্নান করিয়া উঠিয়াছে, বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হইবে। দীর্ঘাকার, পুরুষালি ছাঁদের চেহারা, গলার স্বরও ভাঙ্গা কাঁসির মত ঝনঝনে, হাতে একটি পিতলের কমণ্ডলু—সের তিনেক জল ধরে।

গন্‌শা, শুধু গন্‌শা কেন, সকলেই একটু থতমত খাইয়া গিয়াছিল। স্ত্রীলোকটি শঙ্কিতভাবে প্রশ্ন করিল, "একটি মেয়ে বসেছিল—কিছু হয় নি তো তার?"

কে. গুপ্ত অবস্থাটা চট্ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, তাহা ভিন্ন একটু ছাপরেয়েগোছের চেহারা দেখিলে খুশি হয়, একটু আলাপ করিতে চায়; অগ্রসর হইয়া বলিল, "আজ্ঞে সে তো বেশ আছে...আমাদের হেফাজতে; তার দিদিমা মিরগি রুগী, ডুবে মরেছে। শুনে পর্যন্ত আমাদের মনটা..."

"কে ডুবে মরেছে!"—এক মুহূর্তে মূর্তি আর স্বরে যে পরিবর্তন হইল তা সেই জাতীয়

স্ত্রীলোকেরই সম্ভব। কমণ্ডলুর ডাণ্ডির উপর মুঠাটা কড়কড় করিয়া উঠিল।

সকলে, এমন কি কে. গুপ্ত শঙ্কিতভাবে দুই পা পিছাইয়া গেল।

"বলি কে ডুবে মরেছে? খেন্তীর দিদিমা? তাই বুঝি বলিয়েছিস তাকে দিয়ে? ভলেণ্টিযার সব, না?—উপ্‌গার হচ্ছে? খেন্তীর দিদিমা যদি মরে থাকে, অমর্ত-বামনীর মরা যদি এতই সহজ তো আমি কে র‍্যা ড্যাক্‌রা? এই কে তোর মুণ্ডুপাত করছে?"

বাঁ হাতটা বাঘের পাঞ্জার মত কে. গুপ্তর মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। ফুটবলের দাঁওপ্যাঁচে অভ্যস্ত থাকায একটা গোঁত্তা মারিয়া সে নিজেকে বাঁচাইয়া লইতেই থাবাটা কে. গুপ্তর পিছনেই রাজেনেব উপর গিয়া পড়িল। সে কবি বলিযা বাববি রাখে, মুঠাটা কড়াক্কড করিয়া জমিযা বসিল।

"ঠিক ধরেছি--এ-ই সন্দার! বল্ মেযেটাকে কোথায় রেখেছিস?"

রাজেন ঝাঁকানির মধ্যে আর্তভাবে ডাকিল. "গন্‌শা! গণেশ!!"

গন্‌শা জলে নামিযা পডিয়াছিল—তিনজনেই ; উত্তর করিল, "এক খাবলা পাঁক তুলে মাথায় দে রাজেন।"

স্ত্রীলোকটা মুঠা এবং ঝাঁকানি ঠিক রাখিযা, বরং উগ্রতব করিয়া মাথা ঘুবাইয়া বলিল, "বটে, পাঁক দিযে আমার মাথা ঠাণ্ডা করবে—নাতনী চুবি করে? মিবগি বুগী করে? মাথা গরমেব এখন দেখেছ কি? তুই আয না র‍্যা অলপ্পেযে, তুই আয না উঠে, দেখি কত পাঁক বইতে পারিস।"

সেই নিম্নশ্রেণীর লোকটি অগ্রসব হইযা আসিল, সভয় ভক্তিব সহিত যুক্তকব মাথায ঠেকাইযা বলিল, "আজ্ঞে মাঠা'ন, দা'ঠাউর ওনাকে নিজের মাথায পাঁক দিতে বলতেছে আর কি, এঁটেল মাটির পাঁক পেছল কিনা..."

"কে তুই? তুই নিজে এসে দে না। আয...কই, এগুচ্ছিস না যে?"

লোকটা তাডাতাডি পিছনের ভিডে একটা চাপ দিয়া অদৃশ্য হইযা গেল।

তাহার দিকে মনটা যাওয়ায মুষ্টিটা বোধ হয একটু আলগা হইযা গিয়া থাকিবে, রাজেন একটা মরি-কি-বাঁচি গোছের ঝাঁকানি দিযা নিজেকে ছাডাইযা লইল ; কিন্তু পিছল আর গঙ্গার ঢালুব জন্য আব সামলাইতে পারিল না, ওলট্-পালট্ খাইযা, কাহারও হাতের ঘটি ফেলিযা, কাহাবও আহ্নিক নষ্ট করিযা গঙ্গার গর্ভে গিয়া পডিল এবং প্রচণ্ড হুংকারের সহিত অমর্ত-বামনীকে ঘুরিযা দাঁড়াইতে দেখিয়া একটা ডুব-সাঁতাব দিয়া বহুদূরে গিয়া ফুঁডিযা উঠিল এবং দৈবক্রমে সেখানে আবার একটি স্ত্রীলোকের একেবারে সামনাসামনি হইযা উঠায সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা ডুব দিয়া একেবাবে মাঝগঙ্গামুখো হইল। ততক্ষণে চারিদিকে বেশ একটা হৈ-চৈ পডিয়া গিযাছে। কেহ বলিতেছে খুন হইযাছে, কেহ বলিতেছে ষাঁড ক্ষেপিয়াছে, কেহ বলিতেছে বান ডাকিবে ; কেহ অনেকটা কাছাকাছি আন্দাজ কবিযা বলিতেছে কচি মেযেব গলার হার চুরি। উহারই মধ্যে গন্‌শা একবার জাহাজের জেটিব উপর উঠিযা এক রকম তীব্র সাংকেতিক চীৎকারে ত্রিলোচনের দৃষ্টি আকর্ষণ কবিল।

ত্রিলোচন মুঠোটা বাঁশিব মত করিযা তার মধ্য দিযা তারস্বরে প্রশ্ন করিল, "ডেড্ উয়োম্যান গট্?"

গন্‌শা উত্তর করিল, "নট্ ডেড্, ডা-ড্ডাইং রাজেন,—বাজেনকে মেরে ফেলেছে, চুলের মুঠি ধরে ; তো-ত্তোরা সেইখানে চলে আয—মেযেটাকে ছেডে দিযে, নো মিরগি। ম্যানট্রেডমার্ক উয়োম্যান। এক্কেবারে বেটাছেলে মার্কা!...

শিবপুর ঘাট থেকে অনেকটা উত্তরে।

ভাঁটার জন্যে জলের কাছাকাছি একটা মাঝারি-সাইজের গাধাবোট কাৎ হইয়া আছে। লোক নাই ; অর্থাৎ গাধাবোটের লোক নাই, আছে গন্শা, ঘোঁৎনা, কে. গুপ্ত, গোরাচাঁদ। হঠাৎ দেখিলে কিন্তু কাহাকেও চিনিবার উপায় নাই—আর কেহ চেনে উহারাও সেজন্য ব্যস্ত নয়। ভলাণ্টিযারের ব্যাজ নাই এবং ব্যাজ আঁটিবার জামাও নাই গায়ে। গোরাচাঁদ একটা কামিজ পরিয়া আছে, যথাস্থানে নয়। কোমরের নীচে। বাঁধিবার কিছু না থাকায় কামিজের গলাটার এক জায়গায় ছিঁড়িয়া ফাঁদটা বড় করিয়া নাভিকুণ্ডলের কাছে বোতামটা আঁটিয়া গিয়াছে। হাঁটুর কাছে কামিজের হাতা দুইটা ল্টপট্ করিতেছে। কেহ বিশেষ কথা বলিতেছে না।

রাজেন আর ত্রিলোচন নাই। রাজেন একটু দূরে গঙ্গায় আবক্ষ ডুবিয়া যেন কিছুই হয় নাই এইভাবে কুলকুচি করিবার চেষ্টা করিতেছে। ত্রিলোচন না আসিলে উঠিবে না উঠিবার যো নাই।

ত্রিলোচন সবার জন্য কাপড় আনিতে গিয়াছে।

সাপের চেয়েও সাংঘাতিক

সন্ধ্যা হইয়া গেছে। রাজেন ঘোঁৎনা স্টীমারঘাটের রেলিং-এ ঠেস দিয়া হালকা গল্প করিতেছে। কে. গুপ্তকে গন্শার খোঁজে পাঠানো হইয়াছিল, আসিয়া বলিল, "দুপুরবেলা থেকে রামকেষ্টপুরে কোথায় কংস বধের পালা হচ্ছে, গন্শা দেখতে গেছে,—ওর মামাতো বোন বুঁচী বললে।"

এমন সময়ে দেখা গেল, খানিকটা দূরে ফোরশোর রোডের প্রায় কাছাকাছি গন্শা আর ত্রিলোচন নিতান্ত মন্থর আর নিস্পৃহ গতিতে এদিকে আগাইয়া আসিতেছে।

আসিয়া উভয়ে রাজেন-ঘোঁৎনার সামনাসামনি রেলিং-এ হেলান দিয়া দাঁড়াইল।

ঘোঁৎনা হাতের বিড়িটা গন্শার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "তোর মামাতো বোন বললে কংস বধ দেখতে গেছলি, কেমন করলে রে ?"

গন্শা বিড়িতে একটা টান দিয়া আঙ্গুলের একটা টোকা মারিয়া ছাইটা ঝাড়িয়া দিল, ধুঁয়া ছাড়িয়া মুখটা বিকৃত করিয়া বলিল, "যাঃ, শুধু ধা-ধ্বাষ্টামো।"

ত্রিলোচন বলিল, "বাউরীদের যাত্রা ছিল ; ছোটলোকদের কাণ্ড—কংস বেটা সত্যি সত্যি মদ টেনেছিল, ধস্তাধস্তির মধ্যে নিজের পার্ট ভুলে কেষ্টর ঘাড়ে এসা দুটো রদ্দা হাঁকড়ালে যে, দেন্ এণ্ড দেয়ার দাঁতকপাটি। দুটো দল হয়ে গিয়ে জায়গাটা সরগরম হয়ে উঠেছে।"

সকলে চুপ করিয়া রহিল।

ত্রিলোচন একটু পরে কতকটা অনুযোগ ও বিরক্তির স্বরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "গন্শা বলে—আমি কংস বেটাকে শায়েস্তা করব—অনেক কষ্টে টেনে এনেছি...তোর ও হাঙ্গামার মধ্যে যাওয়া কেন বাপু ?"

কেন যে যাওয়া সকলেই জানে বলিয়া কেহ আর কোন রকম মন্তব্য করিল না। একটু পরে রাজেন বলিল, "কেউ যদি একটা ভাল সলাপরামর্শ দেয় নিবি নি, খালি মামার ওপর চটলে চলবে কেন?"

সলার ব্যাপারটা এখন পর্যন্ত শুধু গনশা আর রাজেনের মধ্যে রহিয়াছে, ইহারা কেহ জানে না। ঘোঁৎনা প্রশ্ন করিল, "কি সলাটা, আমরা গরীবরা শুনতে পাই না?"

রাজেন একবার গণেশের পানে চাহিল। গণেশ বলিল, "এতে নুকোবার আর কি আছে বু-বুঝি না তো! মস্ত বড় সলা, তার আবার ঢাক্-ঢাক্ গুড়-গুড়!...ওর মাথা খারাপ হয়েছে বলে..."

রাজেন চটিয়া গেল, ঘোঁৎনাকে সাক্ষী মানিয়া বলিল, "শোন তাহলে, কি মন্দটা বলেছি,...ভুবন মুখুজ্যের নাতনীকে দেখেছিস তো?"

ঘোঁৎনা এদিক থেকে গিয়া সামনের রেলিং-এ ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "সত্যিই তোর মাথা খারাপ হয়েছে রাজেন। পুঁটী তো?—দেখেছি, যেমন ছিরি তেমনি ছাঁদ, আর এদিকেও তো গনশার হেঁটুর বইসীও হবে না..."

কে. গুপ্ত বলিল, "পুঁটী নামটাও তো তেমন..."

গনশা আর ঘোঁৎনা দুজনের কাছে থাবা খাইয়া রাজেন অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল, কে. গুপ্ত কথা ফেলিতেই একেবারে ঝাঁঝিয়া উঠিল, "ফুটবল, হকি—এইসব গোঁয়ার্তুমি নিয়ে আছেন, থাকুন মশাই, এসব ব্যাপারে মাথা গলাতে আসবেন না। মেয়েদের সম্বন্ধে কি জানেন আপনি, শুনি? মনস্তত্ত্ব কাকে বলে, বোঝেন? ঐ পুঁটীকে ঘুরিয়ে একটু পুঁটুরাণী বলে ডাকুন, দেখবেন চেহারা বদলে গেছে। ছেড়ে দিন মনস্তত্ত্ব, আপনাদের কাটখোট্টার মাথায় ঢুকবে না ওসব সূক্ষ্ম জিনিস—আসুন, ছিরির কথাটাই ধরা যাক। আমাদের পাড়ার শঙ্কর ঘোষের ভাইঝি, সমস্ত ছেলেবেলাটা তাকে খেঁদী-খেঁদী বলে কেউ আমলই দিলে না—মনে হত ভুরু আর ঠোঁটের মাঝখানে শুধু গালেরই রাজত্ব, কোথায় যে নাকছাবি পরবে কারুর মাথায় আসত না। এখন দেখবেন চলুন, তার নাক দেখে তাক লেগে যাবে। ফুলস্কেপের দেড় পাতায় পদ্য লিখেছি : মনে করবেন গুমর করছে—বস্তু না থাকলে কোথা থেকে ভাব আসে মশাই? কই, আপনার নাক দেখে একছত্রও কেউ বের করুক তো!...পুঁটী—ঐ পুঁটী যদি একদিন পটেশ্বরী না হয়ে দাঁড়ায় তো রাজেনের নামে একটা কুকুর পুষে রাখবেন। হেঁটুবয়সী মানে?—কত বয়স হল গনশা তোর?"

ত্রিলোচন উত্তর দিল, বলিল, "গনশার বাইশ যাচ্ছে, আসছে মাসে তেইশে পড়বে।"

রাজেন বলিল, "আর বছর তিনেকের মধ্যে পুঁটী ষোলয় পৌঁছে যাচ্ছে। একটু বাঁকড়ি বাঁকড়ি, তাই ছোট দেখায়, এই তিন বছরের মধ্যে কোথা থেকে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় দেখে নিও, বেশি নয়, তিনটি বছর সবুর ধরে থাকা।"

ত্রিলোচন বলিল, "সে কথা রাজেন ভুল বলে নি। তা ভিন্ন ষোলয় না পৌঁছোন পর্যন্ত তো তেরতেই আটকে থাকছে না—চৌদ্দয় উঠবে, চৌদ্দ থেকে পনেরয়। আর বাড়তির এই কটা বছর যত সামনে দিয়ে যায় ততই ভাল। আমি তো এই বুঝি।"

একটু বিরতি দিয়া বলিল, "গনশা কি বলিস? না হয় ভেবেই বলিস'খন। পুঁটুরাণী পালাচ্ছে না।"

গোরাচাঁদ বলিল, "আর একটা কথা, আমি ওদের জানি কিনা, আমার মাসীর বাড়ির লাগোয়াই ওদের বাগান এসে পড়েছে; পুঁটুকে যে বিয়ে করবে সে তো মহাভাগ্যবান,

অনেক পুণ্যি করলে তবে গিয়ে অমন বাড়িতে সম্বন্ধ জোটে। ওর ঠাকুরদাদা শালা ভুবন—মানে বেটা ভুবন মুখুজ্যে..."

ঘোঁৎনা হাসিয়া বলিল, "যেমন আরম্ভ করেছিলি—শালাই বল্ না বাপু, সম্বন্ধ গুলিয়ে ফেলিস কেন? গন্‌শা হয় রাজী—আমাদের সঙ্গে ঠাট্টার সম্পর্কই তো দাঁড়াবে বুড়োর। এসা এসা ঠাট্টা চলবে যার সামনে 'শালা' তো পূজোর মন্তর!"

সবাই হাসিতে যোগ দিল, গন্‌শা পর্যন্ত—তবে একটু লজ্জিতভাবে। "যাঃ, তোদেব খালি মস্করা"—বলিয়া মুখটা জেটির দিকে ঘুরাইয়া লইল।

গোরাচাঁদের গলায় আর একটু জোর আসিল। বলিল, "হ্যাঁ, যা বলছিলাম—ভুবন মুখুজ্যের নাম করলে হাঁড়ি ফেটে যায়।"

সকলে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া তাহার পানে চাহিল। গন্‌শা বলিল, "ভাগ্যির চোটে বাড়ির চারিদিকে কু-কুমারের পোয়ান বসাতে হবে বল্?"

গোরাচাঁদ বিরক্তির সহিত বলিল, "শুনবি নি সব কথা, আগে থাকতেই...এদিকে আটহাতির বড় কাপড় পরে না, কিন্তু টাকার আন্ডিল বুড়ো। কার জন্যে যক্ষীর মত একটি একটি করে পয়সা জমিয়ে চলেছে বল? ঐ তো একটি নাতনী? নাম করলে হাঁড়ি ফাটে, করো না নাম; দাদাশ্বশুরের নাম কেই বা জপ-মন্ত্র করে থাকে! আর ফাটবে মাটির হাঁড়িই তো? সেয়ানা ছেলেব মতো নাতনীর সঙ্গে সম্পত্তিটি বাগিয়ে তুমি হাঁড়ি থেকে হাতা পর্যন্ত একটা সোনার সেট গড়িয়ে নাও না—ফাটাক তো দেখি, কত বড় ওব নামের কেরামতি!"

ত্রিলোচন বলিল, "বরং যেমন শুনছি তাতে তো আমল পাওযাই দায। অত সম্পত্তি যখন, বুড়ো নিশ্চয় কোন উকিল, ব্যারিস্টার বা কোন জমিদারেব ছেলের উপর তাক্ করে আছে, গন্‌শা কি থৈ পাবে?"

বুদ্ধি বা মর্যাদার উপর আঘাত গন্‌শা কখনও সহ্য কবিতে পারে না, তা ভিন্ন তাহাব মনে আর কি সব ভাব উঠিতেছিল তাহাই বা কে জানে? থৈ পাইবাব কথায় ত্রিলোচনেব পানে চাহিযা বক্র স্বরে বলিল, "লে লে, চাই না তাই, নৈলে তোর উকিল ব্যারিস্টারকে এই ক-কড়ে আঙুলে নাচিয়ে ছেড়ে দিতে পারে গনশা!"

দলপতির সম্বন্ধে এ আস্থাটুকু সকলেব আছে, কেহ বিবোধ করিল না।

রাজেন বলিল, "উকিল ব্যাবিস্টারের কথা জিজ্ঞেস করবে তো আমায করো না, আমি কি না খোঁজ নিয়ে পেড়েছি কথাটা! বুড়ো বেশি লেখাপড়া জানা কি বড়মানুষের ছেলের ধার দিযেও যাবে না, তাহলে যে নাতনীটিকে ছাড়তে হবে। ও চায যেমন তুমি আমি এই রকম গোছের ছেলে, শ্বশুরবাড়িতেই থাকবে, বিষযসম্পত্তি দেখবে, বাড়াবে, ভোগ-দখল করবে। বাড়ির সঙ্গে টান যত কম হয ততই ভাল। মোটের ওপব গন্‌শাকে নিয়ে গিয়ে খালি বসিয়ে দেওয়া। কিন্তু গন্‌শা যে মেয়ে ছোট বলে বাজীই হচ্ছে না। অথচ বলছি, আসলে মেয়ে তত ছোট নয..."

ত্রিলোচন বলিল, "আমি একটা কথা বলি, দেখ্ গণেশ, যদি পছন্দ হয।—বলছি গিয়ে জোট, পুঁটুরাণীকে দেখ্, বুড়োরও ভাবগতিক বোঝ। প্রাণ চায লেগে থাকবি, না হয় কেটে পড়বি, বেঁধে তো বাখছে না কেউ।"

গন্‌শার মন ভিজিযা আসিযাছে, কিন্তু ধরা দেবার পাত্র নয। বলিল, "গরজ থাকে, ডাকে, যাব; সেধে যাওয়া গ-গন্‌শার কুষ্টিতে লেখে নি।"

রাজেন, ঘোঁৎনা, গোরাচাঁদ আর ত্রিলোচনের মধ্যে সাংকেতিক দৃষ্টি বিনিময হইয়া

গেল।

ত্রিলোচন সব চেয়ে বড ভক্ত, বলিল, "একবার পরিচয়টা পাক, তারপর কেমন না ডাকে দেখে নোব..."

কিছুক্ষণ পরে গন্‌শা একটা কাজের ছুতা করিয়া চলিয়া গেল। এদের পাঁচজনের মধ্যে অনেক রাত পর্যন্ত পরামর্শ হইল। ঠিক হইল সকলে মিলিয়া একবার পুঁটুরাণীকে ভাল করিয়া দেখিয়া আসিবে, তাহার পর ইতিকর্তব্য নির্ণয় করা।

কি কবিযা সবাই একে একে নিরুদ্দেশ ভাবে জুটিবে তাহারও একটা খসডা দাঁড় করাইযা লইল।

২

শিবপুর চ্যারিটেব্‌ল্‌ ডিস্‌পেনসারির সামনে দিয়া দুইটি বাস্তা দুইদিকে চলিয়া গিযাছে। ডানদিকেরটি ধরিয়া খানিকটা গেলে একটি শিবমন্দির পডে। মন্দিরের পাশ দিযা একটা সবু রাস্তা বিসর্পিত গতিতে ভিতবের দিকে অনেক দূব চলিয়া গিযাছে। জাযগাটি কতকটা পাডাগাঁ গোছের এবং সদর শিবপুর থেকে এত আলাদা রকমের যে বড বাস্তায় যে শহুরে ভাবটি লইযা চলিতেছিলাম মিনিট দশেকের মধ্যেই সেটা উবিয়া গিযা মনে হয় যেন কোথায আসিযা পডিলাম।

স্থানটি দোষে-গুণে মিশানো। খানাডোবা, আগাছাব জঙ্গল, ছোটবড ফলের বাগান প্রভৃতিতে মশা, কবি দুই-ই উৎপন্ন করে।

রাজেনের বাডিটা এইখানে।

খানিকটা আগাইযা ডানদিকে গোরাচাঁদের মাসীর বাডি। এই বাডির দেওযালেব পিছন থেকেই ভুবন মুখুজ্যের বাগান শুরু হইয়াছে। বেশ বড় সম্পত্তি ; মাঝখানে একটা পুকুর আছে। পুকুরে খানিকটা বাদ দিয়া কঞ্চি, বাঁশের আগালে—এই সব ফেলা। চুরি করিযা কেহ জাল ফেলিলে তাহাকে মাছ এবং জাল এই উভয়ের মাযাই ছাডিতে হইবে।

ভুবন মুখুজ্যে বলেন, "আমার জালের জন্যে জাল ফেলা আছে।"

প্রচুর মাছ, লোকে তাহাদের চঞ্চল গতিবিধি দেখে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

পাছে কোন মূঢ কঞ্চির তাৎপর্য ভুলিয়া যায়, এইজন্য পুকুরের ধারেই একটা গাছের ডালে একটা ছেঁডা জালের ফালি টাঙানো আছে। লোকে কাক মারিয়া যেমন তাহার ডানা টাঙাইয়া রাখে কতকটা সেই রকম।

এইটুকু ভুবন মুখুজ্যের নিজের মাথা থেকে বাব করা।

বাগানের পাশেই একটা খানা, জঙ্গলে ঢাকা ; বর্ষার সময বাহিরের সঙ্গে পুকুরটার যোগাযোগ রক্ষা করে।

ভুবন মুখুজ্যেব নিজের বাহিরের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নাই। নিজেব কোথাও যাইবার গরজ নাই, কেহ আসিলে আড়চোখে দেখিয়া আলাপ শুরু করেন ; যে ভাল মনে আসে, দ্বিতীযবার আসা পছন্দ করে না, যে কোন উদ্দেশ্য লইযা আসে, বোঝে দ্বিতীয়বার আসায় কোন ফল নাই।

পরের দিন সকাল বেলার কথা। ভুবন মুখুজ্যে নাতনীর একটা পাছাপেড়ে শাড়ি পরিয়া হুঁকা হাতে বাগানে পাযচারি করিয়া বেড়াইতেছেন, গোরাচাঁদ মাসীর বাডি হইতে

বাহির হইয়া বেড়ার পাশের সরু রাস্তাটা ধরিয়া বরাবর চলিয়া গেল। অনেক দূর দৃষ্টির আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল, মাথা হেঁট করিয়া কি ভাবিল ; বুড়ো আঙ্গুলটা একটু তুলিয়া নিজের মনেই বলিল, "ইস, কচু ভয়টা আমার !" ফিরিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। রাস্তার ধারেই ভুবন মুখুজ্যের বাগানের বাঁশের ফটকটা। ঠিক সামনে আসিয়া গতিবেগ একটু কমাইল, সঙ্গে সঙ্গেই আবার আরও বাড়াইয়া হনহন করিয়া চলিয়া গেল।

মাসীর বাড়ির বাহিরের রকে রাজেন, ঘোঁৎনা, ত্রিলোচন, আর কে. গুপ্ত বসিয়াছিল।

গোরাচাঁদের ভগ্নদূতের মত ধরণধারণ দেখিয়া রাজেন প্রশ্ন করিল, "ফিরে এলি যে ?"

গোরাচাঁদ বলিল, "না, ফিরলাম কৈ ? ফটক খুলে সেঁদুতে যাব, এমন সময় মনে পড়ে গেল বেরুবার সময় জলতেষ্টা পেয়েছিল।...দাঁড়া খেয়ে আসি।"

একটু পরে উগ্র ঝাল খাওয়ার টানা উস্-উস্ শব্দ করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিল।

ঘোঁৎনা বলিল, "লবঙ্গ খেয়ে দম করে নিলি বুঝি ? তুই আবার তারে শা*ড়া ভীতু ! ভারি তো একটা মানুষের সঙ্গে আলাপ জমানো ! দেখিস যেন সেবারের মত ভেস্তে দিস নি !"

গোরাচাঁদ অপবাদটুকু সম্বন্ধে কিছু উত্তর দিল না। "দেরি করিস নি যেন" বলিয়া যেমন আসিয়াছিল তেমনই হনহন করিয়া চলিয়া গেল। ভুবন মুখুজ্যে রাস্তার দিকে পিছন করিয়া পুকুরে কি একটা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, গোরাচাঁদ সন্তর্পণে ফটক খুলিয়া একরকম পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া একটু পিছন ঘেঁষিয়া পাশটিতে দাঁড়াইল। একটু গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, "মাছ দেখছেন বুঝি ?"

একটু আড়ে দেখিয়া লইবার পর উত্তর হইল, "হ্যাঁ, এই এইটু দেখছিলাম।" হুঁকায় গোটাকতক টান এবং আর একটা বক্রদৃষ্টির পর প্রশ্ন হইল, "দরকার আছে ?"

গোরাচাঁদ এতটা হৃদ্যতা প্রত্যাশা করে নাই। সামনে আগাইয়া আসিয়া দরাজ কণ্ঠে বলিল, "আজ্ঞে না, আমাদের কিছু দরকার নেই। আর মাছ না তুলে পুকুরে থাকে সেই ভাল...ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে--দেখলে এত আনন্দ হয়..."

হুঁকার টানের ফাঁকে প্রশ্ন হইল, "মাছের কথা নয়, বলছিলাম-- আমার সঙ্গে কোন দরকার আছে ?"

গোরাচাঁদ চুপ করিয়া গেল। নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিল, "আজ্ঞে না, কাজই যে সর্বদা থাকতে হবে তার মানে কি ? এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম একবার দেখা করে যাই। পাশের বাড়িতেই অষ্টপ্রহর রয়েছি, অথচ আপনার মত একজন প্রবীণ গণ্যিমান্যি..."

আড়চোখে একবার দৃষ্টিপাত হইতে যেন খেই হারাইয়া চুপ করিয়া গেল। হুঁকার গুড়ুক গুড়ুক শব্দ চলিয়াছে। প্রশ্ন হইল, "এইখানেই বাড়ি বুঝি ? তা বেশ। কার বাড়ি ? তোমায় যেন দেখেছিও এর আগে ?"

গোরাচাঁদের লুপ্ত উৎসাহ আবার ফিরিয়া আসিল। বলিল, "আজ্ঞে, দেখবেন বৈকি, ঐ যে সামনেই বাড়ি..."

"না, দেখেছি মানে--এইমাত্র তুমিই রাস্তা দিয়ে যাওয়া-আসা করছিলে না ?"

গোরাচাঁদ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া জিভ দিয়া ঠোঁট ভিজাইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটিয়া গেল। একটু নড়াচড়া করিলেও জড়তাটা কাটে, তা ঠায়

একভাবে দাঁড়াইয়া তামাক টানিতেছে। গোরাচাঁদ বিনাদোষেও যেন কয়েদীর মত আড়ষ্ট !... একটাও কিছু কথা বলুক লোকটা...

প্রশ্ন হইল, "সামনের এই বাড়ি ?"

গোরাচাঁদ উৎসাহের সহিত বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ যে খোলা জানলা থেকে প্রায় রোজই বসে বসে আপনাকে দেখি, একটা না একটা কাজ নিয়ে রয়েছেন। কেমন একটা ইযে আসে— মানে, ভক্তিই বলতে হবে—ভাবি যাই, আবার মনে হয়, ব্যস্ত আছেন..."

"আমাদের মধুর বাড়ি ? এক নম্বর নচ্ছার ছেলেগুলো—জামরুলের ডালটা গিয়ে পড়েছে—তা একটা জামরুল যদি গেরস্তর ঘরে ওঠে। কখনো ধরতে পাই না, নৈলে..."

গোরাচাঁদ কোঁচার খুঁট তুলিয়া কপালের ঘাম মুছিল। অনেকক্ষণ কোন কথাই যোগাইল না মুখে। তাহার পর একটু বুদ্ধিবৃত্তি গুছাইয়া লইয়া বলিল, "আমার নিজের বাড়ি নয় কিনা, বারণ করি—বলি—গাছের ফল গাছে থাকলেই শোভা. কথাই শোনে না। মাসীমাব সেজ ছেলেটা আবার..."

"ও, তোমার মাসীর বাড়ি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সেজ মাসীব। যাওয়া-আসা একেবারেই নেই। আমার বাড়ি শিবপুরে সেই ট্রাম-ডিপো পেরিয়ে—একরকম রামকেষ্টপুরও বলতে পাবেন। ন-মাসে ছ মাসে কখনও ফুরসৎ হল, একবার চলে এলাম, আবাব মাসীমাব সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিয়ে, টুপ করে..."

"ও তোমারই নাম গোরাচাঁদ বুঝি ?"

এ যেন প্রায় বজ্রাঘাতের মত। গোরাচাঁদ একেবারে নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া বহিল। সে আসিলে জামরুলের খরচটা বাড়িয়া যায়, যশের মূলে নিশ্চয় এই নিদারুণ তত্ত্বটুকু বহিযাছে। মাসতুতো ভাইযেরা বে-কায়দায় পড়িযা কখনও ফাঁস করিয়া দিয়া থাকিবে যে, তাহাদের জামরুল-অভিযান গোরাচাঁদ নামক তাদের কোন মাসতুতো ভাইয়েরই প্ররোচনায।

একে গলা শুকাইয়া আছে, তাহাতে লবঙ্গ চিবাইয়া আসিযাছিল, যেন একখানি শুকনা কাঠ হইয়া গেছে। একবার মনে হইল সরিয়া পড়ে, কিন্তু এমন জায়গায় কথাবার্তাটা আসিয়া থামিযাছে যে, যাওযাটা একেবারে বেখাপ্পা হইযা পড়ে।

অস্বস্তি ভাবে এদিক-ওদিকে চাহিতে দূরে মাসীর বাড়ির নিকট একটি কামিনীঝাড়ের আড়ালে দৃষ্টি আবদ্ধ হইযা গেল—রাজেন নিজেকে যথাসম্ভব গোপন কবিয়া ঝাঁকড়া চুল আব আঙুল নাড়িয়া ইশারা করিতেছে। এমনভাবে এক একবার নিজের বুকে আঙুল কয়টা ঠেকাইয়া হাতটা সামনে বাড়াইতেছে—বেশ বুঝা যায় শুধু জানিতে চায় সময়টা আসিবার অনুকূল কিনা। গোরাচাঁদ ফাঁপরে পড়িল। তাহাব একলারই অবস্থা যা দাঁড় করাইযাছে, রাজেন আসিলে তো ব্যাপার আরও সঙ্গিন হইয়া পড়িবে। ওরা ভাবিতেছে গোরাচাঁদ জমাইয়া লইয়াছে, আসিযাই প্ল্যান মত আলাপ শুরু করিয়া দিবে। এদিকে যে সবই উল্টা পথে চলিযাছে, জানিতেও পারিবে না। অথচ বারণ করা যায় কি করিয়া ? শুধু তো তাহাই নয়, যেমন সবেগে ইশাবা করিতেছে, দৈবযোগে মাথাটা একটু ঘুরাইলেই বুড়োর নজরে না পড়িয়া উপায় নাই। এদিকে যেমন আড়চোখেব খেলা দেখিল, হাতটা একটু উঁচু পর্যন্ত করিতে সাহস হইতেছে না। ঘামিয়া উঠিতেছে। ইষ্টনাম জপ করিতেছে।

এমন সময় ইষ্টদেবতা একটু সুযোগ করিযা দিলেন বলিয়া মনে হইল। তাহারা পুকুরের প্রায় কিনারাটিতে দাঁড়াইয়া ছিল, উপরের আম গাছ থেকে একটি আধপাকা আম

টুপ করিয়া ঢালুর মাথায় পড়িয়া নিচের খড়ের বনের মধ্যে গড়াইয়া গেল। "না, আর থাকতে দেবে না একটাও, কাকে পর্যন্ত পেছনে লেগেছে"—বলিয়া বাঁ হাতে হুঁকাটি লইয়া ভুবন মুখুজ্যে নামিয়া খুঁজিতে লাগিলেন।

গোরাচাঁদ আব মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট করিল না। যাহাতে বুড়ো আর রাজেন দুজনের উপরই নজব থাকে এইভাবে অল্প একটু তেরছা হইয়া দাঁড়াইয়া প্রবলবেগে হাতমুখ নাড়িয়া ইশারা শুরু করিয়া দিল।...ফ্যাসাদ হইয়াছে, যেটা ফিবিয়া যাইবার ইঙ্গিত—সেটাকে রাজেন আগাইয়া আসিবার জরুরী তাগাদা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে,—পা বাড়াইয়াছে। গোরাচাঁদ একবাব চকিতে ফিরিয়া দেখিল, না, আম এখনও পাওয়া যায় নাই, গভীর মনোযোগের সহিত খোঁজ চলিতেছে। গোরাচাঁদ এত বেশি মুখ নাড়িল যে, তাহার মধ্যে আওয়াজ থাকিলে পাড়াটা ফাটাইয়া দিত। রাজেন বুঝিতেছে না, তবে একটু যেন সন্দেহের ভাব আসিযাছে। কয়েক পা অগ্রসর হইযাছিল, দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে।...মাথা নিচু করিয়া কি যেন ভাবিতেছে।...সন্দেহটা কাটিল, একবাব ঘুরিয়া দেখিয়া তাড়াতাড়ি আবাব কামিনী ঝাড়ের আড়ালে অন্তর্হিত হইল।

আমটা পাওয়া গেল। ভুবন মুখুজ্যে ধীরে ধীরে উঠিযা আসিয়া ডান হাতের আমটা বাঁ হাতে এবং হুঁকাটা ডান হাতে লইযা আবার ঠিক পূর্ববৎ পুকুরের দিকে মুখ করিয়া হুঁকাটা টানিতে লাগিলেন।

গোরাচাঁদ খুব সন্তর্পণে একবাব দূরে কামিনীঝাড়ের দিকে চাহিযা লইল। অতি সামান্য যা একটু ঘাড়টি ঘুরাইয়াছিল, আবার সোজা কবিযা লইযা বলিল, "বাঃ, আমটা তো দেখছি খুব..."

বলিতে যাইতেছিল "চমৎকার", কিন্তু প্রায় অর্ধেকটা কাকে খাওযা দেখিযা চুপ কবিযা গেল। প্রশ্ন হইল, "ছেলেটি কে ছিল ?"

গোরাচাঁদের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। বলিযা ফেলিল, "দেখি নি তো—কোন্ ছেলেটি ?"

ভুড়ুক ভুড়ুক হুঁকার শব্দ হইতেছে। গোবাচাঁদের বুকে যেন কে হাতুড়ি পিটিতেছে। প্রতি মুহূর্তে উত্তব আশঙ্কা করিতেছে, "যাকে তুমি ইশাবা কবছিলে।" ঢালুব নিচে ছিল, মাথাও ঘোরায় নাই এতটুকু, কিন্তু এটা ঠিক যে, সামান্যও কিছু বাদ যায নাই বুড়োব নজব থেকে।...গোবাচাঁদ মিথ্যাটাকে আব বেশিক্ষণ স্থায়ী হইতে দিতে সাহস করিল না, একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "ও আপনি বুঝি রাজেনের কথা বলছেন ?"

প্রশ্ন হইল. "বামজয়ের ভাইপো বুঝি ? ফিরে গেল কেন ?"

গোরাচাঁদ সুরে সুর মিশাইয়া দিল, "হ্যাঁ, ফিরে যাবাব কি দরকার ছিল ? এত করে ডাকলাম..."

আর কোন প্রশ্ন হইল না। গোবাচাঁদ নিজের অন্তরের অস্বস্তিতেই বলিল, "বোধ হয় মাসীমার বাড়িতে আমায খুঁজতে এসেছিল, একলা পড়ে গেছে বেচাবী।"

এমন সময় পিছনে যেন কযেকজনের ধাক্কা খাইয়া বাজেন কামিনীঝাড়েব আড়াল থেকে ছিটকাইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

গোরাচাঁদের নজর না পড়িয়া উপায় ছিল না। ভুবন মুখুজ্যে কিন্তু একদৃষ্টে একটা শোলমাছের ঝাঁকের পানে চাহিযা তামাক টানিতেছিলেন। সেইরূপ ভাবে অবিচলিত থাকিয়াই বলিলেন, "একলা মনে হচ্ছে না তো।"

গোরাচাঁদ বলিল, "বোধ হয় আসতে গিয়ে হোঁচট লেগেছে বেচারীর।"

আর ঢাকা দেবার কোন উপায় নাই দেখিয়া চেঁচাইয়া বলিল, "আমায় খুঁজছিলি বুঝি—আমি হেথায় রে রাজেন—হোঁচট খেলি তো ? যেমন অসাবধান !"

ভুবন মুখুজ্যের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "আমায় দেখতে পায় নি আর কি, ভেবেছে কে না কে গল্প করছে আপনার সঙ্গে।"

রাজেন কামিনীঝাড়ের দিকে একবার কটমট করিয়া চাহিয়া নজরটা ফিরাইয়া লইল। গোরাচাঁদের উপর দৃষ্টি পড়িতেই বিস্ময়ে সমস্ত শরীরটা একটু গুটাইয়া লইল। প্রশ্ন করিল, "আরে আমাদের গোরাচাঁদ নাকি ? তুই এখানে ?"

তামাকের টান সেই একই রকম নির্বিকার ভাবে চলিতেছে। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই।

গোরাচাঁদ একটু জড়িত কণ্ঠে বলিল, "এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি ভুবন ঠাকুরদা দাঁড়িয়ে, ভাবলাম একটু দেখা করে যাই...আমাকে খুঁজছিলি নাকি ?"

চোখের একটু ইশারা করিল।

রাজেন অগ্রসর হইয়া ফটকটা খুলিতে খুলিতে বলিল, "খুঁজছিলাম এখন থেকে নয়। সেজমাসীমার বাড়িতে ঝাড়া দু-ঘণ্টা ধরে বসে আছি..."

গোরাচাঁদ চোখের উগ্র রকম ইশারা কবিল, খুব বড় বকম একটি ভুল করিয়া ফেলিযাছে বুঝিতে পারিয়া রাজেন সামলাইয়া লইবার ভঙ্গিতে বলিল, "দু-ঘণ্টা না হোক প্রায় পনের মিনিট তো নিশ্চয়। তা কেউ কিছু বললে না তো !"

ভুবন মুখুজ্যে একবার আড়চোখে গোরাচাঁদের পানে চাহিলেন, প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কতক্ষণ হল এসেছ মনে হয় ?"

আবার সামনের দিকে চাহিয়া হুঁকা টানিতে লাগিলেন।

গোবাচাঁদের মুখটা শুকাইয়া গিয়াছিল, রাজেনের দিকে চাহিয়া তাডাতাডি বলিল, "দুৎ, এই তো আমি মিনিট দশেকও আসি নি ওখান থেকে—"

বাজেন ঘাবডাইয়া গিযা পূর্বাপর আব কোন মিলই রাখিতে পারিল না, "তাহলে বোধ হয মিনিট পাঁচেক হবে এসেছি ; হ্যাঁ ঠিকই তো—পৌঁছুতেই ঢং .. করে আটটা বাজল, আসবার সময দেখি আটটা পাঁচ হয়েছে।"

একটু দূরে পিছনের কোন একটা বাড়িতে ঢং ঢং করিয়া নযটা বাজিল।

কেমন যেন সুর কাটিযা গেল, অনেকক্ষণ আব কোন কথা হইল না। শুধু রাজেন ইঙ্গিত করিবার জন্য কযেকবার গোরাচাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিল। আডচোখের আতঙ্কে গোরাচাঁদ একেবারেই চাহিল না।

শেযে ভুবন মুখুজ্যেই কথা কহিলেন : প্রশ্ন করিলেন, "তা কি করা হয় তোমাদেব বাপু ?"

গোরাচাঁদ আর রাজেন পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওযি করিল। গোবাচাঁদ উত্তর কবিল, "আজ্ঞে চাকরি খুঁজছি আজকাল।"

প্রশ্ন হইল, "এ বনবাদাড়ে কোথায পাবে ?"

গোরাচাঁদ আর রাজেন আবার পরস্পরের মুখের পানে চাহিল। রাজেন একটা ইশারা করিল যাহার অর্থ বোধ হয়—"চল্ সরে পড়া যাক্।"

গোরাচাঁদ খুব সূক্ষ্মভাবে তাহাকে একটু অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "আর

ঐ সঙ্গে স্বার্থত্যাগ, গ্রাম সংস্কার, বড় যোগ-টোগ হলে ভলেণ্টিয়ারী...

রাজেন বলিল, "এক কথায় সেবাধর্ম বল্ না।...আমাদের একটা সেবাদল আছে কিনা, গণেশ তার প্রেসিডেণ্ট। গোরাচাঁদ সেই কথাই বলছে।"

ভুবন মুখুজ্যে প্রশ্ন করিলেন, "দলের সবাই একসঙ্গে ঘুরে বেড়াও বুঝি—কে জলে ডুবল, কার ঘর পুড়ল এই সব হাতড়ে হাতড়ে?"

রাজেন বিমূঢ়ভাবে গোরাচাঁদের পানে চাহিল। গোরাচাঁদ উত্তর করিল, "আজ্ঞে না, এমনি সবাই নিজের নিজের ধান্দায় ঘুরে বেড়াই। কোন শুভকাজে দরকার পড়লে একত্র হই, তারপর..."

রাজেন পূর্ণ করিয়া দিল, "তারপর আবার কাজ সারা হয়ে গেলে যে যার চাকরির চেষ্টায় ঘোরাঘুরি করি।"

"আজ কোন দরকার আছে বুঝি?"

গোরাচাঁদ কথাটা যে কোথায় যাইতেছে বুঝিযাছিল, কোন উত্তর দিল না; রাজেন বলিল, "আজ্ঞে না, আজ তো এমনি ওদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি গোরাচাঁদ দাঁড়িয়ে..."

প্রশ্ন হইল, "তবে কামিনীঝাড়ের আড়ালে দলের ওরা কি করছে?"

ভুবন মুখুজ্যে যে কতটা জানেন রাজেনের জ্ঞান ছিল না। খুব নিরীহ মিথ্যাচারের সঙ্গে বলিল, "কৈ, সেখানে তো কেউ নেই।"

গোরাচাঁদের অবস্থা চরমে গিয়ে ঠেকিয়াছে, একটু শাসনের কণ্ঠে বলিল, "আছে বোধ হয় কেউ, ভুবন ঠাকুরদা বিচক্ষণ মানুষ, তিনি কি না দেখেশুনেই বলছেন? দাঁড়া, দেখে আসি..."

রাজেন বুঝিল গোরাচাঁদ পালাইতে চায়। বলিল, "বাঃ, আমি যে এইমাত্র এলাম ওখান থেকে। বেশ, না বিশ্বাস হয় দুজনেই দেখে আসি চল্।"

এমন সময় একটু যেন ঠেলা খাইযাই কে. গুপ্ত কামিনীঝাড়ের বাহির থেকে রাস্তায় দাঁড়াইল। একবার তাড়াতাড়ি এদিকে চাহিয়া আবার চলিয়া যাইতেছিল, গোরাচাঁদ হাঁক দিল, "কাকে খুঁজছেন? আমরা এখানে!"

রাজেন বলিল, "ভুবন ঠাকুরদার সঙ্গে গল্পসল্প করছি।"

কে. গুপ্ত কিন্তু ততক্ষণে অদৃশ্য হইয়া গেছে। রাজেন বলিল, "শুনতে পায় নি, দাঁড়ান ডেকে নিয়ে আসি।"

পা বাড়াতেই দেখা গেল, ঘোঁৎনা আর ত্রিলোচন কামিনীঝাড়ের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া দাঁড়াইল, তাহার পিছনে কয়েদীর মত মাথা নিচু করিয়া কে. গুপ্ত একবার মাথাটা তুলিয়া নিম্নকণ্ঠে কি একটা যেন বলিয়া আবার নিচু করিয়া লইল। ঘোঁৎনা হাঁকিয়া বলিল, "তোরা এখানে? আর আমরা..."

পাছে আবার "দু-ঘণ্টা"র হাঙ্গামাটা আনিয়া ফেলে সেই ভয়ে রাজেন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "এইমাত্র খোঁজ নিচ্ছিলি বুঝি? আমি তো এক্ষুনি ওখান থেকে এলাম কিনা...পাঁচ মিনিটও হয় নি।"

ভুবন মুখুজ্যে খুক্‌খুক্ করিয়া দুইবার কাশিলেন। তাহার পর আবার হুঁকায় সেই একঘেয়ে শব্দ শুরু হইল।

ত্রিলোচন, ঘোঁৎনা আর কে. গুপ্ত আসিয়া উপস্থিত হইল।

যে উদ্দেশ্য লইয়া আসা, তাহা সফল হইবার কোনই সম্ভাবনা লক্ষ্য হইতেছে না। তাহা ভিন্ন পুঁটুরাণীর দেখা হওয়া তো পরের কথা, বুড়োর হাত থেকে পরিত্রাণ পাইলে বাঁচে। যাইতে কোন বাধা নাই, অথচ যাইবারও কোন উপায় নাই। প্রতি কথাতেই প্রবঞ্চনার প্রমাণ বাড়িয়া যাইতেছে। ত্রিলোচন, ঘোঁৎনা আব কে. গুপ্ত আসিলে আরও বাড়িবে। কি ব্যাপার এখানে তাহারা তো জানে না, নিশ্চিন্ত মনে কথা কহিয়া যাইবে।

গোরাচাঁদ ঘোঁৎনার পানে চাহিয়া সহজ ভাব আনিবাব চেষ্টা কবিয়া প্রশ্ন কবিল, "তা হঠাৎ খুঁজতে বেরিয়েছিস কেন?"

চোখেব একটি ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "ওঃ বুঝেছি, সেই ব্যাপারটা?...চল্, আয রে রাজেন।"

ভুবন মুখুজ্যের পানে চাহিয়া বলিল, "আমাদেব সেবাসংঘেব একটা ভয়ানক দরকারী কাজ পড়ে গেছে, আব দাঁড়াতে পারলাম না।"

রাজেন বলিল, "লাগছিল কিন্তু চমৎকাব। জায়গাটি বড্ড মনোরম কিনা।"

গোরাচাঁদ তাহাব দিকেই চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "আর ভুবন ঠাকুবদাব সঙ্গটা বুঝি কিছু নয়? মনে হয় না পাশটি ছেড়ে কোথাও যাই, ফবসুৎ পেলেই আবার এসে আবদার করব ঠাকুবদা।"

ফটকেব কাছে আসিয়া কে. গুপ্ত নিম্নস্বরে প্রশ্ন করিল, "কৈ, পুঁটুবাণীকে দেখা হল না তো?"

গোরাচাঁদ নিম্নস্বরেই একটু ঝাঁজিয়া বলিল, "শখ থাকে তো যান না মশাই, দেখুন গে না...মাঝে পড়ে আমার মাসীর বাড়ি আসাব দফা নিকেশ হল। কে জামবুল খাবে আর কার বদনাম!..."

৩

ইহারা চলিয়া গেলে ভুবন মুখুজ্যেব হুঁকাব টান আরও অধিক দ্রুত হইয়া উঠিল। একটু পবে মাথাটা অল্প সঞ্চালিত করিয়া নিজের মনেই বলিলেন, "না, কিছু বোঝা যাচ্ছে না তো। অমন কবে এক এক কবে জুটলই বা কেন, আবাব হঠাৎ চলেই বা কেন গেল?"

কলকেয টোকা দিতে গিয়া দেখিলেন, অনেক পূর্বেই ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।

ভুবন মুখুজ্যেব তামাকেব বাজেট যে ঢালোযা এমন নয়, তবে আপাতত আর এক ছিলিম না হইলে নয়। একটা সমস্যা পড়িয়া গেছে, তাহাব কিনাবা কবা দরকার।

বাড়ির দিকে অগ্রসব হইতেছিলেন এমন সময দেখা গেল বই-শ্লেট হাতে নাতনী স্কুল থেকে ফিরিতেছে। গতিতে বেশ খানিকটা উৎসাহেব ভাব লক্ষ্য কবিয়া ভুবন মুখুজ্যে দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

পুঁটু ফটক খুলিয়া প্রবেশ কবিতে করিতেই প্রশ্ন কবিল, "হ্যাঁ দাদু, গোবাচাঁদদাদা আর ওদেব দলের ওরা সব কেন এসেছিল?"

প্রশ্ন হইল, "তুই টের পেলি কি করে?"

মেয়েটি একটু বেশি রকম মুখফোঁড়, শুধু ঠাকুবদাদা আব ঠানদিদি অভিভাবক হইলে যেমনটি হইবার কথা। বলিল, "ওমা, দেখলাম যাচ্ছে, গোরাচাঁদদাদা বললেও যে, "পুঁটুরাণী, তোমাদেব ওখান থেকে আসছি—কত আম আর কত জামরুল সাবাড করে

দিয়েছি !" আমিও হটবার মেয়ে কিনা, বললাম, 'তাহলে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে আসতে সবাই, যা ঠাকুরদা আগলে বসে আছে !'...চুপ করে থাকব কেন দাদু ?"

ভুবন মুখুজ্যে অন্যমনস্ক ভাবে হুঁকার ছিদ্রপথে মুখটা বসাইয়া বলিলেন, "হুঁ...ওদের আবার দল আছে নাকি ?"

পুঁটু চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "ওমা, তোৎলা গণেশের দল আছে, শিবপুরে কে না জানে ? কাউকে বলো না ওকথা যেন আর দাদু, হাসবে !"

ভুবন মুখুজ্যে কপট বিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "এতদূর ! দলের কাজটা কি শুনি ?"

পুঁটু বলিল, "অনেক কাজ, কি কাজ নয় তাই জিগ্যেস করো। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—হেন কাজ নেই, যা ওদের দল জানে না। এবার আমাদের সরস্বতী পূজোটা ওরাই তো জমিয়ে রেখেছিল। পাখি, জানোয়ারের ডাক, কতরকম ম্যাজিক—রুমালে তোমার টাকা বাঁধা, রুমাল রইল পড়ে, টাকা নেই ; তারপর ছোরা নিয়ে লড়াই, লাঠি ঘোরানো...ও দাদু, বড্ড মনে পড়ে গেল, তোমায় বলি নি আগে।..."

পুঁটু একেবারে ডুকরাইয়া হাসিয়া উঠিল এবং হাসির মধ্যেই ছাড়িয়া ছাড়িয়া বলিয়া চলিল, "লাঠি খেলা দেখালে তোৎলা গণেশ নিজে দাদু...প্রথমেই তো এত বড় এক নেকচার, 'আপনারা ম-ম-ম-ম্মনে করেন না-না-না-ল্লাঠির কোন খ-খ-খ-ক্ষমতা নেই—' ও দাদু নেকচার শুনব কি, হেসে আমরা নুটোপুটি খেয়ে যাচ্ছি..."

পেটে বই-শ্লেট চাপিয়া পুঁটু প্রায় লুটোপুটি খাইবার দাখিলই হইল, তাহার পর আবার সামলাইয়া লইয়া কতকটা অভিনয়ের ভঙ্গিতে আরম্ভ করিল, "এমন সময় আমাদের সেক্রেটারী বুড়ো উঠলেন, আমি দেখে অত্যন্ত—অত্যন্ত...কি একটা কথা বললে দাদু, মনে পড়ছে না...দেখে অত্যন্ত...তাই হচ্ছি যে আমাদের স্কুলের মেয়েরা ভব্যতা কাকে বলে জানে না। শ্রীমান গণেশ বাবাজীবন আমাদের অতিথি, আজ দয়া করে আমাদের চিত্ত—চিত্ত...বিনাশন কি বিভীষণ, কি একটা বললে দাদু, আমার মনে পড়ছে না...যাক, তারপরে তো আমাদের গণেশ বাবাজীবনের লাঠি খেলা আরম্ভ হল। সে মদ্দাত্তি যদি দেখতে ! একবার সামনে এগিয়ে আসে, একবার পেছনে নাপিয়ে যায়, কতরকম মুখ করে, কতরকম শব্দ ! তারপর আরম্ভ করলে লাঠি—একটু করে ঘোরাতে ঘোরাতে শেষকালে এত জোর হয় যে, ভাল করে দেখাও যায় না লাঠিটা। সেক্রেটারী বুড়োর সবই বাড়াবাড়ি কিনা ; আমরা সবাই যেমন হাততালি দিচ্ছি তুইও দে, তা নয় ; চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে শানাপাড়ার যাত্রাদলের নারদ ঋষির মত দু-হাত তুলে যেই 'সাধু, সাধু' করে উঠেছে, সাধুর হাতের লাঠি ছিটকে সবাইকে ডিঙিয়ে একেবারে ঠকাস করে কপালের মাঝখানে..."

পুঁটু আর একচোট ডুকরাইয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু ভুবন মুখুজ্যের মুখের গাম্ভীর্য লক্ষ্য করিয়া নিজেকে সংযত করিয়া লইল। একটু অভিনয়ের সুরে কহিল, "দাদু, তুমি শুনছ না, আমায় মিছিমিছি বকিয়ে মারলে। একটা মজার কথা বলছি, শুনবে তা নয়, শুধু কে কোথায় একটা জাম খেলে কে একটা জামরুল কুড়লে...যাও..."

ভুবন মুখুজ্যে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "শুনলাম তো রে পাগলী, তোদের সেক্রেটারীর কপাল ফেটে গেল।...খুব লাঠি খেললে বুঝি ?"

"অমন শিবপুরে কেউ দেখে নি কখনও দাদু। সে কি পাক দিয়ে দিয়ে ঘোরা লাঠির ! চরকিবাজি হার মানে !"

"ছোরার খেলাও খুব দেখালে বুঝি ? কজন খেললে ?"

"অনেকজন।"

"হুঁ!...তুই তো অনেক জানিস দেখছি, মস্তবড় পাড়া-বেড়ানি হয়েছিস কিনা। ক'জন আছে ওদের দলে খোঁজ রাখিস?"

"কেউ বলে চল্লিশজন, কেউ বলে বেশি, কেউ বলে—না, ওরা পাঁচ ছ-জনই আছে, কিন্তু পঞ্চাশজনের মোয়াড়া নিতে পারে।...কেন দাদু, তুমি ডাকবে নাকি ওদের—খেলা দেখাতে?...হ্যাঁ দাদু, ডাকো, কী চমৎকার যে জানে দাদু!"

আবদারের সঙ্গে হাতটা জড়াইয়া ধরিল। তাহার পর এক ঝলক হাসির সঙ্গে হঠাৎ মুখের উপর দৃষ্টি তুলিয়া বলিল, "কিন্তু খবরদার; তুমিও যেন 'সাধু সাধু' বলতে যেও না দাদু,—তোমার আবার একমাথা টাক্..."

বাড়ির দিকে অগ্রসর হইযাছেন ভুবন মুখুজ্যে, বলিলেন, "হুঁ, ডাকব। তুই তোৎলা গণেশ না কি নাম বললি—তার বাড়ি জানিস? কার ছেলে?"

"তার বাড়ি সেই ওদিকপানে কোথায় আমি জানি না। গোরাচাঁদদাদাকে তো জানি ঐ বাড়িতে আসে, নন্তীর দাদা হয়। ডেকে আনব দাদু? তার কাছেই সব খবর পাবে'খন।..."

"তা আনিস। কলকেটা একটু সেজে নিয়ে আয় দিকিন আগে।"

"তোৎলা গণেশের দল আসবে! তোৎলা গণেশের দল আসবে"—বলিয়া উৎফুল্ল ভাবে একরকম লাফাইতে লাফাইতে পুঁটু ছুটিয়া গেল। বারান্দার নিকট গিয়া, বোধ হয় ব্যবস্থাটা পাকা করিয়া লইবার জন্যই ঘুরিয়া চেঁচাইয়া বলিল, "ওরা একটিও পয়সা নেবে না দাদু, সব ভলেন্‌টিয়ার, মাংনায় উবগার করে বেড়ায়।..."

তামাকটা আর একবার ভস্ম না হওয়া পর্যন্ত ভুবন মুখুজ্যে বসিয়া বসিয়া আকাশপাতাল অনেক ভাবিলেন।...ভ্যাগাবণ্ডের মত গায়ে পড়িয়া উপকার করিয়া ফেরে, টাকা উড়াইয়া দিতে জানে, লাঠি খেলা ছোরা খেলা জানে, দলের মধ্যে চারজন আছে কি চল্লিশজন আছে—কাহাকেও জানিতে দেয় না; কাজ নাই কর্ম নাই, অথচ সবাই ভদ্রসন্তান,—এ দলের হঠাৎ তাহার এখানে আবির্ভাব কেন? আর ঐরকম প্রবঞ্চনা করিয়া!...

সেদিন সন্ধ্যায় স্টীমারঘাটে সবাই একত্র হইয়াছে, গোরাচাঁদ আসিয়া বলিল, "গন্‌শা খাওয়া, এবার গাঁথল!"

গন্‌শা ছাড়া সবাই তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। গোরাচাঁদ বলিল, "আজ বুড়ো হঠাৎ ডাকিয়ে পাঠিয়েছিল।"

"সত্যি নাকি?" বলিয়া সবাই উন্মুখ হইয়া উঠিল। গোরাচাঁদ চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "তবু কে ডাকতে এসেছিল বলি নি এখনও..."

আন্দাজেই সকলে চেঁচাইয়া উঠিল, "পুঁটু?"

ঔৎসুক্যের চোটে ত্রিলোচন আর রাজেন শুধু ঘাড়ে পড়িতে বাকি রহিল।

গোরাচাঁদ একবার আড়চোখে গন্‌শার পানে চাহিল, সে নির্লিপ্ত ভাবে ওপারের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

গম্ভীরভাবে বলিল, "পুঁটু—স্বয়ং পুঁটুরাণী ওরফে মৃণালিনী দেবীই বল বা নতুন কায়দায় মুখার্জিই বল—যেমন আজকাল পাঁচজনে বলছে। নাও, নাম নিয়ে খুঁতখুঁতনি ছিল,

আজ তাও বের করে নিলাম।"

এইটুকু সংবাদই এত চমকপ্রদ যে সকলে খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিল। শেষে গন্‌শা বলিল, "গো-গ্‌গোরার সবই আধ-খেঁচড়া। তোর দেড় হাত লম্বা নামওয়ালা মেয়েটা কে-ক্কেন এল তা বল ওদের--সব হাঁ করে রয়েছে।"

গোবাচাঁদ গন্‌শার দিকেই চাহিয়া বলিল, "বললাম তো বুড়ো ডেকে পাঠিয়েছে-- তোমার নাম, ধাম, ঠিকানা, মামার নাম সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিলে। চেনেও তোমার মামাকে বুড়ো—অনেক আগে নাকি তোমাদের পাড়াতেই থাকত। বললে, 'গোলোক দাদার ভাগ্নে ? -- সে তো ঘরের ছেলে।' আজকালের মধ্যেই ঠেলে উঠবে তোমাদের বাড়ি, দেখে নিও।"

গন্‌শা বিড়ি ধরাইতেছিল। গোরাচাঁদ নিজের ঠোঁটে একটা বিড়ি চাপিয়া, তাহার হাত থেকে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠিটা লইয়া অগ্নিসংযোগ করিল। একটা টান দিয়া বলিল, "তা ঘরের ছেলে ঘরে গিয়ে ঢোক আপত্তি নেই, আপাতত কিন্তু যাবার সময় পূর্ণ ময়বার দোকান হয়ে যেতে হবে, শোনা হচ্ছে না ওজর আপত্তি।"

ঘোঁৎনা বলিল, "তা বইকি, বাড়িতে জুটবে কিনা কে বলতে পাবে ? দেবতা বাড়িতে ডেকে আলাপ করচেন, গিয়ে দেখবে বোধ হয় হাঁড়ি ফেঁসে বসে আছে।"

গন্‌শা বলিল, "একটা ভ-ভদ্দলোকের নামে যা-তা বলতে তোদের আটকায় না দেখছি !"

বহুদিন পরে আড্ডটা বেশ ভাল ভাবে জমাট হইয়া উঠিল।

৪

সন্ধ্যা উৎরাইয়া গেছে। গোলোক চাটুজ্যে বৈঠকখানায় কতকগুলা হিসাবেব খাতা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন, এমন সময় দরজার সামনে একটি ভদ্রলোক আসিয়া দাঁড়াইলেন। গায়ে একটা হাতকাটা ফতুয়া, পরনের কাপড়টা একটু খাটো, পায়ে ঠনঠনের চটি, হাতে একটা বেতের মোটা লাঠি, বয়স পঞ্চাশের নিচেই, তবে শরীরটা বেশি রকম শীর্ণ বলিয়া মনে হয় যেন বুড়া হইয়া গিয়াছেন। গোলোক চাটুজ্যে চাহিতেই ঈষৎ হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "দাদা বোধ হয় চিনতে পাচ্ছেন না ?"

গোলোক চাটুজ্যে বলিলেন, "ভেতরে এস", এবং আগন্তুক গিয়া একটি চেয়ারে উপবেশন করিলে চোখের চশমা খুলিয়া লইয়া চিনিবার চেষ্টায় তাহার মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন।

আগন্তুক একটু হাসিয়া বলিল, "পারবেন না চিনতে, অনেক দিন হল কিনা। আমি ভুবন, পাশের ওই মল্লিকদের বাড়িতে বহুদিন ছিলাম এর আগে। পারলেন চিনতে এবার ?"

গোলোক চাটুজ্যে দাড়িটা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মাথা হেলাইয়া বলিলেন, "পেরেছি। চেনা চেনা ঠেকছিলই, তবে একটু ধোঁকা লাগছিল। তা বেশ, অনেক দিন পরে দেখা হল, আজকাল আছ কোথায় ?"

"আছি এইখানেই চাটুজ্যে হাটের ওদিকে, ছটাকখানেক জমি কেনা ছিল, একটা কুঁড়ে তুলে কোন রকমে দিন গুজরান করছি। এদিকপানে একটু বরাত ছিল, ভাবলাম দাদাব সঙ্গে একবার দেখা কবে যাই।"

"বেশ করেছ...ওরে, কলকেটা একবার বদলে দিয়ে যা...চা করতে বলি একটু ?"

"তা বলতে হবে বৈকি। চা দু-বেলা তো এই বাড়িতেই বরাদ্দ ছিল।"—বলিয়া লাঠির মাথায় দুইটা হাত রাখিয়া ভুবন মুখুজ্যে অল্প দুলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

সে ঝোঁকটা থামিলে প্রশ্ন করিলেন, "তারপব বাড়ির কি খবর বলুন দাদা—ছেলেপুলেবা—"

গোলোক চাটুজ্যে বলিলেন, "ছেলেপুলের মধ্যে তো দুটি মেয়ে ; একটির বিয়ে দিযে দিযেছি বছর চারেক হল, একটিকে এখনও বছর তিনেক রাখা যাবে। ছেলের মধ্যে একটি অপোগণ্ড ভাগনে—"

ভুবন মুখুজ্যে সতর্কই ছিলেন। লাঠিব মুঠিসুদ্ধ হাতটা অল্প একটু বাড়াইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, ভাগনের কথায মনে পড়ে গেল,—কাল সকালেই—হ্যাঁ, সকালেই তো—আমার আবার মনেও থাকে না এসব কথা—কাল সকালেই পাঁচটি ছেলে—ভদ্দরঘরেব ছেলে বলেই মনে হল—হঠাৎ ঘুল-ঘুল কবতে করতে আমার বাড়িতে গিয়ে হাজিব। কেমন একটা ছমছমে ভাব সবার, না কোন স্পষ্ট কথা বলে, শুধু এদিকে ওদিকে নজর,—বেশ সুবিধে বলে বোধ হল না। আজকাল অবস্থা তো জানেনই—চারিদিকে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি ; ভদ্রঘরের ছেলেদের মধ্যেও সব ঢুকেছে এই রোগ, কাজকর্ম নেই, ওই করছে, ধরা না পড়ল বহুৎ আচ্ছা, ধবা পড়লেই স্বদেশ উদ্ধার করছি !...চুলোয় যাক, আমার বাড়িতে স্বদেশ উদ্ধারেব আব পাবে কি ? চাবটি প্রাণী, কোনরকম করে একমুঠো জোটে, দুবেলা কেটে যাচ্ছে।—তবুও কেমন একটা খটকা লেগে রইল ; জিজ্ঞেস করলাম, 'বাপু হে, তোমরা কর কি বল দিকিন—কার ছেলে, কি বিত্তান্ত, একটু ভেঙ্গে বল তো দেখি'...পরিচয় তো কেউ দিলে না, তবে যখন নেহাৎ কোণঠাসা করে ধরেছি তখন বললে, 'আমরা পরোপকাব করে বেড়াই, এই জীবনের ব্রত করেছি, আমাদের একটা সেবাসমিতি আছে, হেন তেন সাত সতেরো।' ভাবলাম পথে এস...'কে কে আছে বাপু তোমাদের সেবা-সমিতিতে ? ধনুর্ধরগুলির নাম কব তো !' না, 'আছি আমবা অনেকজন, আমাদের প্রেসিডেণ্ট হচ্ছে গণেশ'...'এই মহামতি গণেশটি কে শুনতে হচ্ছে তো ?' তখন তোমার নাম করলে। তোমার নাম কবতে আমিও সঙ্গে সঙ্গে চেপে গেলাম। ভাবলাম থাক, ওদিকে যদি যাই তো দাদাকেই একবার জিগোস করে দেখব। কথা হচ্ছে—ওরা যা করে করুক গিযে, তবে আমাদের নিজেদের ঘরের ছেলে..."

গোলোক চাটুজ্যে দাড়ি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া নতমুখে শুনিয়া যাইতেছিলেন, বুঝিলেন ভুবন মুখুজ্যের 'বরাত'টা আসলে কি।—তাঁহাব ভাগিনেয়ের দল, তাদের আপাতত একমাত্র যা উদ্দেশ্য, তাহাই লইয়া উপস্থিত হইযাছিল। ভুবন মুখুজ্যে কৃপণ মানুষ, নিজের সঞ্চয়টুকু প্রাণপণে আগলাইয়া থাকে, পদে পদেই ডাকাতির সম্ভাবনা দেখে এবং দেখিযাছেও।...গোলোক চাটুজ্যেব মুখে একটা মৃদু হাসা ফুটিযা উঠিতেছিল, সেটুকুকে ঠোঁটেই মিলাইযা লইয়া বলিলেন, "উনি হযেছেন প্রেসিডেণ্ট !—তা প্রেসিডেণ্ট রুসভেল্টও ছিলেন নাকি উপস্থিত ?"

ভুবন মুখুজ্যে রসিকতাটুকুতে প্রয়োজনাতিরিক্ত একচোট হাসিয়া বলিলেন, "দাদা আমাদের ঠিক সেইরকম নকুলে আছেন...বলেন কিনা...প্রেসিডেণ্ট রুস্‌ভেল্ট !..."

সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীব হইযা বলিলেন, "সে কথা নয়, তাকে আমি জানি, সৎ ছেলে—তবে বারণ করে দেবেন ওসব গুণ্ডোটুণ্ডোদের সঙ্গে যেন না মেলামেশা করে, ওদের পক্ষে

সবই সম্ভব কিনা ; একদিন বোধ হয় দেখবেন নিরীহ ছেলে, কারো সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, হুট করে এক স্বদেশী ডাকাতির মামলায় নাম উঠে গেল, তখন—"

গোলোক চাটুজ্যে বলিলেন, "তাহলে তো বুঝব একটা কাজ করছে হে—"

মন্তব্যটা এতই অপ্রত্যাশিত, ভুবন মুখুজ্যে একেবারেই থ হইয়া গেলেন। মুখের ভাবটা বুঝিবার জন্য একবার খুব মিহি করিয়া আড়চোখে চাহিলেন,—ওটা মনের কথা নাকি ? মামার যদি এই মনের কথা হয়, তাহা হইলেই তো সর্বনাশ !

ঠিক এই সময় চা আসিয়া পড়ায়, অস্বস্তিটা চায়ের পেয়ালায় নিমজ্জিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তামাকও দিয়া গিয়াছিল। চা শেষ হইলে সটকাটা আগাইয়া ধরিয়া গোলোক চাটুজ্যে বলিলেন, "নাও ধরাও, তুমি যা ভেবেছো তা আদপে নয়। ডাকাতি করলেও তো বুঝতাম, হারামজাদা নিজের পেটের সংস্থান নিজে করছে। তা করবার ওর দরকার ? জানে মামা বেটা চোখ বুজলেই চালচুলো যা একটু করে যাচ্ছে আমার হাতে আপ্‌সে আপ্ এসে পড়বে।...সে সব কিছু নয়, সবগুলো এখন অন্য এক ধান্ধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে...জানি কিনা, আমার কাছেও চর আসছে মাঝে মাঝে।"

ভুবন মুখুজ্যে সটকা থেকে মুখ সরাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "বুঝলাম না, একটু খোলসা করে বলুন দাদা।"

গোলোক চাটুজ্যে বলিলেন, "বলতে একটু বাধ-বাধ ঠেকছে, তা নিজেদের মধ্যেই যখন..ওর নাম কি ? বাড়িতে বিয়ের যুগ্যি মেয়ে কি নাতনী-টাতনী আছে কি ?"

ভুবন মুখুজ্যে একটু সচকিত হইযা বলিলেন, "একটি নাতনী আছে, ঠিক বিয়ের যুগ্যি নয়, তের-চৌদ্দ বছর..."

"হল তো ?...ঠিক ধরেছি।...ডাকাতি নয়, ওরই জন্যে ঘটকের পাল পৌঁছেছিল। আমার এ আবাগের-বেটা ভূত হচ্ছে পাত্র। গোটাছয়েক আছে দলের মধ্যে। সব হবিহব আত্মা। তার মধ্যে গোটাতিনেকের মাথা মুড়নো হযে গেছে। এটা সর্দার, এটার জন্যে প্রাণ কেঁদে উঠেছে সবার। আমার কাছে তো আমল পায না, নিজেরা কোমর বেঁধে নেমেছে। কম মতলববাজ হারামজাদারা !"

ভুবন মুখুজ্যের মনটা নিশ্চিন্ততার জন্য সুস্থ হইয়া আসিতেছিল, একটু বিস্মিত ভাবে হাসিয়া বলিলেন, "ঘটকালি করতে গেছল সব ?—তা বললে না তো কেউ ! স্বচ্ছন্দেই পারত বলতে...দাদার সঙ্গে কুটুম্বিতে সে তো পরম সৌভাগ্য আমার—"

"সৌভাগ্য যদি কখনো মনে করি তো আমি নিজেই কথা পাড়ব'খন। আগে একটা চাকরি করুক, পাকা হয়ে বসুক তাতে, তারপর ওসব শখ। ওরা যা পথ ধরেছে, তোমায় অতিষ্ঠ করে তুলবে ভুবন, ওদের চেন না। তার ওষুধ দরকার, যাতে আপাতত ওদিকে আর পা বাড়াতে না সাহস করে।...ধরল ছিলিমটা ? দেখি দাও তো !"

দাড়িটা বেশ শক্ত করিযা মুঠাইয়া ধরিয়া গোলোক চাটুজ্যে নিবিষ্টমনে নত মস্তকে তামাক টানিতে লাগিলেন। খানিকটা এইভাবে থাকিয়া বলিলেন, "শোন।...তাহলে—যা ঠিক করলাম।...কি বলে আলাপ জমাতে গেছল সব ? ঠাকুরদা ? মেয়েটি নাতনী বললে না ? কেমন আটঘাট বেঁধে সম্বন্ধ পাকা করে আস্তে আস্তে এগুচ্ছে লক্ষ্য করো ! পাকা খেলোয়াড় সব !...বেশ, একটু ঠাকুরদার রসিকতার স্বাদ পাক সব...তবে শোন...ওরে আর এক ছিলিম তামাক দিয়ে যা..."

বার্ড কোম্পানীর জেটির পিছনে ফুটবলের মাঠে ইহারা সকলে বসিয়াছিল। কে. গুপ্তর দোষে আজকের ম্যাচে একটা পেনালটি দিতে হইয়াছিল, সেই আলোচনাই চলিতেছিল। সন্ধ্যা হইয়া গেছে, মাঠে আর অপর কেহ নাই।

গোরার্চাঁদ একটু তফাতে মনমরা হইয়া বসিয়াছিল। সামনে আসিয়া বলিল, "তাহলে যাচ্ছো না তো কেউ? এই আমার শেষবার জিগ্যেস করা!"

ঘোঁতনা বলিল, "যা-তা বকিস্ নি গোরে, তোকে ডেকে ঐসব কথা বললে!—ঐ মানুষ!—একবার কাছে গিয়েই বুঝেছি কি চীজ ও।"

গোবা রাগিয়াই ছিল, আরও রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "আলবৎ বলেছে, গোরার্চাঁদ গঙ্গাব ধারে দাঁড়িয়ে কখনও মিছে কথা বলে না। আমার মাসতুতো ভাই ছনেকে দিয়ে বাড়ি থেকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে বলেছে।"

গণেশ আব ত্রিলোচন পরে আসিয়াছিল, পুরাপুরি সব কথা শোনে নাই, ত্রিলোচন প্রশ্ন কবিল, "কি বলেছে বল দিকিন গোড়া থেকে, মিলিয়ে দেখি সম্ভব কিনা।"

গোরার্চাঁদ বলিল, "বসে আছি, ছনে এসে বললে, 'গোরাদা, একাদশী মুখুজ্যে তোমায় ডাকছে।'...ওব নাম করে না কিনা ওদিকে কেউ। ভাবলাম পরশুর ব্যাপারটা বোধ হয টের পেয়েছে, ঠাট্টা করতে এসেছে। খেদিয়ে দিলুম। এক পকেট থেকে দুটো আম, আর এক পকেট থেকে কতকগুলো জামরুল বের করে বললে, 'এই দেখ, নিজে দিয়েছে বুড়ো। রাখো তোমার কাছে সবগুলো—মিথ্যে হয ফিরিয়ে দিও না, বরং মেরো যত ইচ্ছে।'...গেলাম: মিথ্যে কথা বলব না, একটু গা-ছমছম যে না করছিল এমন নয়। সে মানুষই নয়! দিব্যি আদর করে বসালে—একথা সেকথা—মানে কি কি সেবার কাজ করি, কোথায় কোথায় গতায়াত আছে সব খুঁটিয়ে জিগ্যেস করে বললে, 'গোরার্চাঁদ, পরশু কথাটা পাড়ব পাড়ব করছি এমন সময় সমিতির কাজে তোমরা হঠাৎ চলে গেলে; তবুও মনে হল একবার ডাকি কিন্তু আবার ভাবলাম—উৎসাহ করে একটা শুভকাজে বেরিয়েছে সবাই, থাক; সুবিধে দেখে একদিন ডেকেই না হয় বলা যাবে'খন। বলছিলাম আমার ঐ নাতনীটির কথা। এখন থেকে চেষ্ট-চবিত্র তো করতে হবে? একা মানুষ, তায় একেবারেই বাড়ি ছেড়ে বেরুতে পাই না, সে তো দেখতেই পাও; তাই বলছিলাম—তোমরা তো নানা কাজে চারদিকে ঘোরাফেরা কর, আলাপ-পরিচয়ও আছে, ভালও বাসে সব; তোমরা যদি খোঁজ-টোঁজ দাও মাঝে মাঝে, কিংবা ধর যদি থাকেই তেমন কোন পাত্র নজরে—এই মোটা ভাতটা মোটা কাপড়টার সংস্থান আছে, স্বভাব-চরিত্রটা ভাল হয, নেহাৎ গণ্ডমূর্খ না হয, আর বংশটা হয ভাল, তাহলেই চলবে আমার। আজকালকার বি-এ, এম-এ—শ্বশুরের সামনে টেবিলে পা তুলে দিয়ে বার্ডসাই টানবে আর বলবে ড্যাম ফাদার-ইন্-ল—ওসব আমাদের পোষাবে না। আমিও জো বুঝে মারলাম কোপ, বললাম, 'আছে একজন সন্ধানে, বলেন তো চেষ্টা করি; তবে একেবারে কথা দিতে পারলাম না; কেননা তার গার্জেনরা তো ঝুলোঝুলি করছে, কিন্তু ছোকরা বলে আমি বিয়ে না হলে চাকরি করব না'..."

কথার গোলমালে সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিতে গোরার্চাঁদ একটু লজ্জিত হইয়া শুধরাইয়া লইয়া বলিল, "বলে চাকরি না হলে বিয়ে করব না—শুনে বুড়ো বললে—কর্বে না বিয়ে,—বটে! তুমি একবার ঠকিয়ে-ঠাকিয়ে তাকে আমার নাতনীটি কোন রকমে দেখিয়ে দিতে পার? একবার দেখুক, তারপর যদি শালা ঐ মেয়ের জন্যে এসে পা না

চাটে তো...”

সকলে আবার হাসিয়া উঠিল, গন্‌শাও হাসিয়া বলিল, “শালা বুড়ো রসিক আছে তো !”

ত্রিলোচন বলিল, “দেখো পেকে আসছে সম্বন্ধ, নির্ঘাৎ ; এ বিয়ে যদি না হয় তো আমার নামে কুকুর পুষো।”

গোরাচাঁদ বলিল, “এই কথা। বিশ্বাস কর, যেতে চাও, বলে আসি কালই যোগাড়াযন্ত্র কবতে।...মেয়েটিব ওপব অনেক শালা ছেলের বাপের নজর আছে, শুভস্য শীঘ্রই হওয়া ভাল। আমি বুড়োকে বলে এসেছি, ‘দেখি যদি রাজী কবতে পাবি। আমরা দুজনে যাব।...আদৎ ছেলেটির সম্বন্ধে আপনাকে ইশারা করে দোব, পরখ করে নেবেন।’ বললেন—‘তা বেশ, গাছের ফল আমার, পুকুরেব মাছ, তোমরা দুজনেই এস বা ছাপ্পান্ন জনেই এসো’।”

গোরাচাঁদ একটু চুপ কবিল, তারপর উঠিতে উঠিতে বলিল, “তাহলে আমি গিযে বলি—না মশাই, পারলাম না রাজী করাতে ছোকরাকে !”

গন্‌শা অন্যদিকে মুখ ফিবাইযাছিল, বলিল, “রা-বাগের কি আছে এর মধ্যে ? একটা ভদ্দলোক ডে-ডেকেছে যখন...”

রাজেন বলিল, “আমি কিন্তু আব ও-মুখো হচ্ছি না। বাপ, এক দিনেই শিক্ষা হযে গেছে !” শিক্ষাগুরুর উদ্দেশে দক্ষিণ হস্তটি সসম্মানে কপালে ঠেকাইয়া নামাইযা লইল।

পরদিন রাত্রি প্রায আটটা হইবে। পাঁজি দেখিয়া আটটা সতেরোয সময ধার্য করা হইয়াছে। গোরাচাঁদ ব্যবস্থামত একটু আগেই আসিযাছে। বাহিবে আগে কোন লোকজন না দেখিয়া একবার কি রকম মনে হইল। কিন্তু ভুবন মুখুজ্যের বাড়িতে এটা তেমন অস্বাভাবিক অবস্থা নয জানিযা একটু পা টিপিযা টিপিযা গিযা বারান্দায উঠিল। অস্বস্তির ভাবটা বাড়িতেছে বই কমিতেছে না, ইচ্ছা হইল একবার ঠাকুরদা বলিযা হাঁক দেয ; কি ভাবিযা তাহা না কবিযা শুধু একবাব জোরে গলাখাঁকাবি দিল। কোন রকম সাড়া-শব্দ নাই—ডাকিতেও আব রা উঠিল না।

বারান্দার একপ্রান্তে বৈঠকখানা, তাহার সামনে কপাট থেকে হাত-দুযেক ছাড়িযা একটা কাঠের পর্দা। গোরাচাঁদ নিঃশব্দে পর্দার আড়ালে গলা বাড়াইল। দরজায আবার একটি ফুলকাটা কাপড়েব পর্দা ঝোলানো। সেটি ভেদ করিয়া কিছু দেখা যায না, তবে এটা বোঝা যায যে ভিতরে আলো জ্বলিতেছে।

আলো দেখিযা একটু সাহস পাইয়াই হোক বা দাবুণ উৎকণ্ঠা চাপিতে না পারাব জন্যই হোক, গোরাচাঁদ কাঠের পর্দাটা ঘুরিয়া গিযা দুয়ারের পর্দাটা সরাইযা ঘরে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিল বলা ঠিক হয না,—প্রথম পা-টা ভালভাবে পড়িবার পূর্বেই “ওরে বাপ্‌রে !” বলিয়া একটা অস্ফুটধ্বনি করিয়া পর্দার খানিকটা ছিঁড়িযা এবং কাঠেব পর্দাটা প্রায ফেলিযা বাহিরে আসিয়া পড়িল। লাফাইয়া নামিয়া পলাইতে এদের পাঁচজনের প্রায ঘাড়ে আসিযা পড়িযাছে,—চাপা গলায বলিল, “পালা শীগ্‌গির, সাংঘাতিক ব্যাপার !...শীগ্‌গির,—সারলে দফা !...”

রাজেন পর্যন্ত আসিয়াছে। ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল, “সাপ ?”

গোরাচাঁদ ইহাদের ছাড়াইয়া প্রায বাঁশের ফটক পর্যন্ত চলিযা গিযাছে, সেইখানে থেকেই

হাত নাড়িয়া চাপা গলায় বলিল, "দৌড়ো, তার চেয়ে সাংঘাতিক।"

এদের আগ্রহও ছিল, আবার গোরাচাঁদের ভীরুতার জন্য একটা অবজ্ঞাও ছিল। বুনো জায়গায় সাপেরই ভয় বেশি, সেটা নয় জানিয়া ইহারা আধ ভয় আধ কৌতূহলে একটু দাঁড়াইল। তাহার পর ত্রিলোচন বলিল, "চল, এতটা এসেছি যখন গুণ্ডা লাগিয়ে ঠেঙিয়ে তো মারতে পারবে না--।"

কৃত্রিম সাহসের রেষারেষিতে সকলে এক রকম ঠেলাঠেলি করিয়া পর্দা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গেই একটা মিশ্র আতঙ্কের শব্দ উচ্চারণ করিয়া যে যেমন ভাবে পারিল ছুট দিল। কাপড়ের পর্দাটা একেবারেই ছিঁড়িয়া কে. গুপ্ত আর রাজেনকে জড়াইয়া ফেলিল। ঠেলা খাইয়া কাঠের পর্দাটা পড়িয়া গেল এবং ভীতত্রস্ত পাঁচজোড়া পায়ের তলায় চুরমার হইয়া গেল। কেহ ছিটকাইয়া পড়িল, কেহ কাহারও ঘাড়ে পড়িল—তারপর কোন রকমে সামলাইয়া লইয়া বাঁশের ফটক ভাঙ্গিয়া হুড়মুড় করিয়া বাহির হইয়া গেল।

অথচ 'সাপের চেয়েও সাংঘাতিক' ব্যাপারটা কিছুই নয়। দিব্য ধবধবে ফরাসপাতা চৌকির উপর দুইটি মানুষ মুখোমুখি হইয়া অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে দাবা খেলিতেছে।

—ভুবন মুখুজ্যে আর হাতে দাড়ি মুঠাইয়া পাত্রের মামা গোলক চাটুজ্যে।

চিকিৎসা

বৃদ্ধ নবীন কুণ্ডু হঠাৎ সাংঘাতিক রকম পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে, প্রবল উত্তাপ, বিভ্রান্ত বকা, মাঝে মাঝে অচৈতন্য, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কুণ্ডু মশাইয়ের কোষ্ঠীতে 'হঠাৎ' শব্দটির প্রভাব কিছু বেশি। একজন আড়তদারের দোকানে খেরো খাতায় হিসাব লিখিত, হঠাৎ ছাড়িয়া দিয়া একদিন অল্প-অল্প চাল-ডাল-তেল-নুন সাজাইয়া নিজেই ছটাকখানেকের একটা দোকান খুলিয়া বসিল। এই রকমই চলিল বহুদিন, দাড়ি চুল পাকিয়া আসিল, তাহার পর একদিন হঠাৎ কুণ্ডু মশাইকে চেনা দায় হইয়া উঠিল- আঙ্গুল ফুলিয়া রাতারাতি কলাগাছ হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাণ্ড আড়ৎ, প্রকাণ্ড বাড়ি, প্রকাণ্ড আরও অনেক কিছু।...সমস্ত লড়াই-দুর্ভিক্ষের যুগটা ফুলিবার পালা এমন ভাবে চলিল যে আঙ্গুল তো দূরের কথা, এখন আর সেই কলাগাছ বলিয়া চেনাও দুষ্কর।

এমন সময় হঠাৎ এক সাধুর আবির্ভাব, বেশি নয়, মাত্র দু'দিন আগের কথা। কি মন্ত্র ফুঁকিয়া গেল কানে, নবীন কুণ্ডু সব ছাড়িয়া-ছুড়িয়া ওপরের একটা ঘরে হাত-পা কোলে করিয়া যোগাসনে বসিয়া গেল। কাল সমস্ত দিন এইভাবে গেছে, একটু কাঁচা দুধ আর গোটাকতক ফল-মূলের কুচির ওপর। ভোগের শরীর, ঐতেই বেশ খানিকটা কাৎ করিয়া দিয়াছিল, তাহার ওপর আজ আরও অত্যাচার গেছে--সকালবেলা ক্রোশখানেক পথ ঠেলিয়া কালীঘাটে গেল, ফিরিয়া অভুক্ত অবস্থাতেই ওপরে উঠিয়া গেল, মুখে দারুণ উদ্বেগের ভাব, যেন আর সময় নাই, খুব তাড়াতাড়ি কি কতকগুলা ব্যাপার সারিয়া লইতে হইবে। কথা খুব অল্প হইয়া গেছে, মৌনাবলম্বনের প্রায় কাছাকাছি অবস্থা, শুধু বলিয়া নিবৃত্তি গেল কালকের মতো মাত্র একটু কাঁচা-দুধ আর কয়েক খণ্ড ফলমূল দিয়াই ক্ষুন্নিবৃত্তি

করিবে, তাও বেলা পড়িয়া গেলে। দুয়ার বন্ধ করিয়া আবার আসনে বসিল। বারণ রহিল কেহ ওদিকে গিয়া যেন বিঘ্ন উৎপাদন না করে।

সকলে উৎকণ্ঠিতই ছিল, বিকাল হইলেই আহার্য লইয়া গৃহিণী আর পুত্রবধূ গিয়া দুয়ারে মৃদুমন্দ করাঘাত করিল। দুয়ার তো খুলিলই না, অধিকন্তু বিড বিড করিয়া অস্পষ্ট উচ্চারণে যে কতকগুলি কথা আসিযা কানে লাগিল তাহাতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া উভয়ে উভয়ের মুখের পানে সংশযের দৃষ্টিতে একটু তাকাইয়া রহিল। পুত্রবধূ একটু জোরে দুয়ারে করাঘাত করিয়া ডাকিল—'বাবা!'

উত্তর নাই, বিডবিডানি একভাবে শোনা যায, মাঝে মাঝে কতকগুলা কথা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—হাজার বোরা—মডক—বিশ লাখ—সরিয়ে ফেল! সরিযে ফেল্!...

গৃহিণী, বধূ দুইজনেই দুয়ারে প্রবল করাঘাত করিয়া ডাকাডাকি করিল। একটুখানির মধ্যে বাড়িতে হৈচৈ পডিয়া গেল। কপাট ভাঙ্গিতে হইল, তাহার পব দেখা গেল নবীন কুণ্ডু গুটিসুটি মারিয়া পডিয়া আছে, খানিকটা আসনে খানিকটা মেঝেয, আর জ্বরের তাপে শরীর পুড়িয়া যাইতেছে। পাঁজায তুলিযা তাডাতাডি শযনঘরে লইয়া যাওয়া হইল।

ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকি পডিযা গেল, ডাক্তারের জন্য মোটর ছুটিল, ভাইপো কাঙালিচরণ দিনাজপুরের দিকে চাল খরিদ করিতে গিযাছে, গবর্ণমেণ্টের ঠিকা, তাহাকে জরুবী তার করিযা দেওয়া হইল। ছেলে হারাধনের জন্যও চারিদিকে লোক দৌড কবাইয়া দেওয়া হইল।

কঠিন ব্যাধি, ডাক্তারেরা একেবারেই থৈ পাইতেছে না। ব্যাধির ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া যাইতেছে সাধুর দ্বারা কিছু হোম-যাগের অনুষ্ঠান, আর কাল থেকে আজ পর্যন্ত নবীন কুণ্ডুর একরকম উপবাস করিযাই কি সব যৌগিক সাধনায ব্যাপৃত থাকা। প্রথমটা মনে হইয়াছিল, সাধু কিছু খাওযাইয়া গিয়া থাকিবে। পাকস্থলীতে পিচকাবি লাগাইযা কিছু পাওয়া গেল না, রক্ত পরীক্ষা করিযাও নয। অন্য পরীক্ষাও হইল নানা রকমের, ডাক্তারেব সংখ্যা বাড়িতে লাগিল এবং প্রত্যেকে একটা নূতন কিছু পরীক্ষা করাইল, কিম্বা আগের পরীক্ষা নূতন স্থান হইতে করাইযা আনিল, কিন্তু কিছুই হদিস পাওয়া যাইতেছে না।

অবস্থা এদিকে ক্রমে খারাপই হইয়া উঠিতেছে, স্বরটা ঠেলিযা উঠিতেছে, অচৈতন্য অবস্থার মেয়াদটা বাড়িতেছে, যখন চেতনা হইতেছে তখন ভুল-বকাও সমানে চলিযাছে। একটা জিনিস স্পষ্ট, ব্যাধিটা ক্রমেই যেন মস্তিষ্কের দিকে অগ্রসর হইতেছে, সেখানে একবার জাঁকিযা বসিলে আর উপায থাকিবে না, এদিকে বযস হইযাছে যে অনেক।

২

পরদিন কাঙালিচরণ আসিযা উপস্থিত হইল। ছেলেটা জেঠার ভারি ভক্ত, আগে ছিল না, লড়াই-দুর্ভিক্ষের পর থেকে হইযা উঠিযাছে। তাহা ভিন্ন নূতন ব্যবসাযে ঢুকিয়া চোরাকারবারে টাকার স্বাদ পাইয়াছে, কিন্তু জেঠার জন্য প্রবল বেগে আবার নূতন করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিযা দিল। কিছুই ফল হইল না, তবে অনেকগুলা টাকা পকেটস্থ করিয়া ডাক্তারেরা একটা নূতন চিকিৎসার সন্ধান দিযা গেল। বলিল ব্যাধিটা নিছক মানসিক, মনঃসমীক্ষক ডাকিতে হইবে, ইংরাজি নাম বলিল, 'শাইকিএ্যাট্রিস্ট'।

দু'একজনের ঠিকানাও দিয়া গেল। কাঙালিচরণ খুব বড দেখিয়াই একজনকে ডাকিয়া আনিল। সে প্রলাপের দিকে কান পাতিযা ঘরে রোগীর কাছে প্রায় ঘণ্টাখানেক একলা

বসিয়া থাকিবার পরে বাহিরে আসিয়া প্রধানতঃ রোগীর নৈতিক চরিত্র লইয়া কাঙালিচরণকে যেসব প্রশ্ন করিতে লাগিল, তাহাতে কাঙালিচরণের মনে হইল সে নিজেই প্রলাপ বকিতেছে। যাই হোক চিকিৎসায় ঢিলা দিল না, আরও জন-দুই-তিন ঐজাতীয় ডাক্তার ডাকিয়া কন্‌সাল্‌টেশনের ব্যবস্থা করাইল, তাহারা প্রলাপ শুনিবার জন্য একজোটে ঘণ্টাখানেক বসিয়া থাকিবার পর বাহিরে আসয়া আধঘণ্টা প্রলাপগুলা বিশ্লেষণ করিয়া রায় দিল—বিশেষ কিছু পাওয়া যাইতেছে না, তবে ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপাব থাকা নিতান্ত অসম্ভব নয়, তাহার সঙ্গে বোধ হয় লিবিডোর গোলমালও আছে। অন্য ডাক্তার ডাকিয়া রোগীকে সামান্য একটু চাঙ্গা কবিতেই হইবে, যাহাতে সে প্রলাপের বাহিরে একটু আলাপ করিতে পারে,—দু'একটা সাদা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।

আবার দৈহিক ডাক্তাব আসিল, রক্ত প্রভৃতি আর একবার পরীক্ষা করাইয়া নূতন করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ হইবে,—এমন সময় কোথা থেকে হঠাৎ হারাধন আসিয়া উপস্থিত হইল।

হারাধন নবীন কুণ্ডুর পুত্র। ঐ একটি মাত্র ছেলে, কিন্তু একেবারে বাতিল। বাড়ির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। নেশা-ভাঙ্ লইয়া বাহিরে-বাহিরেই কাটায়—অভাব-অনটনটা হইল, মাসে এক-আধবার বাড়ি আসিল, যে-কোন উপায়ে কিছু মোটারকম হাতাইয়া আবার উধাও হইল। এর মধ্যে ছেলে যে একটা আছে নবীন কুণ্ডু সেটা টের পায় এ-দোকান, ও-হোটেল, সে-রেস্তরাঁয় বিলে। নির্বিবাদে শোধ করিয়া দেন। একটি ছেলে, স্নেহের দুর্বলতা আছেই, তাহা ভিন্ন মাতাল ছেলে বাড়ি আসিয়া গণ্ডগোল লাগাইবে সে ভয়টাও আছে যোল আনা, টাকা যে ভাবেই আসুক, বাড়িতে গাড়ি, লোক-লস্করে মর্যাদাটা তো বাড়িয়েছেই।

হারাধন যে শুধু স্নেহের ওপর নির্ভর করিয়া আছে এমন নয়, নিজেব দর বোঝে, একটু স্পষ্টবক্তা, তায় প্রায় সারাক্ষণই রঙে থাকে। অল্প একটু বাধা পাইলেই বলে—"দেবে না বললেই হোল ? যে কাণ্ডটি ক'রে হাজাব হাজার লোককে পেটে মেরে বাবা স্বর্গে যাচ্ছে, সেখানে খোরাক যোগাতে হারাধনকে কী বেগটা পেতে হবে ভেবে দেখবে না ?—"

হারাধন বাপের অসুখেব সংবাদ শুনিয়া আসে নাই, এমনি মাঝে মাঝে নিজের মর্জি মাফিক যেমন আসে সেইভাবে হঠাৎ হাজির হইয়াছে। বাহিরেই শুনি কর্তার শেষ অবস্থা, এ-যাত্রা বুঝি আর টেঁকেন না। বাড়ি আসিবার সময় হারাধন বরাবরই একটু অপ্রকৃতিস্থ থাকে, সেইজন্য যখন যে-ভাবের মধ্যে আসিয়া পড়ে সেই ভাবটার একটু বাড়াবাড়ি হইয়া দাঁড়ায়। ঘটা করিয়া কান্নাকাটি শুরু করিতে যাইবে সবাই বলিল—আগে গিয়া একবার দেখা করা দরকার বাপের সঙ্গে। ধরিয়া উঠাইয়া ভিতরে লইয়া যাইতে মেয়েদের মধ্যে চাপা কান্না উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, হারাধন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল, বলিল—"তোমরা ছেড়ে দাও আমায়, আমি এ মুখ আব দেখাব না বাবাকে !" অসুখের বাড়িতে এ আবার উল্‌টা হিড়িক দাঁড়াইল, ছেলের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হওয়াটা নিতান্ত দরকার, আসিয়াই যখন পড়িয়াছে। ছেলে কিন্তু কোট ধরিয়া বসিল—এ মুখ আর দেখাইবে না। শেষে একজন আত্মীয় জেঠাইমা আসিয়া বলিল—"মুখ কি আর দেখতে পাচ্ছেন রে বাবা ? সে ভয় তোর নেই—দেখলেও যে চিনতে পাচ্ছেন না। তুই চল নিশ্চিন্দি হয়ে, শুধু সামনে দাঁড়াবি। বাপই তো, মুখ না দেখাস, দেখবার ইচ্ছেটাও তো হতে হয় একবার।"

বিপদটার একেবারে সামনাসামনি হইয়া হারাধনের নেশাটা একটু পাতলা হইয়া

আসিল। জ্বরের ঘোরে বাবা তখন অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে, একবার একটু জ্ঞানের মতো হইয়া বিড়বিড় করিয়া বকিয়াও গেল, দু'একজন কানের কাছে ঝুঁকিয়া বেশ একটু জোর আওয়াজেই জানাইল হারাধন আসিয়াছে। রোগী কিন্তু আবার নিঃসাড় হইয়া পড়িল।

হারাধন জিজ্ঞাসা করিল—"চিকিচ্ছে কিছু হচ্ছে, না কাঙালি জেঠাকেও ব্ল্যাক মার্কেটে চড়াবার মতলব করেছে?"

সকলে জানাইল চিকিৎসা পুরাদমেই চলিতেছে, এদিককার ডাক্তার তো আছেই, তাহার ওপর মানসিক ডাক্তারও আসিতেছে।

হারাধন ঘুরিয়া পাতলা নেশার ঢুলঢুলে চোখে খানিকক্ষণ বিস্মিত ভাবে চাহিয়া রহিল, তাহার পর জড়িত কণ্ঠে বলিল,—"মানোসী! এই প্রথম শুনচি, চাঁদসীদের জ্ঞাতিভাই নাকি?"

সকলে যেমন শুনিয়াছে, তাহাদের পদ্ধতিটা বুঝাইয়া দিল। রোগীর কথাবার্তা শুনিয়া তাহারা একেবারে মনের মধ্যে ঢোকে, তারপর সেইখান থেকে একেবারে রোগের গোড়া ধরিয়া চিকিৎসা করিতে করিতে উঠিয়া আসে।

হারাধন একটু বুঝিবার চেষ্টা করিয়া খানিকটা রাগিযাই উঠিল, চোখে একটু চাড়া দিয়া বলিল—"মনের মধ্যে ঢুক্‌বে! তাদের ঘরে ঢুকতে দিলে কে? কাঙালি কোথায়?"

কাঙালি হারাধনকে এড়াইযাই চলে, তাহাকে পাওয়া গেল না। খানিকক্ষণ আবার চুপ করিয়া রহিল হারাধন, চিন্তা করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ঢুলিতেছেও একটু একটু, তাহার পর প্রশ্ন করিল—"তা পারলে ঢুকতে তাদের মধ্যে কেউ?"

সকলে সে-ইতিহাসটাও জানাইল। চেষ্টা করিয়াছে, তবে রোগী আগা-গোড়াই বিভ্রান্ত বকিতেছে, তাহারা বলিতেছে, সাধারণ চিকিৎসকে একটু যদি চাঙ্গা করিয়া দিতে পাবে, রোগী এক-আধটাও সুসংলগ্ন উত্তর দেয় তো তাহারা সেইটুকুর সূত্র ধরিযাই তাহাকে দাঁড করিয়া দিতে পারে।

"হুঁ...এরা কি বলছে?"

"এরা বলছে, তবে আর ওদের ডাকা কিসের জন্যে?"

"হুঁ!...শিবের গুরু রাম, রামের গুরু শিব, বুঝেছি! কত দুইলে দু'দলে ছোট করে?"

ইহার পর আর একটা দীর্ঘতর 'হুঁ'—উচ্চারণ করিয়া হারাধন আবার চুপ কবিল। এবার অনেকক্ষণ গেল, চোখ দুইটি বোজা, মাঝে মাঝে মাথা দোলানো থেকে মনে হয গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। ইতিমধ্যে রোগী বারতিনেক প্রলাপ বকিল, সেটাও মন দিয়া শুনিল হারাধন—"বিশ লাখ—খেতে পেলে না,...সরা বোরাগুলো—ফেলে দে ফেলে দে!"—তাহার পর এক সময় চোখ খুলিযা বলিল—"হয়েছে, ডাকো তাদের, আগে মানসীর দল।"

হারাধনের নির্দেশে গদির মুহুরিদের মধ্যে যে সব চেয়ে বড়ো—একজন পাকা-চুল বৃদ্ধ—তাহাকে ডাকিয়া আনা হইল। হারাধন বাহিরে এক প্রান্তে গিয়া তাহাকে চুপি চুপি কি একটা কথা বলিয়া পিঠে মৃদু করাঘাত করিল, বলিল—"চট্‌পট-এক্ষুনি বসে যান।" তাহার পর ভেতরে আসিয়া রোগীর কানের কাছে মুখ লইযা গিয়া বেশ জোরেই ডাক দিল—"জেঠামশাই। জেঠামশাই!!"

হারাধনের মা কানে আঙ্গুল দিয়া হন্ হন্ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। আত্মীয় জেঠাইমা আর দু'একজন একটু বিস্মিত হইয়া বলিল—"ও হারাধন, বাপ যে! এই কি তোর নেশা করে জ্ঞান হারাবার সময় বাবা?"

হারাধন ইঙ্গিতে তাহাদের চুপ করিতে বলিয়া আবার ডাকিল—"বলি জেঠামশাই !—শুনছেন ?"

কি হইল বলা শক্ত, তবে "অঁ... ?" করিয়া একটা যেন উত্তর দেওয়া গোছের শব্দ করিয়া রোগী পাশ-মোড়া দিল।

হারাধন আবার কানের কাছে গিয়া হাঁকিল—"জেঠামশাই ! আমি কাঙালি—ফিরলুম দিনাজপুর থেকে !"

রোগী পিট পিট করিয়া চাহিল, কিন্তু বুদ্ধির দীপ্তি নাই, সংজ্ঞাটুকু প্রলাপে গড়াইয়া পড়িল—"সরা বোরা—সরা—সরা ! বিশ লাখ...বিশ লাখ মোলো !..."

হারাধন ঢুল-ঢুল চোখে একবার সবার দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিল, বলিল—"বললুম না তখন ? শালা বৈরিগী আমার বাবার মনে অনুতাপ সাঁদ করিয়ে গেছে !" তাহার পর আবার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—"তা মরুকগে, এদিকে একের দশ !..."

রোগীর চোখে একটু যেন বুদ্ধির দীপ্তি আসিল, দৃষ্টি ঘুরাইয়া একটু দেখিল, তারপর প্রশ্ন করিল—"লাভ হোল ?"

"হ্যাঁ, তবে আর বলচি কি ? সেই দশ হাজারের লট্‌টা লাখে দাঁড়িয়েছে !"

রোগী বেশ বুদ্ধিদীপ্ত চোখে আবার চারিদিকে চাহিল, বেশ ভালো ভাবেই সবাইকে চিনিতেছে, একটু আচ্ছন্নভাবে বলিল—"হারাধন না ?...স্বপ্ন দেখছিলুম কি ? মেলা পেযাদা—চারিদিক থেকে নালিশ করছে...আর কি দুশমন চেহারা পেয়াদা-বেটাদের ! সবাইকে সরে যেতে বল্ দিকিন একবার..."

"তুমি ভেবো না, ওসব পেযাদারও উপায় আছে, সবই তো চাঁদির খেলা। ঘুমটা ভেঙে কেমন বোধ হচ্ছে ? দু'নম্বরের গুদোমটাও দেবে খুলে ?"

নবীন কুণ্ডু একটু চাড়া দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে সবাই তাকিযার সাহায্যে আধ-শোয়া করিয়া বসাইয়া দিল। মনের দিক দিয়া তো আচ্ছন্নতার ভাব নাই, শরীরের দিক দিযাও অনেকটা চাঙ্গা, বলিল—"দশ হাজারের ইস্টক্‌টা এক লাখ দিলে !...এ্যাঁ, কি বললে ?—হ্যাঁ, ঘুম ভেঙে ভালোই বোধ হচ্ছে—ইযে, মুহুরি গুরুচরণকে ডাকিযে পাঠাও তো—খাতাটা নিয়ে...আর আমার গডগড়াটা..."

মনঃসমীক্ষকরা দুজন আসিল। নবীন কুণ্ডু তখন বাঁ হাতে গডগডার নল লইযা খেরোর বইয়ের পাতা উল্টাইয়া দশ হাজার থেকে এক লাখের হিসাব দেখিতেছে। চোখটা তুলিযা দুইজন ভদ্রলোককে সামনে দেখিয়া একটু অন্যমনস্ক ভাবে বলিল—"কি দরকার ?...হচ্ছে, বসুন একটু।...কিন্তু দর চডেছে, আর ও-দরে ছাডতে পারব না..."

ছোড়দি-রহস্য

এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেছে। ছাতা সঙ্গে আছে, তবুও দ্বিতীয় পশলা নামিবার পূর্বে বাসায় পৌঁছানো নিতান্ত দরকার, ত্রস্তপদে চলিয়াছি, এমন সময় ভদ্রলোক পিছন থেকে আসিয়া সঙ্গ লইলেন, আলাপের সূত্রপাত করিলেন—"এই যে আপনার ছাতা আছে দেখছি!"

বয়স মনে হইল ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে। উগ্র রকম শৌখিন,—ছিপছিপে চেহারা, ফিনফিনে ধুতি পায়ের গোছের নিচে লুটাইয়া পড়িয়াছে, কস্ট্যুম-গেঞ্জির ওপর অরগ্যান্ডি কাপড়ের পাঞ্জাবি, হাতে একটা চেরিউডের পাতলা ছড়ি। মোট কথা, ছাতা বহিবার পাত্র নয়!

আমি হাসিয়া বলিলাম—"হ্যাঁ, ছাতা যে আছে তার আরও প্রমাণ আছে।"

পাঞ্জাবিটা খুলিয়া কাঁধে ফেলিয়া, কাপড়টা হাঁটু পর্যন্ত গুটাইয়া লইয়া মেঠো চালে আসিতেছিলাম, হাতটা আলগা করিয়া দিলাম এবং পাঞ্জাবিটাও কাঁধ থেকে নামাইয়া মেলিয়া ধরিলাম। ভদ্রলোক বৃষ্টি হইলে ছাতার নিচে একেবারেই ঘেঁষাঘেঁষি চলিতে হইবে বলিয়া একটু কাছেই ঘেঁষিয়া আসিয়াছিলেন, একেবারেই তিন হাত তফাতে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—"এ কি! কাঁচা রং নাকি?"

বলিলাম—"হ্যাঁ, জল-কাচ করলেই ধুয়ে যাবে, কোন ভয় নেই।"

ভদ্রলোক আরও হাত-খানেক সরিয়া গেলেন, বলিলেন—"মাফ করবেন, ও-ছাতার নিচে আর যাই!"

ভুল হইয়া গিয়াছিল,—অতিরিক্ত শৌখিন জামা-কাপড় নষ্ট করায় একটা বর্বর আনন্দ পাওয়া যায়, হঠাৎ কি করিয়া সেই ঝোঁকে পড়িয়া গিয়াছিলাম, ভদ্রলোকের সন্ত্রস্ত ভাব দেখিয়া একটু লজ্জিত হইয়াই হাসিয়া বলিলাম—"না আসুন, ও ছাতা কি আর নিজেই খুলি আমি? তবে ঐ, আপনাকেও সাহায্য করতে পারলাম না। তা অন্তত ভেজার সঙ্গী তো পাবেন একজন, সেটাও কম লাভ নয়!—কত দূর যাবেন?"

"ক্যাস্টর টাউন। ঢুকতেই আমার বাসা।—আপনি?"

"ঐ দিকেই, তবে অনেকটা ভেতরে গিয়ে।"

"বেশ চলুন, আমার ওখানেই জামা-কাপড় ছেড়ে নেবেন, তার পর চা খেয়ে বেরিয়ে পড়বেন। না, বেশ ভিজে গেছেন।"

"আজ্ঞে না, তার দরকার হবে না, মাফ করবেন!" এবার আমিই যে ভীত হইয়া পড়িয়াছি, কণ্ঠস্বরে সেটা বেশ স্পষ্টই প্রকাশ হইয়া পড়িল; ভদ্রলোক একটু বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিলেন—"কেন?"

বলিলাম—"না, সাদা জলে ভেজা নয় তো, দেখতেই পাচ্ছেন ছাতার কালি একেবারে ভূত করে দিয়েছে, এ অবস্থায়—"

"কি যা করে দিয়েছে তা তো দেখেই ফেললাম, তখন আর আপত্তি কি থাকতে পারে?"

আমি একটু কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিলাম। ভদ্রলোক তবুও বিস্মিতভাবে চাহিয়া আছেন

দেখিয়া বুঝিলাম, বুদ্ধিটা শরীর বা বেশভূষার অনুরূপ সূক্ষ্ম নয়, তখন নিরুপায় হইয়া আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইল—"এ অবস্থায় মহিলাদের সামনে, এমন কি ছোট ছেলেমেয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো...বুঝতেই পারেন।...বাড়িটা তো দেখেই যাচ্ছি, অন্য একদিন আলাপ-পরিচয় করা যাবে তখন।"

এইটুকুই ভদ্রলোকের চরিত্রের দুর্বল স্থানটিতে সোজাসুজি গিয়া ঘা দিল এবং তিনি প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁহার ছোড়দির প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়া দিলেন।—

এ রকম অবস্থায় গিয়া শুধু এক ছোড়দির সামনে দাঁড়ানোই বিপজ্জনক--মুখে কিছুই বলিবেন না, বরং এমন ভালো মানুষের মতো মুখটি করিয়া দাঁড়াইবেন, মনে হইবে লোকটি নাকাল হওয়ায় মনে মনে যেন সব চেয়ে তিনি বেশিই দুঃখিত। শুধু ঠোঁটে খুব অল্প একটু হাসি, খুবই অল্প, এত অল্প যে যাহার জানা নাই সে ধরিতেই পারিবে না। তাহার পর কোনখানে চুপটি করিয়া বসিয়া ঐ নাকাল হওয়া লইয়াই এক লম্বা ছড়া। খানিকক্ষণ পরে শোনা যাইবে যত ছেলেমেয়ে আছে বাড়িতে, সবার মুখে-মুখে সেই ছড়া ঘুরিতেছে! কে একটু আছাড় খাইল, কে আছাড় খাইতে খাইতে সামলাইয়া লইল, কাহার কথায় একটু বেফাঁস হইয়া বক্তাকে অপ্রতিভ করিয়া দিয়াছে, সব কিছুর ইতিহাস জমা থাকা চাই ছোড়দির ছড়ায়। নাকাল করিতে পারিলে আর কিছু চায় না ছোড়দি।...সে-দিক দিয়া সম্পর্ক-জ্ঞানের বালাই নাই। বড়দা'ও তেমন অবস্থায় পড়িলে রেহাই পায় না, আর ঠাট্টার সম্পর্কের কেহ হইলে তো কথাই নাই, বাড়ির জামাই হোক্, জামাইয়ের আত্মীয় হোক্, ছোড়দির সামনে একবার পড়িলে হইল! ছোড়দির ভয়ে বাড়ির সবাই কাঁটা হইয়া আছে, অথচ এক দণ্ড যদি বাড়ি না থাকে বাড়িটা যেন খাঁ-খাঁ করিতে থাকে—ভয়ঙ্কর আমুদে মানুষ যে এদিকে!—ছোড়দি এখানে থাকিলে কি ভদ্রলোক আমায় আহ্বান করেন! ছাতার কালিতে সং সাজিয়া একজন ভিজিতে ভিজিতে বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল—ছোড়দি তো তাহা হইলে একটা মহাকাব্য রচনা করিয়া বসিবে। ভদ্রলোক জানিয়া-শুনিয়া কি আমায় বাঘের মুখে তুলিয়া দিতে পারেন?

বলিলাম—"তিনি থাকলে, যেমন বলছেন, যথেষ্টই ভয়ের কারণ হোত, তবু অন্য কারুর সামনেও এ অবস্থায় গিয়ে ওঠা খুবই অস্বস্তিকর নয় কি? দেখলে নিতান্ত যে ভালো মানুষ তারও যে ছড়া কাটবার লোভ উদয় হবে মনে। তা ছাড়া ছড়ার ভয় না থাক, নিজের শালীনতা-জ্ঞান আছে তো মানুষের?...আর আপনার সঙ্গে দেখা না হলে তো বাসাতেই যেতাম চলে বরাবর!"

ভদ্রলোক জানাইলেন মেয়েছেলের পাটই নাই বাসায়, তিনি ওদিক দিয়া একেবারে একক, থাকার মধ্যে একটি চাকর আর একটি পাচক ব্রাহ্মণ, এইখান থেকে যোগাড় করা। পূজার সময়টা কাটাইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন, তাহাও মাত্র কয়েক দিন হইল, এখনও ভালো করিয়া আলাপ-পরিচয়ও হয় নাই কাহারও সহিত।

আবার ছোড়দির কথা আসিয়া পড়িল। ভদ্রলোক তন্ময় হইয়া গিয়া মাঝে মাঝে আকাশের কথা ভুলিয়া যাইতেছেন, মনে করাইয়া দিতে হইতেছে। এই অবস্থায় প্রায় সন্ধ্যার সময় তাঁহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

২

ভদ্রলোকের নাম হিরণ্ময়। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হইল। উনিও আসেন আমিও যাই, তবে আমাব যাওয়াটাই বেশি, কেননা আমার বাসায় আরও পাঁচজন আছে, গল্প করিতে বেশ জুৎ পান না উনি। এদিকে লোক বেশ ভালো। প্রচুর আদর-আপ্যায়ন, জলখাবারের হিসাব নাই। এ বিষয়ে বেশ সৌখিনও, পাচকটিও পাইযাছেন বড় ভালো। সবই ভালো, এক ঐ ছোড়দি ছাড়া। ক্রমে বুঝিলাম ভদ্রলোকের আলাপ-পরিচয় যে বেশি নাই তাহার কারণও ঐ ছোড়দি! এ রকম অভ্যর্থনায এ বাসায় স্বাস্থ্যান্বেষীদের দলে দলে ভাঙিয়া পড়িবারই কথা, কিন্তু বেশ বোঝা যায়, দেওঘরের পাহাড়ী জলেও অত 'ছোড়দি'-মিশ্রিত খাদ্য তাহাদের দুষ্পাচ্যই হইয়া পড়ে। ভদ্রলোকের এই দুর্বলতাটুকুর সুযোগ গ্রহণ করিবার মতো লোক যে একেবারেই নাই এমন নয়, আসে, ওষুধ-গেলা করিয়া গল্পগুলা শোনে, আহার করিয়া ভদ্রতার খাতিরে খানিকক্ষণ বসেও, তাহার পর একটা-না-একটা ছুতা করিয়া চলিয়া যায। আমি আসিও বেশি, আসিলে বসিযাও থাকি অনেকক্ষণ, কেননা পেটের খোরাকটা আমার গৌণ, লক্ষ্য থাকে লেখনীর খোরাকের ওপর। প্রবাসে বেশি মেশামেশির জন্য ওঁর এই দুর্বলতাটুকু বোধ হয় একটু অবহেলার চক্ষেও দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া পডিতেছি ক্রমে ক্রমে, মোটের উপর আমি আসিলে দু'জনে ভালোই জমে, আমিও শরীর এলাইযা দিই, উনিও মনের কপাট দেন খুলিয়া। এক এক দিন রাত্রি হইয়া যায়, রাত্রের আহার ঐখানেই সমাধা করিতে হয়, পাচক একটি দ্রব্য আনিযা উপস্থিত করে, ছোড়দির গল্পের এক একটি অধ্যায চলে বাড়িয়া—

"শুনছেন শৈলেনবাবু? এই মাছের ফ্রাই—আচ্ছা আগে আপনিই বলুন, কি রকম লাগছে আপনার?"

আস্বাদ গ্রহণ করিযা বলি—"কেন, ভালোই তো করেছে, আপনার কি রকম মনে হয়?"

হিরণ্ময়বাবু একটু মুচকি হাসিয়া মাথাটা অল্প অল্প দোলান, বলেন—"না, খারাপ হয নি, সে কথা বলছি না, লোকটা রাঁধে ভালোই। তবে কথা হচ্ছে—তা আপনাকে দোষ দোবই বা কি করে? ছোড়দির হাতের রান্না তো খান নি? ফ্রাই খেয়েছি অনেকেব হাতেই, গ্রেট ইস্টার্ণও বাদ যায় নি, ছোডদির হাতের ফ্রাই—সে এক জিনিসই আলাদা মশাই! এই তো এ-ব্যাটা করেছে ভালোই, এমনি অন্যমনস্ক ভাবে খেয়ে গেলে ভালোই লাগত, কিন্তু ঐ যে আপনাকে জিগ্যেস্ কবতে গিয়ে ছোড়দির ফ্রাইয়ের কথা মনে পড়ে গেল, ব্যাস, আর চলবে না, ফিকে মেরে গেছে!"

সেই মৃদু হাসিটা প্রসারিত হইয়া যায় আর একটু। ফিকে লাগিয়া যাওয়ার প্রমাণ-স্বরূপ ফ্রাইয়ের খণ্ডটা আস্তে আস্তে সরাইযা রাখিয়া আমার মুখেব পানে চাহিযা থাকেন। একটা জিনিস পাশেই একজনের রসনায বিস্বাদ লাগিল বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইল, অথচ অপর একজন তৃপ্ত লুব্ধতায় বেশ খাইযা যাইতেছে—বেশ একটু অস্বস্তিতে পড়িয়া যাইতে হয আমায। হিরণ্ময়বাবু কিন্তু এতই ছোডদিতে বিভোর যে সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই, পাচককে ডাকিয়া বলেন—"ঠাকুর, আর কিছু করেছ, না বাবুকে তোমার ফ্রাইয়ের নমুনা দেখিয়েই বাড়ি পাঠিয়ে দেবে?"

ঠাকুর হয়তো প্লেটে করিয়া দুইখানি অমলেট আনিয়া হাজির করিল। হিরণ্ময়বাবু অল্প একটু ব্যঙ্গ-হাস্যের সঙ্গে হাতটা কোলের দিকে টানিয়া লইয়া একটু যেন গুটাইয়া বসিলেন,

বলিলেন—"নাঃ, আজ তুমি আমার খাওয়া বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছ ঠাকুর—"

কি মন্তব্য আসিতেছে আন্দাজ করিয়াও আমি একটু বিস্ময়ের অভিনয় করিয়াই প্রশ্ন করি—"কেন, কি হোল বলুন তো ?"

"ঐ যে বললাম, যাতে-যাতে ছোড়দির হাত বিশেষ করে খোলে, বেছে বেছে সেইগুলি রেঁধেছে আজ। অন্যদিনও যে না রাঁধে এমন নয়, অন্যমনস্ক হয়ে খেয়েও যাই বেশ, কিন্তু আজ ঐ যে বললাম, একবার যখন ছোড়দির হাতের কথা মনে পড়ে গেছে—"

নিজের অপ্রতিভ ভাবটা চাপা দিবাব জন্যই এক এক সময় একটু বলিতেও হয় কিছু, বলি—"এ যে আপনার বরে শাপ হয়ে দাঁড়াল হিরণ্ময়বাবু। না, একটু মনের জোর করে তাঁকে ভুলুন, দেওঘরের জল, এখানে উপোস দিলে যে নাড়ি হজম হয়ে যাওয়াব ভয় আবার ! শেষে উপোসের পেটে একটা ব্যামো-ট্যামো হয়ে অমন ছোড়দির হাতের খাওযাব পাটই উঠিয়ে দেবেন ?"

একটু কামড় দিয়া উৎসাহিত কবিবারও চেষ্টা করি, বলি—"না, নিতান্ত খারাপ হয় নি, দেখুন না, ঘিটাও ভালো পাচ্ছেন এখানে, বেশ স্বাদ খুলেছে।"

হিরণ্ময়বাবু একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"তাহলে আপনাকে সেদিনকার গল্পটা একবার শুনিয়ে দিতে হচ্ছে একটু। বাড়িতে ফ্রাই, চপ আর অমলেটের কম্পিটিশ্যন—বৌদি, ছোড়দি আর ছোট খুড়িমা। আমি ছুটিতে গেছি, আমার ওপর দিয়ে পরীক্ষা হবে। খুড়িমা তার বাপের বাড়ি থেকে একেবারে খাঁটি গাওয়া-ঘি যোগাড় করেছে, বৌদি পরেশদা'কে দিয়ে এক নম্বর লার্ড আনিয়েছে, একেবারে গ্রেট্‌ ইস্টার্ণেব বান্নাঘর থেকে—সব চুপি চুপি—নিজের নিজের মশলা নিজের নিজের ভাজাব সবঞ্জাম—নিজের নিজের বান্না, কেউ কাউকে হেকমৎটা জানতে দেবে না তো ! পরীক্ষার পদ্ধতিটাও লক্ষ্য করবেন—সে-ও ওই ছোড়দির ব্রেন—প্রত্যেক প্লেটে মাল থাকবে মেশানো—ছোড়দিব চপ তো বৌদির অমলেট, খুড়িমার ফ্রাই। এ-রহস্যটুকু আবার আমাব কাছ থেকে গোপন বাখা হোল। তিনখানি প্লেট সামনে এসে পড়ল...ঠাকুর, বাবুকে আর একটা অমলেট দিয়ে যাও।"

বলিলাম—"তা দিক, হযেছে ভালো। আপনিও দেখুন না মুখে দিয়ে একটু।"

হিরণ্ময়বাবু সেই প্রশ্রয়ের মৃদু হাস্যের সহিতই বলিলেন—"আগে গল্পটাই শুনে নিন, তার পর পাবেন অনুরোধ করবেন...। তিনটি প্লেট সামনে এসে পড়ল, সবাই ঘিবে বসে। দু'টিকে আস্তে আস্তে শেষ কবে বললাম—এই প্লেটের চপ, এই প্লেটের ফ্রাই আর এই প্লেটের অমলেট আর একটা করে চাই আমাব..."

হিরণ্ময়বাবু চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া সেই হাসিটিকে আরও একটু বিস্তারিত কবিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন, নূতন অমলেটটা চিবাইতে চিবাইতে বলিলাম—"ছোড়দির নিশ্চয় ?"

সোজা উত্তর দেওয়া দরকার মনে কবিলেন না হিরণ্ময়বাবু, বলিলেন—"সে এক ওয়াণ্ডাবফুল জিনিস মশাই ! অথচ ছোড়দি অত সরঞ্জামের ঘটাব দিকে মোটেই যায় নি, ভেজেছে পর্যন্ত বললে ভেজিটেবল ঘিয়ে—বাজারের যা ওঁচা জিনিস !"

এমন অসম্ভব বকম কাণ্ডে বিস্মিত হইয়া বলিতেই হয—"আশ্চর্য হাত তো ! কিন্তু আপনার ক্ষমতাটাকেও বলিহারি দিতে হয সেই সঙ্গে—"

হিরণ্ময়বাবু নিতান্ত আত্ম-অবহেলার স্বরে বলিলেন—"আমার কথা বলছেন ? আমার আর কি বাহাদুরি আছে এর মধ্যে ? ঐ যে বললাম—ছোড়দির হাতেও তার যে পেয়েছে

সে তো একেবারে বাঁধা পড়ে গেল কিনা, অন্য হাত যে একেবারে ফিকে ঠেকতেই হবে তার মুখে। ও তো তিনজন, আমি যে লাখের মধ্যে ছোড়দির রান্না বেছে নোব কিনা, সে পরীক্ষাও হয়ে গেছে—"

আরব্য-রজনীর মতো একটার গায়ে একটা কাহিনী আসিয়া পড়ে, বাসা বেশ খানিকটা দূর, আমি একটু ভয়ে ভয়ে বিস্ময়ের ভান করিয়া বলি—"একদিন শুনতে হবে তো! - ঠাকুর, আর কি আছে?"

-হয়তো পায়সের মতো শেষ-পাতের কোন জিনিস আসিয়া উপস্থিত হইল। ছোড়দির স্মৃতির উপদ্রবে সব জিনিস ঠেলিয়া রাখায় ক্ষুধাটা নিশ্চয় চাগাইয়া উঠিয়াছে, সেই জন্যই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, হিরণ্ময়বাবু খানিকটা আহার করিয়া গেলেন। নিজেও অসঙ্কোচে খানিকটা গলাধঃকরণ করিয়া একটু উৎসাহের সঙ্গে বলিলাম—"এটা বোধ হয় আপনারও মন্দ লাগল না, তবে কি তাঁর হাতের মতন হয়েছে কতকটা?—তাহলে আমিও খানিকটা আইডিয়া করে নিতে পারি। একটা গল্প করবার মতো কথা তো?"

হিরণ্ময়বাবু হাত থামাইয়া বলিলেন—"পায়েস! দিশী কোন জিনিসের ধার দিয়েই যায় না ছোড়দি—পায়েস বলুন, রাবড়ি বলুন, ক্ষীর বলুন—"

প্রশ্ন করি—"ডালনা, ঘণ্ট, শুক্ত? ওদিকে তরকারির মধ্যে?—"

"ধার মাড়ায় না, বলে, ঠানদিদিদের রান্না ও-সব!"

"তাহলে তো এক কাজ করতে পারেন, যত দিন এখানে আছেন, ঠাকুরকে ঐ সবই রাঁধতে বলুন না—মানে, কোন রকমে পেটটা না ভরালে—"

"তাও কি রোজ রোচে মুখে মশাই? তবে আর বলছি কি?—এমন বদ অভ্যেস করে দিয়েছে ছোড়দি ঐসব খাইয়ে খাইয়ে—"

হাসি চাপিয়া রাখা শক্ত হইয়া পড়ে, বলি—"আপনার দেখছি তাহলে সমস্যা দাঁড়িয়ে গেছে ভীষণ—মেয়েরা সেই যে বলে—এক দিকে আঁস্তাকুড়, এক দিকে বড়ঠাকুর, তাই।—এ অবস্থায় ছোড়দিকে সঙ্গে আনলেই ভালো করতেন—এখনও লিখে দিলে তিনি আসেন না?"

৩

দিন-চারেক পরের কথা।

নিজের বাসাতেই বারান্দায় বসিয়া রেডিয়োতে একটা গান শুনিতেছি, জানালার মধ্যে দিয়া বাহিরে নজর পড়িতে দেখি, খানিকটা দূরে হিরণ্ময়বাবু হন্-হন্ করিয়া চলিয়া আসিতেছেন। লুকাইয়া ফল নাই, মনে মনে একটু বিরক্তই হইলাম, ওঁর আসার জন্য নয়, ছোড়দি আসিয়া পড়িবেন বলিয়া। বেশ আমেজময় আতপ্ত সকালটি শরৎ কালের, লক্ষ্ণৌয়ের বিশেষ প্রোগ্রামে চমৎকার একটি ঠুংরি ধরিয়াছে, নরম টিউনে রেডিয়োটি বাঁধিয়া সুরের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছি, হয়তো সেই মারাত্মক মৃদু হাসির সঙ্গে এখনই মন্তব্য হইবে—ঠুংরি শুনিতে হয় তো ছোড়দির গলায়, আর সবই বাতিল! তাহার পর সেই মন্তব্যের বিশ্লেষণ আরম্ভ হইবে—ছোড়দির গলার কর্তব, গমক, চড়ায় কোথায় গিয়া ঠেকে, খাদে কত নিচু পর্দা পর্যন্ত নামিয়া আসে। তাহার পর আসিবে উদাহরণ, ছোড়দির যখন কম বয়স, বিবাহ হয় নাই, কোথা থেকে কাহারা কবে দেখিতে আসিয়াছিল, কোন্ বারে

কি গান গাহিতেছিল ছোড়দি, কি তাহার পরিণাম হইয়াছিল। কাহার বাসরে কি গান গাহিয়া, কি অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল। কবে পথ চলিতে চলিতে ওস্তাদ কোন্ খাঁ ছোড়দির গলা শুনিয়া নিজে হইতে বৈঠকখানায় উঠিয়া আসিয়া কি মন্তব্য করিয়া গিয়াছিল—অসহায়ভাবে বসিয়া বসিয়া শুনিয়া যাইতে হইবে। কয়েকবারই এই রকম হইয়া গেছে, আজ প্রোগ্রামটি ভালো, কাগজে দেখিলাম কয়েক জায়গা থেকে নামকরা গাইয়ে-বাজিয়ের সমাবেশ হইয়াছে, ছোড়দির ভাই আসিয়া এমন আসরটি নষ্ট করিয়া দিবে, ভাবিতেও মনে-মনে ব্যথিত হইয়া উঠিলাম।

চক্ষু বুজিয়া ছিলাম, আসন্ন বিপদের মুখে যতটুকু ভালো করিয়া উপভোগ করিয়া লইতে পারি, এমন সময় বাগানের কাঁকরের রাস্তার ওপর জুতার শব্দ জাগিয়া উঠিল। চক্ষু খুলিয়া কাছে থেকে হিরণ্ময়বাবুর চেহারা দেখিয়া বেশ একটু বিস্মিতই হইয়া উঠিলাম—চুলগুলো উস্কখুস্ক, মুখে গভীর উদ্বেগের ভাব, জামা-কাপড়েও সে অভ্যাসগত পারিপাট্য নাই, গতিও খুব ত্রস্ত—উঠিয়া আগাইয়া গিয়া বলিলাম—"আসুন হিরণ্ময়বাবু! অসময়ে যে? একটু যেন ব্যস্তও দেখছি! কোন রকম-- ?"

হিরণ্ময়বাবু কোন উত্তর না দিয়া গম্ভীরভাবে সামনের চেয়ারটাতে বসিয়া পড়িলেন, বুকপকেট থেকে খান পাঁচেক খাম-পোস্টকার্ড বাহির করিয়া একখানি খাম আমার হাতে দিয়া বলিলেন- "পড়ুন!" তাহার পর বিরক্তিভরেই মুখটা ঘুরাইয়া লইলেন।

বেশ একটু বিমূঢ় ভাবেই চিঠিটা খুলিয়া পড়িতে গিয়াই, আবার একটু জিভ কামড়াইয়া তাড়াতাড়ি মুড়িয়া ফেরত দিলাম, অন্যমনস্কতায় স্ত্রীর চিঠিটা দিয়া দিয়াছেন!

হিরণ্ময়বাবু চিঠিটা খুলিয়া দেখিয়া লইয়া একটুও অপ্রতিভ না হইয়া আবার পকেটে রাখিয়া দিলেন, একটু ভালো করিয়া চোখ বুলাইয়া অন্য একখানি খাম আমার হাতে দিয়া আবার মুখটা ঘুরাইয়া লইলেন। কয়েক লাইন পড়িয়া এটাও মুড়িয়া ফেরত দিবার জন্য হাতটা বাড়াইয়া বলিলাম -"এবারেও ভুল করেছেন হিরণ্ময়বাবু, বাড়ির চিঠি এটা।"

হিরণ্ময়বাবু ঘুরিয়া দেখিয়া লইয়া বলিলেন--"না, ঠিক আছে, পড়ুন না।"

সঙ্গে সঙ্গেই হাতটা বাড়াইয়া বলিলেন--"বেশ, দিন।" তাহার চিঠিটা পকেটে রাখিয়া দিয়া বলিলেন "বড়দির চিঠি মশাই, তিনি আসছেন, পরশু সকালের এক্‌সপ্রেসে!"

মুখটা খুব বেশি রকম অপ্রসন্ন।

ওদিকে আসিবার কারণও জানি না, এদিকে অপ্রসন্নতার কারণও জানি না, এ অবস্থায় কি মন্তব্য করিব ভাবিতেছি, হিরণ্ময়বাবু নিজেই যেন ফাটিয়া পড়িলেন—"একবার আক্কেলটা দেখুন মশাই! যেমন ভ্যাজাল এ্যাভয়েড করতে চাই, তেমনি ঘাড়ে এসে পড়ে। আমি চাইছি পূজোর একটা মাস নিরিবিলিতে কাটিয়ে ফিরে যাব, চিঠি এসে হাজির বড়দি আসছেন--পরশুই- পরশু সকালেই, একটা চিঠি লিখে যে বারণ করব তার উপায়টি নেই!"

'ভ্যাজাল'-এর কথাতেই প্রশ্ন করিলাম--"বেশি দলবল নিয়ে আসছেন নাকি?"

"না, আসছেন তো একলাই, মেজ ছেলেটিকে সঙ্গে করে, কিন্তু মেয়েছেলে যে মশাই, বুঝছেন না? একাই একশ'। কি করা যায় বলুন দিকিন? আমার তো মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে মশাই, আমি কোথায় এলাম দু'টো দিন নিশ্চিন্দি হয়ে একটু ঘুরে-ফিরে বেড়াব, বড়দি এসে হাজির! অত্যাচার নয়? বলনু না! আমার তো এক-এক বার মনে হচ্ছে তালাবন্ধ করে সরে পড়ি, উঠুন কোথায় এসে উঠবেন! শেষে মনে হোল শৈলেনবাবুর পরামর্শ নেওয়া যাক্ না হয়।"

আমি কি পরামর্শ দিব ? আমার মাথাও ঘুলিয়া যাইতেছে। বড়দির আসায় এত বেশি আপত্তির কারণ কি থাকিতে পারে ? ব্যক্তিগত মনোমালিন্য কি ঐ রকম পারিবারিক কোন কারণ থাকিলে সে-বিষয়ে প্রশ্ন করিতেও বাধে। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয়, ছোড়দিই হিরণ্ময়বাবুর সব চিন্তা, সব আলাপ-আলোচনা এমন ভাবে জুড়িয়া বসিয়া থাকেন যে বড়দির উল্লেখও এই প্রথম তাঁর মুখে—তিনি কি, কোথায় থাকেন, ছোড়দির বড়দি হিসাবে তিনিও রন্ধন থেকে আরম্ভ করিয়া ছড়া-কাটা পর্যন্ত সকল বিষয়ে ছোটখাটো একজন সব্যসাচী কিনা এ সব বিষয়ে কিছুই জানা নাই। কতকটা চিন্তার সময় লইবার জন্য এবং কতকটা তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্যও প্রশ্ন করিলাম—"ক'দিনের জন্য আসছেন আপনার বড়দি ?—লিখেছেন তা কিছু ?"

"পরশু মঙ্গলবার কি একটা যোগ না কি রয়েছে—লিখেছেন তুই যখন রয়েছিস ওখানে, একবার ছুটে গিয়ে বৈদ্যন'থের মাথায় জল ঢেলে আসি। বাঙালী ঘরের বিধবা, বুঝছেন না, পরকাল পরকাল করেই সারা, মানুষ ইহকালেও যে একটু নিরিবিলিতে থাকতে চায় দু'দিন, সেদিকে খেয়াল থাকতে পারে কখনও ? তাই না হয় এলেন, একটা কি দু'টো দিন চোখ কান বুজে কাটিয়ে দিলাম, কিন্তু ভেবেছেন সঙ্গে সঙ্গে যাবেন চলে ? অন্তত হপ্তাখানেক যদি বাসা আর মন্দির, মন্দির আর বাসা না করে কাটান্ তো কি বলেছি আপনাকে !—সাধ করে কি বলছি যে মাথা গুলিয়ে দিয়েছে ?"

পরিচয় এবং উদ্দেশ্যটা জানা গেল খানিকটা, কিন্তু তাহাতে ভদ্রমহিলার প্রতিই সহানুভূতিটা বাড়িল মাত্র। সেটা কিন্তু বাহিরে প্রকাশ না করিয়া একটু ঘুরাইযাই বলিলাম—"যেমন বলছেন তাতে খুব বেশি ক্ষতি হবে কি হিরণ্ময়বাবু ?—আপনি আপনার ঘোরাফেরা নিয়ে থাকবেন, উনি ওঁর মন্দির নিযে থাকবেন।—আর যেমন ভয় করছেন, অত দিন নাও থাকতে পারেন—ছেলেটি আসছে, তার কলেজ বা স্কুল আছে নিশ্চয়—"

হিরণ্ময়বাবু যেন আমার ওপরও কতকটা নিরাশ হইয়া মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—"আপনি জানেন না বড়দিকে মশাই, তাই বলছেন ও-কথা—এর ওপর যদি আবার মাথায় সেঁদিয়ে যায় যে এই দশ-বারো দিন এসেও আমার শরীর তেমন সারে নি তো আর নড়তে চাইবেন ভেবেছেন নাকি ?—গ্যাঁট হযে বসে যাবেন—মণ্টুকে বাড়ি পাঠিয়ে দিযে। তার পর হবে রান্নার পর্ব শুরু—বাবা বৈদ্যনাথ পর্যন্ত কোথায় যে তলিযে যাবেন পাত্তাই পাওযা যাবে না !"

বর্ধিত বিস্ময়ের ভাবটা চাপিয়া আবার একটু ঘুরাইযাই বলিলাম—"হ্যাঁ, সে এক বিপদের কথা বটে, যে-মেয়েদের হাতে রান্না তেমন ভালো নয, অথচ যাঁদের স্নেহের উপরোধও ঠেলতে পারা যায না—"

হিরণ্ময়বাবু বাধা দিয়া বলিযা উঠিলেন—"রান্না ভালো না হলে তো পরিত্রাণ ছিল মশাই, বদ রান্না হবে আর ওষুধ গেলা করে উপরোধে পড়ে আমায খেতে হবে, সে খাতির আমি রাখি না। কিন্তু রান্নার দোষ দিযে বড়দির হাতের তোয়ের জিনিস ঠেলে রাখবে এমন সাদ্যি কারুর দেখলাম না। বাড়িতে বড়দির পরেই রাঁধেন সেজ খুড়িমা, সেখানেও কিন্তু আকাশ-পাতাল তফাৎ। অবশ্য বিধবা হয়ে পর্যন্ত মাংস ছোঁন্ না, তেমনি ঠাকুর রয়েছে—সেদিক্ দিযে বাঁচোয়া নেই মশাই—সাধ করে কি ছুটে এসেছি আপনার কাছে ?"

আরও বিস্ময়-বিমূঢ় হইযা পড়িয়াছি। ভদ্রমহিলা ধার্মিকা, অত নিবিড় ভাবে

ভ্রাতৃবৎসলা। হিরণ্ময়বাবুর খাওয়ার সখ, সেদিক্ দিয়াও এমন দক্ষ যে অমন সে তালেবর ছোড়দি তিনি এক কথাতেই গেলেন উড়িয়া। বাকি থাকে এখানে থাকার কথা—দুই দিনের জন্য তীর্থভ্রমণে আসিতেছেন দিনসাতেক থাকিয়া যাইতে পারেন, এমন কি শেষ পর্যন্ত,—কিন্তু সে তো বিপদ না হইয়া সম্পদই, এমন স্নেহপরায়ণা জ্যেষ্ঠাকে তো মাথায় করিয়া রাখা যায়—

চিন্তার মধ্যেই আর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। হিরণ্ময়বাবুর বাসায় রেডিয়ো আছে, ওটা আবার অনেকের কর্ণশূল, সেখানে ভাই-বোনের মধ্যে মতদ্বৈধ থাকিবার কথা। প্রসঙ্গটা আবার ঘুরাইযাই উত্থাপন করিলাম, বলিলাম—"তবে হ্যাঁ, আপনার রেডিয়োটি বোধ হয় বন্ধ রাখতে হবে এ ক'টা দিন—অন্তত যতক্ষণ তিনি বাড়িতে থাকেন—"

"রেডিয়ো বন্ধ থাকবে কি মশাই!"—হিরণ্ময়বাবু যেন স্তম্ভিত হইয়া উঠিলেন—"এখানে রেডিয়ো না থাকলে সঙ্গে করে আনতেন। একটা দিন প্রোগ্রাম না শুনলে মাথা ধরে বড়দির, বিশেষ করে গানের প্রোগ্রাম।—বাবা ওস্তাদ রাখিয়ে গান শিখিয়েছিলেন—ওস্তাদ সমীম খাঁ, নাম শুনে থাকতে পারেন, ছেলেবেলায় কত কমপিটিশ্যানে যে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছেন।—রেডিয়ো না থাকলে আসতেন ভেবেছেন নাকি?"

মাথাটা আরও গুলাইয়া আসিয়াছে, এমন কি কোনও দিকে পথ না দেখিয়া ভিতরে ভিতরে একটু উত্যক্তও হইয়া উঠিয়াছি। তবু হাসিয়াই বলিলাম—"তাহলে তাঁর আসায় আপত্তিটা কি হিরণ্ময়বাবু? আমার তো মনে হয়, তিনি না থাকতে চাইলেও বরং একটু জিদ করা উচিত থাকবার জন্যে। সত্যিই আপনার শরীরটা তেমন সারছে না, দেখছি তো ঠিক আপনাদের বাড়ীর স্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী পারছে না রাঁধতে ঠাকুরটা—"

হিরণ্ময়বাবু কিন্তু মনের বিরক্তিটা চাপিতে পারিলেন না, তবে সোজাসুজি না প্রকাশ করিয়া একটু কাতর ভাবে বলিলেন—"কিন্তু ভ্যাজাল যে পছন্দ করি না মশাই, আসল কথাটা আপনি মিস্ করে যাচ্ছেন, আমি এলাম—পূজোর ছুটিটা রয়েছে, নিরিবিলিতে একটা মাস দেওঘরে না হয় কাটিয়ে আসি, চিঠি এসে হাজির বড়দি আসছেন!—"

তবুও হাল ছাড়িলাম না, বলিলাম—"হ্যাঁ, সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে একটু ইয়ে বটে—তা, তেমনি আপনার ভাগনে আসছে, ওঁর ওদিকটা সেই সামলাতে পারবে—"

"সেও তো একটা ভ্যাজালই। হয়তো ছোট মেয়েটাকেও স[illegible] আনবেন, অথচ আমি চাই একেবারে নিরিবিলি—"

হার মানিয়াও করিলাম চেষ্টা একটু, বলিলাম—"একটু ভাবনার কথা বৈ কি। টেলিগ্রাম করে দিলে হোত ভালো, কিন্তু তার তো আর সময় নেই, একস্‌প্রেস টেলিগ্রামও চার দিনের কমে পৌঁছুচ্ছে না আজকাল—আসতেই দিন না হয়, তার পর—"

এ সমস্যার চেয়ে ছোড়দি ঢের সহনীয়, অন্তত: অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ওদিককার কথা শেষ না করিয়াই বলিলাম—"হ্যাঁ, ভুলেই যাচ্ছিলাম, আজ লক্ষ্ণৌ রেডিয়োতে একটা স্পেশ্যাল প্রোগ্রাম ছিল—এই শেষ হোল একটু আগে, ধরেছিলেন নাকি?"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হিরণ্ময়বাবুর মনটা বড়দির থেকে ছোড়দিতে আসিয়া পড়িল, মুখের বিরক্তির ভাবটা ব্যঙ্গে পরিবর্তিত হইয়া উঠিল, বলিলেন—"ঐ প্রোগ্রামেরই গান ছিল এটা, না? অন্যমনস্ক ছিলাম, ভালো করে কানে যায় নি—"

"হাঁ, একটা ঠুংরি।"

"আমি এস্রাজে আশাবরী গৎ শুনছিলাম, রাবিশ!—ভাবছি ছোড়দিও বোধ হয়

সেখানে এ্যাটেণ্ড করছে, বোধ হয় হেসে সারা হচ্ছে মনে মনে এতক্ষণ—এমন সময় ডাকপিয়ন এসে হাজির !—ছোড়দির এস্রাজে বাজানোর একটা ইন্‌সিডেণ্ট তাহলে বলতে হোল আপনাকে—"

৪

সেইদিনকারই কথা—

একসঙ্গেই বেড়াইতে যাই। বৈকালে ওঁর বাসার দিকে যাইতেছি, দেখি হিরণ্ময়বাবু হন্‌-হন্‌ করিয়া এই দিকে আসিতেছেন। মুখটা দীপ্ত, দূর থেকেই একটু হাসিয়া বলিলেন—"ফাঁড়াটা কেটে গেল মশাই ! এই—"

হাতে একটা টেলিগ্রাম ছিল, তুলিয়া ধরিলেন।

মনটা খুবই তিক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু জীবনে অনেক বকমাবি 'চরিত্র'ই সহ্য করা অভ্যাস আছে, মনের ভাবটা মুখে না প্রকাশ করিয়া প্রশ্ন করিলাম—"ব্যাপার কি মশাই ?"

"এলেন না, বাবা বৈদ্যনাথ ভক্তের চেয়ে অভক্তের কথাই বেশী শুনলেন, এই দেখুন না টেলিগ্রাম—ক্যান্‌সেল্ড লেটার ফলোজ—ভাবলাম শৈলেনবাবুকে দিয়ে আসি খবরটা। দেখি, চিঠিতে না আসবার কারণটা কি লেখেন।"

খুবই প্রফুল্ল। যাইবার সময় একবার বাসায় ঢুকিয়া ঠাকুরকে বলিয়া আসিলেন আমার রাত্রির আহার ঐখানেই হইবে। বেড়াইয়া আসিয়া রেডিয়ো শোনার পর আহারে বসিযা দেখিলাম আয়োজনেরও বিশেষ ব্যবস্থার কথা বলিযা গিয়াছিলেন। সব চেয়ে বিস্ময়ের কথা, সব পদগুলাই ছোড়দির বৈশিষ্ট্যসূচক হইলেও এবং হিরণ্ময়বাবুর মতে কোনটাই ছোড়দির হাতের রান্নার ধার দিয়া না গেলেও বেশ পরিতোষ সহকারেই আহার কবিলেন। মনটা সত্যই খুব প্রফুল্ল। মামুলি ফাঁড়া নয়, যেন পুনর্জন্ম একেবারে।

কিন্তু তিন দিন পরে আবার যা দেখিলাম তাহার কাছে এ প্রফুল্লদা কিছুই নয়। আমার বিস্ময়েরও সেই দিন ছিল চূড়ান্ত। শুধু সেটা স্থায়ী হইতে পারিল না, কেননা একটি ছোট্ট কথাতে এত বড রহস্যটা মুহূর্তেই যেন হাওয়ায় মিলিযা গেল, যে ব্যাপাবটাকে এত অস্বাভাবিক বোধ হইতেছিল, দেখিলাম, মানব-ইতিহাসের আদি থেকে আজ পর্যন্ত তাহার মতো স্বাভাবিক কিছু তো সৃষ্টই হয নাই।

এই নূতন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইযাছে, তিনি আসিয়া আমায অন্য দিকে বেড়াইতে লইয়া গেলেন। ক্লান্ত হইযাই ফিরিলাম, কিন্তু রেডিয়োটা বিগডাইয়া গেছে, রাত্রের খবরটা শুনিবার জন্য একবার হিরণ্ময়বাবুর বাসা থেকে ঘুরিয়া আসাই ঠিক করিলাম। উপস্থিত হইয়া দেখি বাসা একেবারে তোলপাড। একরাশ টেবিল-চেয়াব বাবান্দায জডো করা, একটা বলদের গাড়িতে দু'টো কৌচ, খানতিনেক নেয়ারের খাট, একটা খালি গাড়িও আছে পাশে দাঁড়াইয়া। ওদিকে জনতিনেক কুলি বারান্দায হুড়াহুড়ি করিতেছে—খাট, চেয়ার, টেবিল, সেটি লইয়া। ঘরের মধ্যেও আসবাবপত্র নাড়াচাড়া গোছগাছ করাব শব্দ। সবার উপর হিরণ্ময়বাবুর গলা—ঘরের মধ্যেই—হুকুম করিতেছেন, ধমকাইতেছেন, নিজেও ছুটাছুটি টানাটানি করিতেছেন। গেটের মধ্যে পা দিয়াই একচোট থমকিয়া দাঁড়াইলাম, এমন কি হিরণ্ময়বাবুর গলা সত্ত্বেও মনে হইল ভুল-বাড়িতে ঢুকিয়া পড়ি নাই তো ! তাহার পর একটু এদিক্-ওদিক্ দেখিয়া লইয়া সোজা বৈঠকখানায় গিযা উঠিলাম।

চেনা শক্ত হিরণ্ময়বাবুকে, কাপড়টা মালকোঁচা মারিয়া পরা, গায়ে একটা গেঞ্জি, কাঁধে তোয়ালে, সবগুলাতেই কালিঝুলি পড়িয়া ময়লা হইয়া গেছে, মাথার চুল অবিন্যস্ত। আমায় দেখিয়াই অত্যধিক আনন্দে ধমক দিয়া উঠিলেন—"এই যে, কোথায় ছিলেন মশাই ? নিজে একবার গেছি, তার পর তিন-তিনবার লোক পাঠিয়েছি—বাবু নেহি আয়া হ্যায়—বাবু নেহি আয়া হ্যায়—বাবু নেহি আয়া হ্যায়—এত রাগ ধরছিল আপনার ওপর !"

বিমূঢ়ভাবে একবার চারিধারে চাহিয়া লইয়া প্রশ্ন করিলাম—"ব্যাপারখানা কি বলুন তো,—কার্পেটে—ফার্নিচারে—ছবিতে একেবারে যে চেনাই যায় না ঘরটাকে !—হঠাৎ—"

"ছোড়দি আসছে যে মশাই ! বিকেলের এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম—কাল সকালেই আসছে, একলা নয় ছোড়দি, রমেন আমার ভায়রা-ভাই, ওদের বড় মেয়ে সুনু, মেজ মেয়ে লিলি, সেজ রমা, দুটি ছেলে বাঁবু আর হাঁবু চিঠি দিলেই পারতো তো ?—এ ঠিক ছোড়দির দুষ্টুমি—আমায় একেবারে সারপ্রাইজ করে দেওয়া—ও যে বিনা নোটিশেই হুড়মুড় করে এসে পড়ে নি এই আমার বাবার ভাগ্যি—তক্ষুণি ছোট্ শহরে—কোথায় ফার্নিচার পাওয়া যায় ভাড়ায়, কোথায় ডেকোরেশনের সরঞ্জাম—এক চুল এদিক-ওদিক হলে রক্ষে রাখবে ছোড়দি মশাই ? অথচ হাতে মাত্র এই রাত্তিরটুকু "

মুখটা রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, কথা বলার মধ্যেই উৎসাহে মাঝে মাঝে হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে মুখে।

প্রয়োজন ছিল না, তবুও বলিলাম "ভায়রা-ভাইয়ের কথা বলছেন, ছোড়দি তাহ'লে আপনার—"

"শালী মশাই, তনিমার বোন ! তনিমা হোল আমার ওয়াইফ, সব চেয়ে ছোট, তার ওপরেই ছোড়দি, তার ওপর—"

আবার, প্রয়োজন না হইলেও ক্ষীণ সন্দেহটুকু মিটাইয়া লইবার জন্যই বাধা দিয়া প্রশ্ন করিলাম "তাহ'লে বড়দি হলেন—"

কিছুমাত্র হাসির কথা নয়, তবুও আজকের অন্তরের আনন্দেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন হিরণ্ময়বাবু, বলিলেন "এই দেখো কাণ্ড !-শৈলেনবাবুর আমাদের বড়দি আর ছোড়দির হিসেব রাখতেই মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে ! সেই যে বলে 'সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাপ'—আপনারও হোল তাই মশাই !—ছোড়দি ওয়াইফের বোন বলে বড়দি মেজদি সবাইকে তাই হোতে হবে ? বড়দি হোল আমার নিজের দিদি—মাত্র তিন বছরের বড়- বড়দি আসছিল কলকাতা থেকে, আর ছোড়দি আসছে এলাহাবাদ থেকে—আমার শ্বশুরবাড়ি—ছুটিতে এসেছিল, আমি দেওঘরে আছি শুনে দলবল নিয়ে ছুটে আসছে—এসেই দু'দিন থেকে বলবে- চললাম—তা ভেবেছেন নাকি দোর ছেড়ে আমি ?"

অনেক বিচিত্র জীব দেখা অভ্যাস আছে জীবনে, মনের ভাবটা চাপিয়া বেশ হাসিমুখেই বলিলাম- "আমাকেই এত বেরসিক ঠাওরালেন ?—ওয়াইফের বোন, তাই কখনও পারে মানুষে ছেড়ে দিতে হাতের মধ্যে পেয়ে ? তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তো নিজের বোনের মতন খেলো করে দেওয়া হোল তাকে, বলুন না—মানুষ তো চার-পেয়ে জন্তু নয় মশাই, তার একটা কাণ্ডজ্ঞান থাকবে না ?- এ কি কথা !—"

বীরুর প্রশ্ন

বীরু আসিয়া উপস্থিত হইল।

চুল উস্কখুস্ক, মুখ আর বস্ত্রের দিকে চাহিয়া মনে হয় বহুদিনই ধোপা-নাপিতের সঙ্গে উহার সাক্ষাৎ নাই। পা-ও খালি। ফিটফাট কোন কালেই থাকে না, তবুও আজ যেন অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম—"এ কি, কেউ মারা গেছে নাকি ?"

প্রশ্নটা মুখ দিয়া বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পারিলাম। ভুল হইয়া গিযাছে,—শোকের বেশ নয়, গায়ে জামা রহিয়াছে। বীরু উত্তর করিল—"কেউ বেঁচে নেই।"

ওর উত্তর এই রকম হেঁয়ালি গোছেরই হয। কোন পারিবারিক বিযোগ নয বলিযা কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া হেঁযালির অন্তর্নিহিত অর্থটা বাহির করিবার চেষ্টা কবিলাম একটু। মাথায় আসিল না। বলিলাম, "অনেকদিন পরেই এসেছিস। আমি তোর বাসাতেও গিয়েছিলাম। একবার তো কোন খবরই যোগাড় করতে পারলাম না। দ্বিতীযবার গিযে শুনলাম ও বাসায় আর নেই তুই, কোথায উঠে গেছিস। তা কোথায গেছিস ?"

"চৌরঙ্গী অঞ্চলে।"

আবার হেঁয়ালি। বিস্মিত হইযা প্রশ্ন করিলাম—"চৌরঙ্গী অঞ্চলে !'

বীরু উত্তর করিল—"কতকগুলো সঙ্গী পেয়ে গেলাম, একসঙ্গে আছি। একটা সিগাবেট দে দিকিন, আর এক গ্লাস জল।"

বলিলাম—"কিছু খাবি ? তোর মুখটা বড যেন শুকনো বোধ হচ্ছে।"

বীরু এক ধরণের কাষ্ঠহাসি হাসিযা বলিল—"এবার তুই হাসালি। মুখ শুকনো বলেই খেতে হবে ! বাঙালি মরতে বসলেও যে তার খাবার দরকার হচ্ছে না। আমায কি মনে করলি তুই ?"

উত্তর যাহা দিলাম সেটা আক্রোশের বশে দিলাম কতকটা। আমি বিদ্যাটাকে বুদ্ধিব বলে খাটাইযা তেতলায় গদি আঁটা কৌচে বসিয়া পাঁচতলার স্বপ্ন দেখিতেছি, আব আমাব চেযে বেশি বিদ্যা থাকা সত্ত্বেও ও বুদ্ধির অভাবে—অর্থাৎ দেশ-দেশ ও জাতি-জাতি কবিযা আজ এই দশায় উপস্থিত। অবশ্য আক্রোশের কারণ এ নয়, কারণটা এই যে এত নিচে থাকিয়াও ও একেবারেই কিছু না বলিযাও আমায যেন নিজের অনেক নিচে করিযা রাখিয়াছে। কথাটা সত্য করিয়া বলিতে গেলে ও করে নাই, আমি কেমন করিযা নিজে থেকেই হইযা গিয়াছি, কিন্তু—

যাক, উত্তর যাহা দিলাম তাহাই বলি। সিগারেট একটা হাতে দিযা জল গডাইতে গড়াইতে বলিলাম—"তোকে এ গরীবের বাডিতে খেতে বলাই ভুল হযেছে, চৌরঙ্গীব হাওযা খাচ্ছিস আজকাল তুই !"

কথাটা এখনও বুকে যেন রক্তের দাগে বসিয়া আছে।

বীরু সিগারেটটা ধরাইয়া হেলিযা পডিয়া টানিতে টানিতে বলিল—"শুধু খাওযাই নয, তোদের পাড়াতেও আসা চলবে না আমার আর। একটা চেঞ্জ হিসেবে আসতাম, তা—"

জল গডাইতে গড়াইতে ঘুরিয়া প্রশ্ন করিলাম—"অপরাধ ?"

বীরুর চেহারাটি মুহূর্তেই যেন কি রকম হইয়া গেল। হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া উগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"অপরাধ অনেক। এখানে আর ভদ্রলোকের পা মাড়াবার জো নেই। এই গলিতে সাতষট্টিটি বাড়ি পার হয়ে এলাম তোদের এই বাড়িতে, তা এক এক করে গুনে দেখলাম প্রত্যেক বাড়ির দোরগোড়ায় দু'টি-তিনটি, দু'টি-তিনটি করে দাঁড়িয়ে, দু'বছরের থেকে সত্তর বছরের পর্যন্ত, কারুর কোলে ছ'মাসের শিশু—দেখলে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে—হাতে এক-একটা করে মাটির বাসন—বড জোর একটা লোহার শানকি—মুখে এক বুলি—'মা একটু ফেন দাও মা!'—বোঝ, একটা মানুষকে এক থেকে সাতষট্টি পর্যন্ত প্রত্যেক বাড়ির দোরগোড়ায় এই এক হাভাতের বুলি শুনতে শুনতে আসতে হয় তো তার মেজাজের অবস্থা কি রকম হয়? বর্ধমান ডুবেছে কি মেদিনীপুর ডুবেছে, কি নদে-খুলনায় ধান নেই তো তোরা সেইখানেই মরগে যা না,—যেন ভদ্দরলোকের পাড়াটাকে একেবারে বস্তিরও অধম করে তুলেছে!—আগে যখন আসতাম তোদের এই গলি—রেডিয়োতে রেডিয়োতে কান ঝালাপালা হোত—ঠিক এই রকম একঘেয়ে, তা যতই কিন্তু মারাত্মক হোক, সে একটা ভদ্র ব্যাপার ছিল তো—আর এ যে—"

আশ্চর্য যে না হইতেছিলাম এমন নয়, তবে সেই সঙ্গে আশ্বস্ত হইলাম। এইবার বাঁচিয়া যাইবে বীরু। চৌরঙ্গী অঞ্চলে উঠিয়াছে, ভাঙিয়া না বলুক, সঙ্গীদের মধ্যে 'কাপ্তেন' গোছের নিশ্চয় কেউ আছে। আর এই বস্তি-বিদ্বেষ, এই ফেন-প্রার্থিনীদের উপর আক্রোশ—প্রতিক্রিয়া শুরু হইয়াছে, বীরু বাঁচিয়া যাইবে।

চৌরঙ্গী অঞ্চলে গিয়াও কিন্তু চেহারার অবস্থা এমন কেন? কতদিন হইল গিয়াছে?—যাই হোক সমস্যা লইয়া আর মাথা ঘামাইবার দরকার দেখিলাম না। কৌচের হাতলে একটা সিগারেট ঠুকিতে ঠুকিতে বলিলাম—"এইবার তোর সেই বিদকুটে বাইগুলো ছাড।—আর কি—বয়েস হয়ে এল, এখন নিজের কথাও একটু ভাবতে হবে তো—না, সেবাধর্ম ভালো, নিন্দে করছি না, তবে নিজেকে বাঁচিয়ে—"

বীরু অন্যমনস্ক ভাবে শুনিতেছিল, হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিল—"নিজেকে বাঁচিয়ে কিছু দিতে পারবি?"

সামান্য একটু চিন্তা করিলাম। মনে মনে হাসিয়া নিজের মনেই বলিলাম, রোগ একদিনে যায় না, চৌরঙ্গীতে বাড়ি লইয়াও আর্তত্রাণ, সেবা, চাঁদা তোলা! উঠিয়া বলিলাম—"দাঁড়া দেখি, কি পারি স্পেয়ার করতে।"

দেরাজ খুলিয়া ওকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া মনিব্যাগটা হাতে করিয়া খুব খানিকটা হিসাব করিলাম, তাহার পর একটা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া লইলাম। দেরাজটা বন্ধ করিয়া ওকে নোটটা দিয়া বলিলাম, "কতকগুলো খরচ আছে, ফার্নিচারের একটা মোটা বিল পেমেণ্ট করতে হবে। আপাতত এই কোন রকমে পারলাম।"

বারান্দার ওদিককার ঘরে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। বলিলাম, "বোস, একটু দেখে আসি কে।"

কি মনে হইল, সেকেণ্ড কয়েক বাদ, একটি মিথ্যা জুড়িয়া দিলাম—"হয়তো ফার্নিচারের বিলটার জন্যে, বড্ড তাগাদা লাগিয়েছে বেটারা।"

এ. ঘোষের ওখানে টি-পার্টিতে ডাকিতেছে। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম বীরু নাই। কাঁচের টপ দেওয়া ছোট টেবিলের উপর অ্যাশ-ট্রে চাপা দেওয়া দশ টাকার নোটটার সঙ্গে একটা ছোট কাগজের টুকরায় পেন্সিলে লেখা—"আগে ফার্নিচারের বিলটা শোধ দিয়ে দিস।"

দুইটা দিন চৌরঙ্গীর এমুড়ো ওমুড়ো সাধ্যমত অনুসন্ধান করিলাম—গ্র্যাণ্ড হোটেল পর্যন্ত বাদ দিলাম না। তৃতীয় দিন বীরুর দেখা পাইলাম নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে, কার্জন পার্কের উল্টা দিকে, যেখান থেকে বেহালা, মেটিয়াবুরুজ ঐসব জায়গার বাস ছাড়ে। বুকে দুইটা হাত জড়াইয়া এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে হোয়াইটঅ্যাওয়ের দোকানটির পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চারিদিকে দশ-বারোটি কঙ্কালসার জীব—মানুষ বলা চলে না তাদের, কেহ ভিক্ষা চাহিতেছে, কেহ নির্জীবভাবে পড়িয়া, কেহ হাতের পাত্র থেকে বাছিয়া বাছিয়া কি ভক্ষণ করিতেছে। দু'একটি শিশু আমসির মত স্তন হইতে সান্ত্বনা আহরণের চেষ্টা করিতেছে।—মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে বীরু। আজ গায়ে জামাটা পর্যন্ত নাই। ওর কাছে কেহ ভিক্ষা চাহিতেছে না, বেশ বোঝা যায় সর্বস্ব দিয়া ও এখন ওদেরই একজন। একটু কুণ্ঠা যে না হইল এমন নয়, তাহার পর কাছে গিয়া ডাকিলাম—"বীরু!"

বীরু ধীরে ধীরে মুখটা ঘুরাইয়া আমার পানে চাহিল। দৃষ্টিটা শান্ত কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত। চাহিয়া রহিল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না। আরও কাছে সরিয়া গেলাম, প্রশ্ন করিলাম, "এ কি ব্যাপার? তুই এখানে?"

বীরু প্রতিপ্রশ্ন করিল—"চৌরঙ্গী নয় এটা?"

বলিলাম—"বাড়ি চল, পাগলামি করে না।"

বীরু নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাগ দেখাইতে হইল, বলিলাম—"এই তোর সেবা হচ্ছে? তুই নিজে ওদের সামিল হয়ে গেলে কি করে সেবা করবি? আজ ক'দিন ধরে আছিস এখানে তুই? তোর পাগলামির কি একটা সীমা থাকতে নেই? বাড়ি চল, আর আমিও তোর সঙ্গে কাজে নামছি, দেখি কতটা কি করতে পারি। লোকেদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে—"

বীরুর দৃষ্টিটা আরও উগ্র হইয়া উঠিল, বলিল,—"লোক সব মরেছে।—সব মরেছে একধার থেকে—সামনে হাত পেতে দাঁড়াবার যুগ্যি আর নেই লোক—তুই ঘুরবি বলছিস—আমি ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে..."

আমায় কয়েকজন ঘিরিয়া ফেলিয়াছে—"একটি পয়সা দাও, দু'দিন থেকে কিছু খাইনি বাবু, দেখ ছেলেটার পানে চেয়ে, একটা গেছে—নড়ে আর চাইতে পারি না বাবু—"

একটু দূরে একটা দশ-বারো বছরের মেয়ের উপর দৃষ্টি পড়িল, একখানি কৃষ্ণ-কঙ্কাল। কাহারও অপেক্ষা তাহার অভাবটা কম নয়—কিন্তু পূর্ণ উলঙ্গতার এত কাছাকাছি যে, সামনে আসিয়া হাত পাতিতে পারিতেছে না।

হঠাৎ একটা কর্কশ চীৎকারে ফিরিয়া চাহিলাম, বীরুর গলা। কোটরগত চোখ দুইটি যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, শীর্ণ হাতটি বাড়াইয়া চেঁচাইতেছে—"সর, সরে যা সব, নৈলে এবার আমি খুন করব!—তোদের জ্বালায় লোক ফার্নিচার কিনে তার বিল শোধ করতে পারবে না?—সর্‌ সর্‌ সরে যা সব—আমি আর সামলাতে পারব না নিজেকে বলে দিচ্ছি—সর্‌!"

আসিয়াই এক এক করিয়া চেয়ার টেবিল সব বিক্রয় করিয়া দিলাম। টাকা হাতে ছিল, কিন্তু মনে হইল সে টাকা বীরুকে বাঁচাইবার জন্য যথেষ্ট নয়। একবার মনে হইল টাকা লইয়াই যাই, কিন্তু কেমন যেন সন্দেহ হইল তাহাতে ওকে ফেরানো যাইবে না। চোরাবাজার হইতে দুই বোরা চাল, দুই বোরা ডাল সংগ্রহ করিয়া একটা ঠেলাগাড়ি ভাড়া করিয়া চৌরঙ্গীর দিকে যাত্রা করিলাম, বীরু আসে ভাল, নয়তো ইচ্ছামত সেখানে যদি

সে সেবাকেন্দ্র খুলিতে চায় খুলুক।

বিক্রয় আর খরিদে সমস্ত দিনটা গিয়াছে, কাগজ পড়িবার ফুরসুত পাই নাই। চৌরঙ্গীর মোড়ে আসিতেই একটা ছোঁড়া একতাড়া কাগজ হাতে করিয়া সামনে দাঁড়াইল—"অ্যালাইজরা ইটালীতে নামল বাবু—"

একটা কাগজ কিনিলাম। প্রথমেই চক্ষু গিয়া পড়িল—কলিকাতার মৃত্যুসংখ্যা স্তম্ভের উপর। দৃষ্টিটা সেইখানে আটকাইয়া গেল। —কোন হাসপাতালে কতজন অনাহার-রুগ্ন ভর্তি হইল, কতজন মরিল। কোন রাস্তায় কত মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে তাহার হিসাব দিয়া লেখা আছে—চৌরঙ্গীর সামনে তিন। একজন ভদ্র-সন্তান বলিয়া অনুমিত, বয়স অনুমান সাতাশ বৎসর।...

ঠেলাগাড়ি ফিরাইয়া যখন বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম, কন্যা আসিয়া হাতে একটি খাম দিল, বলিল—"তুমি যখন চাল কিনতে গিয়েছিলে সেই সময় আসে।"

বেয়ারিং খাম। পেন্সিলে ঠিকানা লেখা। হস্তাক্ষর চেনা, তাড়াতাড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। বীরুই লিখিয়া গিয়াছে—

"দুঃখ করিস নি, বোধ হয় তোর প্রতি অন্যায় করে গেলাম। একটা কথা বুঝতে পারলাম না, তাই মহাযাত্রীদের দলে ঢুকে পড়লাম—আমাদের বাঁচবার অধিকার রয়েছে অথচ উচ্ছিষ্ট দানের আশায় দিনানুদিন চেয়ে থাকি কেন?"

একটা কথা মাথায় ক্রমাগতই চক্র দিয়া ঘুরিতে লাগিল—উচ্ছিষ্ট দান—উচ্ছিষ্ট দান—উচ্ছিষ্ট—সমস্ত দেশটায় একমাত্র ওরই এই কথা বলিবার অধিকার ছিল।

চিন্তার মধ্যেই একটা সন্দেহ জাগিল। কিন্তু যাহারা প্রতিদিন এই দান লইয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে তাহারা তো একে উচ্ছিষ্ট বলে না।—নিজের কাছেই উত্তর পাইলাম—"তাহাদের মুখে ভাষা নাই, থাকিলে তাহারাও ঠিক এই কথাই বলিত। যত মানুষ গেল আর যত যাইবে—সবার মনুষ্যত্বের প্রতিভূ হইয়া বীরেশ এই প্রশ্ন রাখিয়া গিয়াছে।"

দুঃশাসন

প্রথম আলাপের ভঙ্গিতেই ভদ্রলোককে একটু খাপছাড়া বলিয়া মনে হইয়াছিল, তারপর মাঝখানে আবার যেন—কিন্তু কাহিনীটাই আগাগোড়া বলিয়াই যাই।

আমার গাড়ির সামনে আসিয়া ভিতরটা একবার দেখিয়া লইয়া পিছন দিকে চাহিয়া হাঁক দিলেন—"ওগো, এইটেতেই এস, একটু ফাঁকা আছে।"

একটি ভদ্রমহিলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, চওড়া লালপেড়ে শাড়ি পরা, সিঁথিতে চওড়া করিয়া সিঁদুর টানা, গায়ে হাতে ভারি ভারি গোটাকতক গয়না, পায়ে স্যাণ্ডেল, ডান হাতে একটা তালপাতার জালি ব্যাগ। দু'জনেরই বেশভূষায় সম্পন্ন গৃহস্থ বলিয়াই মনে হইল, তবে একটু যেন পাড়াগেঁয়ে ভাব আছে, বিশেষ করিয়া মহিলাটির। দুইজনে উঠিয়া আমার বেঞ্চটিতে উপবেশন করিলেন—ভদ্রমহিলা কোণের দিকে একটু জড়োসড়ো হইয়াই।

ভদ্রলোক আলাপ শুরু করিলেন, হাসিয়া একটু নিম্নস্বরে বলিলেন—"দিব্যি গান শুনছেন দেখছি, বাঃ, এ যে গন্ধর্বপুরী একেবারে!"

আমিও হাসিয়া উত্তর করিলাম—"আপনিও তো লোভ সামলাতে পারলেন না। আশা করেছিলাম এ আসরে আর কেউ এসে ভিড় জমাতে চাইবে না, দাঁতে দাঁত চেপে কোন রকমে বসে থাকতে পারলে অন্তত একটু হাত পা ছড়িয়ে যেতে পারব।"

সেকেণ্ড ক্লাসের এদিককার বেঞ্চে আমরা তিনজন, ওদিককার বেঞ্চটায় কিন্তু একটুও জায়গা নাই, একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক আর পাঁচজন মাড়োয়ারী মহিলা কতকটা গাদাগাদি হইয়াই বসিয়া আছে, ভদ্রলোকটি সামান্য একটু ব্যবধানে। তাহার মাথায় রাঙা টকটকে সিল্কের পাগড়ি, গায়ে একটি ভালো সিল্কের লম্বা কোট, তাহার বোতামগুলো সব সোনার, দুই হাতেই গোটাচারেক হীরা আর পান্নার আংটি, জামার ওপর সিল্কের চাদর জড়ানো, চোখে কাজল। বয়স মনে হইল চল্লিশের দু'এক বছর ওপরেই হইবে। মহিলা কয়জনের দেখা যায় শুধু পায়ের গোছে মোটা মোটা মল, জরিদার দিল্লী নাগ্‌রা আর মণিবন্ধে মোটা মোটা সোনার চুড়ি। বাকি সমস্তই সুপরিসর রঙিন ছাপা চাদরে ঢাকা, তাহারই ঘোমটা এদিকে উদর পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। পাঁচজনেই বেশ সপ্রতিভ কণ্ঠে একটা গান ধরিয়াছে। পুরুষটি একধারে একটু জড়োসড়ো হইয়া বসিয়া আছে এবং এক-আধবার যেমন চঞ্চলভাবে আমাদের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে তাহাতে মনে হয় সে নিজে বেশ সপ্রতিভ নয়। তাহার চোখের কাজল এবং দৃষ্টির এই জড়তা দেখিয়া মনে হইল সমস্ত অভিযানটির বিবাহ-গত কোন ব্যাপারের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে এবং সঙ্গীতটি আনুষ্ঠানিক।

আর একটা কথা, সকলেই একটু বেশ স্থূল। এমন কিছু উল্লেখ করিবার কথা নয়, তবে ওদের হিসাবেও সবার স্থূলতা একটু বেশি তাই বলিয়া রাখিলাম। নিশ্চয় সাধারণ ধনী মাড়োয়ারীর অনুপাতেও অর্থসাচ্ছল্য খুব বেশি।

সঙ্গীত লইয়া রহস্যটুকুর পর আমাদের অন্যান্য কথাবার্তাও হইল। নবাগত ভদ্রলোকের নাম রাধাকান্ত আচার্য। রাজসাহী জেলায় বাড়ি। কিছু জমিদারি আছে, কিন্তু পাকিস্তানে পড়িয়া গেছে, বিস্তর অসুবিধা, তাই এদিকে একটু আস্তানা দেখিতে আসিয়াছিলেন স্ত্রী-পুরুষে, এখানে একজন আত্মীয় উকিল আছেন তাঁহারই বাড়িতে থাকিয়া। জায়গা একটা পাওয়া গেছে। এইবার ওদিকে একটা ব্যবস্থা করিয়া ফিরিয়া আসিবেন পরিবারবর্গ সমেত।

আমার পরিচয়াদি লইলেন। ইতিমধ্যে গাড়িটা ছাড়িয়া দিয়াছে। গোটাচার স্টেশনের পরেই পূর্ব-বঙ্গের সীমানা, আমাদের গল্প-গুজবের মধ্যে একটা স্টেশন পারও হইয়া গেল।

কতকটা গায়ে পড়া হইলেও বেশ আমুদে লোক। একটু বোধ হয় বেশি গল্প করার অভ্যাস আছে, প্রশ্ন করিয়া করিয়া একটু বেশি বকাইবারও, কিন্তু সরস মন্তব্য দিয়া গল্প বলারও, আর শোনারও এমন একটি ক্ষমতা আছে যে বিরক্তি তো আসতে পারে না, বরং সময়টা যে কোথা দিয়া কাটিয়া গেল যেন বুঝিতেই পারা গেল না।

দ্বিতীয় স্টেশন পার হইয়া গেল, রাধাকান্তবাবু বেশ গলা নামাইয়া বলিলেন—"এবার ওদিকে একটু রগড় করা যাক্ মশাই, দিব্যি ফুটফুটে বরটি, লোভ সামলাতে পারা যাচ্ছে না।"

বলিলাম—"করবেন কি আলাপ উনি? বড্ড লাজুক মনে হচ্ছে।"

"বর লাজুক হবে না? কী যে বলেন! তায় অমন ছেলেমানুষটি—"

একটু সরিয়া আসিয়া কতকটা সামনাসামনি হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কোথায় যাওয়া হবে আপনাদের ?"

যেমন আশঙ্কা করিয়াছিলাম, মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটি এই গায়ে পড়িয়া আলাপ-করাটা বেশ যেন পছন্দ করিল না, একটু গম্ভীরভাবেই বলিল—"আমনোড়া।"

"আসছেন কোথা থেকে ?"

"মালদহ"—মুখটা আর একটু গম্ভীর হইল।

"আমনোড়া কি করতে যাচ্ছেন ? বিয়ে করতে নয় তো ?"

ভদ্রলোক একটু নিরুত্তরই রহিল, তাহার পর গোঁফজোড়াটা ফুলাইয়া একটু আড়ে চাহিয়া বলিল—"এত জানবার কি দরকার আছে আপনার মোশাই ? ঠাট্টা কোরবারই বা কি হক্ আছে ?"

ব্যাপারটা আমার কাছেও বড় বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইল, যেন কাঠ-রসিকতা গোছের। রাধাকান্তবাবু কিন্তু দমিলেন না, একটু হাসিয়াই বলিলেন—"সে কি কথা ! আপনি হিন্দুস্থান থেকে পাকিস্তানে যাচ্ছেন বিয়ে করতে, অর্থাৎ আমার দেশে, ঠাট্টা করবার সম্বন্ধ হল না ? কিন্তু কনে কি তারা সেখান থেকে আনতে দেবে ? একটা ছুঁচ আনতে গেলে রুখে দাঁড়াচ্ছে যে ! তায় বরযাত্রী তো মাত্র পাঁচজন মেয়ে, তাঁরা উড়ুনি সামলাবেন কি—"

ঠাট্টাটা একেবারে অভদ্রতায় গিয়া দাঁড়ায়। ভদ্রলোকের চরিত্রে সামঞ্জস্য-বোধের একটা অভাবে আর তাহার হঠাৎ পরিচয়ে আমিও যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেছি, একটু শুষ্ককণ্ঠেই বলিলাম—"থাক, উনি কোথায় যাচ্ছেন তাতে আমাদের কি ?"

রাধাকান্তবাবু এবার আমার দিকে মুখ ঘুরাইলেন, বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—"আপনি অবাক করলেন মশাই ! উভয় পক্ষেই সমান দরকার যে। ওঁরও পুরুষ বরযাত্রী নিতান্ত দরকার—পাকিস্তান থেকে মেয়ে আনতে যাচ্ছেন, আমাদেরও ফাঁকতালে দুটো দিনের চব্যচুষ্যের ভালরকম ব্যবস্থা হয়। আপনি তো হিন্দুস্থানেরই মানুষ, হক্ আছে, আমিও পড়ি ঢুকে। র্যাশনের বাজারে কতদিন লুচি-হালুয়া-রাবড়ির মুখই দেখি নি !"

ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কি মশাই, অন্যায় বলছি ?"

সে এবার স্পষ্ট বিরক্তিতেই মুখটা ঘুরাইয়া লইল।

গাড়ির হাওয়াটা হঠাৎ গুমোট হইয়া উঠিয়াছে, সঙ্গীত থামিয়া না গেলেও বেশ একটু স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে, ঘোমটা ঢাকা মুখগুলা রাধাকান্তবাবুর দিকে মাঝে মাঝে উত্তোলিত হইয়া নিশ্চল হইয়া যাইতেছে, দেখা না গেলেও তাহাদের ভাবগুলা যে প্রীতির নয় এটা বেশ অনুমান করা যায়। রাধাকান্তবাবু নির্বিকার, ঠোঁটে একটু হাসি লইয়া নূতন রসিকতার কথা চিন্তা করিতেছেন। ওদিকে তাঁহার সঙ্গিনী ভদ্রমহিলা জানলা দিয়া মুখটা বাহিরে বাড়াইয়া দিযাছেন, তাঁহাব ভাবটা বোঝা যাইতেছে না।

একটু চুপচাপ গেল, সঙ্গীত আবাব আগেকার পর্দায ফিরিয়া আসিল। ভদ্রলোকের মুখটাও একটু নরম হইয়া আসিয়াছে, রাধাকান্তবাবু প্রশ্ন করিলেন—"রাগ করলেন নাকি ? উত্তর দিচ্ছেন না যে ?"

বোধ হয় একটু মোলায়েম করিয়া বলার জন্যই এবার ভদ্রলোক একটু নরম হইলেন, ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া জানাইয়া দিলে যদি নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এইভাবে বলিলেন—"বিয়ে নয় মোশাই, আমনোড়ায় আমাদের কারবার আছে, ঠাকুরবাড়ি আছে, দ্বিরাগমনের পর ঠাকুরবাড়িতে আমাদের বিধ্ করতে হোয়, তাই যাচ্ছি। এই রোকোম করে গীত গেযে

যেতে হয়।—এবার বুঝলেন আপনি ? খুশ্‌ হোলেন ?"

রাধাকান্তবাবু একটু সন্তোষের হাসি মুখে টানিযা বলিলেন—"ও, তাই বলুন ! অথচ এই সামান্য কথাটা না বলে আপনি রাগ করছিলেন। একসঙ্গে যাচ্ছি, জানবার কি ইচ্ছে হয না ? আচ্ছা, তা'হলে আব একটা কথা– কনেও ওঁদের মধ্যে আছেন ? গান কবছেন ?"

প্রশ্নটা এতই রূঢ যে আমাকেও যেন আপনা হইতেই সোজা হইয়া বসিতে হইল, বেশ একটি অনুযোগের কণ্ঠে বলিলাম—"ছিঃ, এ কি করছেন রাধাকান্তবাবু ?"

ভদ্রলোক তো ওদিকে একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে—"এ কি বোকোম বেযাদপি আছে !"—বলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিতে যাইতেছিল, রাধাকান্তবাবু সেইবকম নির্বিকাব ভাবেই একটু হাসিযা, হাত উঁচাইয়া বলিলেন—"থামুন, রেগে তেড়েফুঁড়ে দাঁড়িযে উঠবেন না।"

ভদ্রলোক মনে হইল স্থূলত্বেব জন্যই আর উঠিল না, তবে বসিযা পড়িযা গর্জাইতে লাগিল, "আপনি ওপোমান কোববাব কে আছেন মোশাই ? মেযেদেব টেনে কথা বোলবার কে আছেন ? পাকিস্তানেব লোক আছেন তো আগে পাকিস্তানে চলুন, এখানে আপনাব কি একতিয়ার আছে যে মেযেদেব ধরে কথা বোলেন ? ইয়াদ বাখবেন এটা হিন্দুস্থান আছে, এখানে—"

গীত একেবারে থামিযা গেছে, বাধাকান্তবাবু একটু আড়ে চাহিযা লইযা বলিলেন "এ কি, ওঁরা গান থামালেন কেন ? দিব্যি শুনছিলাম ! কামিনী কণ্ঠের গীত ! "

"হুঁশিযার থাকবেন মোশাই !" বলিযা ভদ্রলোক গর্জন কবিযা উঠিল, কিন্তু এবাব জায়গা ছাড়িযা উঠিবাব একেবারেই চেষ্টা কবিল না। শুধু তাহাই নয, বিস্মিত হইযা লক্ষ্য করিলাম, কণ্ঠে বজ্র থাকিলেও চোখে কিন্তু সে বিদ্যুৎ নাই এবাবে। বাধাকান্তবাবুব দিকে যে-দৃষ্টিতে চাহিযা আছে, তাহাতে যেন একটা প্রশ্ন আর আশঙ্কাব ভাবই জড়িত।

একটু বিস্মযেব পব আমারও হঠাৎ খেযাল হইল, পাগল নয তো বাধাকান্তবাবু ! নিশ্চয উদম পাগল নয়, আমাব সঙ্গে যেমন নিতান্ত সহজভাবে কথা কহিলেন, ববং তাহাতে বুদ্ধির দীপ্তিই ছিল। কিন্তু এমন পাগল তো আছে, অবস্থা বিশেষেব মধ্যে যাহাদেব পাগলামি হঠাৎ চাগাইয়া ওঠে। তাহা না হইলে এই অভাবনীয ব্যাপাব, একেবারে ভদ্রমহিলাদেব লইয়া ঠাট্টা, তাহাও একেবারে এবকম বেপর্দাভাবে !

ওদিকে রাধাকান্তবাবু তর্জনেব উত্তরে বেশ মোলাযেম হাসি হাসিযা বলিযা চলিযাছেন—"আপনি রাগছেন কেন অত ? নিজেই বলছেন বিযেব পব ঠাকুববাড়িতে একটা কি বিধি-অনুষ্ঠান হয সেইটে সারতে যাচ্ছেন, তাতে যে নতুন কনেকে বাদ দিযে যাবেন, কি করে জানব বলুন না ! আমার তো এখনও বিশ্বাস তিনি আছেন এব মধ্যে। একসঙ্গে যাচ্ছি, ববং আপনার দেখিযে দেওযাই উচিত ছিল। দিন না দযা করে "

আমার দিকে চাহিযা প্রশ্ন করিলেন—"কি মশাই, ইচ্ছে করে না দেখতে ? আর তাতে দোষ আছে কিছু ?"

আমি নিঃসন্দেহ হইযা উঠিযাছি। প্রতি কথাতেই পাগলামিব লক্ষণ যতই সুস্পষ্ট হইযা উঠিতেছে, মাড়োযারী ভদ্রলোকটিব মুখ ততই শুকাইযা উঠিতেছে, ভেতরে ভেতবে যেন অতিরিক্ত নার্ভাস হইযা উঠিযাছে, এমন কি প্রায গালাগালেব কাছাকাছি এইরকম কটূক্তিতে এবার একটা কথা পর্যন্ত বলিল না। আমাব মুখেব পানেও যে চাহিতেছে তাহাতে বেশ একটা অসহায কাতরতার ভাব আছে, যেন বিপদে সাহায্য চায। আমিও তৈযাব হইয়া উঠিয়াছি, পাগল তো তাহাকে প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইবে। তাহার

পূর্বে একটা কথা মনে উদয় হইল, আর দ্বিধা না করিয়া গলা বাড়াইয়া ভদ্রমহিলার দিকে চাহিয়া বলিলাম—"দেখুন, আর ওরকম নিশ্চিন্দি হয়ে বসে থাকা চলে না। এঁর মাথার কি কোনও রকম গোলমাল আছে ?- তা'হলে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করুন, শুনছেন তো ?—ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে—"

আশ্চর্য ! কোন উত্তর নাই। শুধু মুখটা আরও একটু বাহিরে বাড়াইয়া দিলেন : সেটাও না হয় বোঝ' যায়, ভদ্রমহিলা যেরকম আধা-পাড়াগেঁয়ে লজ্জাশীল প্রকৃতির, কিন্তু আমার কথায় শরীরটা যে-রকম দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল, তাহাতে মনে হইল, হাসি যেন আর চাপিতে পারিতেছেন না- এ কি, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই পাগল নাকি ! যেটাকে পাড়াগাঁয়ে জড়তা মনে করিয়াছিলাম, সেটা তাহারই চাপা লক্ষণ নয় তো ?

একটা একেবারে নূতন রকম সমস্যায় পড়িয়া আমি যেন হতভম্ব হইয়া গেলাম। ভদ্রলোকটির অবস্থাও সেই রকম, শুধু একবার নিতান্ত বিরক্তির সঙ্গে মুখ বেঁকাইয়া, কতকটা যেন সবার সাহসটা বজায় রাখিবার জন্যই নিজেদের ভাষায় বলিল—"আরে তে গমো কেঁও, গীত গায়ে চল্লো না "

গান আবার চালু হইতে রাধাকান্তবাবু বলিলেন—"এই দেখুন তো, কেমন কান যেন জুড়িয়ে দিলেন, এইবার—যখন দয়া করে এ অনুরোধটি রাখলেন—কনেটিকেও একবার ঘোমটা তুলে দেখিয়ে দিন—"

ধৈর্য রাখা গেল না, এবার আমিই প্রায় ধমক দিয়াই উঠিলাম—"রাধাকান্তবাবু, চুপ করতে হবে, সত্যিই অসহ্য করে তুলেছেন আপনি, এ কি ! ভদ্রমহিলাদের নিয়ে—"

ব্যাপারটা দ্রুত একেবারে চূড়ান্তে আসিয়া পড়িতেছে। রাধাকান্তবাবু আমার কথায় একেবারেই কান না দিয়া ভদ্রলোকের পানে চাহিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, আপনার বিধি-অনুষ্ঠানের আগে কনেকে ছুঁতে বাধা থাকে, আমিই না হয়—"

- কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই উঠিতে যাইতেছিলেন, আমি একেবারেই বজ্র আঁটুনিতে ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া হুঙ্কার করিয়া কহিলাম—"বসুন বলছি, গালাগালির ওষুধ আমার ভালো রকম জানা আছে !"

মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটিকেও ধমক দিয়া উঠিলাম—"কি রকম অপ ! গন্ডল আপনি মশাই, পাঁচজন বাড়ির মেয়েকে নিয়ে এসেছেন, অথচ একটা পাগলকে ঠেকাবার সামর্থ্য নেই। ভয়ে কাঠ হয়ে বসে আছেন—"

একেবারে যেন পাথরের মূর্তি, ফ্যালফ্যাল করিয়া সামনে চাহিয়া বসিয়া আছে। ভদ্রমহিলা ওদিকে চাপা-হাসি হাসিয়া খুন হইতেছেন।

রাধাকান্তবাবু আমার দিকে চাহিলেন, ঠোঁটে সেই রকম মিটিমিটি হাসি লইয়া, পাগলের অবুঝ দৃষ্টিতেই চাহিয়া বলিলেন "হঠাৎ আপনার এত আপত্তি কেন ?"

তাহার পর মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটিকেই সাক্ষী মানিয়া তাঁহার পানে চাহিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ মশাই, আমি তো গায়েও হাত দিতে চাই নি, শুধু ঘোমটার কাপড়টা -"

আমি এমন একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়া আমার দিকে ঘুরাইয়া লইলাম যে, ভদ্রমহিলা পর্যন্ত কতকটা ভীত হইয়া ঘুরিয়া বসিলেন। বলিলাম—"তারও ওষুধ আছে মেয়েদের কাপড়ে হাত দেবার। আর এক পা এগিয়েছ কি তোমার দুঃশাসনের অবস্থা করে দেব ! হতভাগা কোথাকার !"

এবার পাগলের এমন একটা লক্ষণ প্রকাশ পাইল যে ক্ষণিক ভয়ে আমার হাতের

মুঠাটাও একটু যেন শিথিল হইয়া গেল। রাধাকান্তবাবু স্থিরভাবে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, সেই মৃদু হাসিটা আস্তে আস্তে বিস্তারিত হইয়া উঠিল, তাহার পর হো হো করিয়া একেবারে বদ্ধ পাগলের মতোই উচ্চঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন, একটু পরে দম লইয়া হাসির মধ্যেই বলিলেন— "আসল মজার কথাটা আপনিই বললেন মশাই—ওঃ—দুঃশাসন!— দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ!—কি শেঠজি? যাচ্ছে না ঠিক মিলে?—"

ও-পর্ব ঐখানেই শেষ হইল, তাহার পর কুরুসভার দৃশ্যটিই হইল অভিনীত, ভূমিকায় একটি দ্রৌপদী নয়, একেবারে ছয়টি।

গাড়ির গতি নরম হইয়া আসিল, রাধাকান্তবাবু পকেট থেকে একটি পরিচয় কার্ড বাহির করিয়া আমার সামনে ধরিতে আমার হাতটা শিথিল হইয়া গেল, "মাপ করবেন, আগে বলা উচিত ছিল"—বলিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলাম, যে-বিভাগেব অফিসার সে-হিসাবে একটু বোধ হয় বেশি কৌতুকপ্রিয়, তবে রঙ্গ-অভিনয়ের মধ্য দিযাও ব্যাপারটাও পরিষ্কার হইয়া আসিতে লাগিল আমার কাছে।

সঙ্গিনী ভদ্রমহিলাকে বলিলেন—"এবার ঝোলাটা দিন।"

ধীরে ধীরে নিজের পরিচয়ের পোশাকটা পরিলেন। ভদ্রমহিলাও দেখিলাম আব সেই ব্রীড়াময়ী আধা-পাড়াগেঁয়ের জমিদার-গৃহিণীটি নেই।

এবার রাধাকান্তবাবু মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটির পানে চাহিয়া বলিলেন- "আব বুঝতেই তো পাচ্ছেন, এবার আপনার সঙ্গিনীদের এক এক করে বাথরুমে ঢুকতে বলুন। ভয় নেই, আমি গায়ে হাত দেব না, আমার ঐ সঙ্গিনীই যা করবার কববেন।"

আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"দুঃশাসন হবার আব কাব সাধ থাকে, বিশেষ করে এই কাঠামোর দ্রৌপদীদের নিয়ে?"

সবই ঠিক করা ছিল, গাড়ি থামিতে রাধাকান্তবাবুর অধীনেরই চারজন সশস্ত্র পুলিস আসিয়া গাড়ির দুইটা দরজায় দাঁড়াইল, বাহিরে ভিড জমিয়া উঠিতে লাগিল।

তবে বাথরুমে শেষ পর্যন্ত রাধাকান্তবাবুকেই প্রবেশ করিতে হইল। তাঁহাব সঙ্গিনী একজনকে লইযা প্রবেশ করিবার আধ মিনিটটাক পরেই ত্রস্তভাবে বাহির হইযা আসিলেন, চোখ বড় বড় করিয়া বলিলেন—"আপনাকেই আসতে হবে—মেয়ে নয়!"

"অ্যাঁ! বলেন কি!"—রাধাকান্তবাবু শিহরিয়া উঠিলেন, মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটিব পানে চাহিয়া বলিলেন—"ঠাট্টায় শেষ পর্যন্ত আপনারই জিৎ রইল শেঠজি!"

অদ্ভুত! এক-একজনের গায়ে দশখানা বারোখানা করিয়া ধুতি, শাড়ী, জামার কাপড! এ ধরনের ভেল্কি জীবনে দেখি নাই, একে একে যখন একবস্ত্রে বাহির হইযা আসিতে লাগিল, শুকাইয়া একেবারে চুপসাইয়া গেছে, যেন কতদিনের ম্যালেরিযাগ্রস্ত রোগী!

আর, সবাই মাড়োয়ারীও নয়, দুজন বাঙালী, একজন মনে হইল উৎকলী, এত বিপদেও পান চিবাইতেছে। আর তিনজন মাড়োয়ারী বলিয়াই বোধ হইল, দলপতিকে লইয়া। তাহার নিজের শরীর থেকে বাহির হইল দু'খানা সিল্কের শাড়ী, একখানা চাদর, বাকী সব কটা কাপড়—তিনটে ফতুযা, একখানা শার্ট, আর তিনখানা কোট।

দলবল লইয়া নামিয়া যাইবার সময় রাধাকান্তবাবু নমস্কার করিয়া বলিলেন—"বড একঘেয়ে কাজ; একটু ফষ্টি-নষ্টি না নিয়ে থাকলে চলে না, মাফ করবেন।"

স্বাধীনতা-ডিনার

সকাল বেলা। গঙ্গাধর রাস্তার ধারের বারান্দাটিতে একটা আরাম কেদারায় বসিয়া গড়গড়া টানিতেছেন। কিশোর-কিশোরীদের একটা বেশ মাঝারি সাইজের মিছিল এইমাত্র গান করিতে করিতে চলিয়া গেল। সবার হাতে একটা করিয়া ছোট জাতীয় পতাকা, মুখে উৎসাহ, তাহার ওপর সূর্যের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। নবীনের ছেলে প্রশান্ত সব আগে, গঙ্গাধরকে দেখিয়া বলিল—"দাদু, আজ স্বাধীনতা-দিবস !" তাহার পর তাহারই পরিচালনায় সমস্ত দলটা বলিয়া উঠিল—"গঙ্গাধর দাদুকী—জয় ! !" গঙ্গাধব হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গান করিতে করিতে দলটা রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মনে পড়িয়া গেল কিঞ্চিদধিক চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা। এই রাস্তা ধরিয়া তাঁহারাও এইরকম গান কবিতে করিতে যাইতেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল সতের-আঠার বৎসর। এদের জয়োল্লাসে সেই দিনের উন্মাদনা জীর্ণ ধমনীতে আবাব যেন জাগিয়া উঠিযাছে। তাঁদের ছিল সাধনা, এদের হাতে সিদ্ধি।

আজকাল কিন্তু কোন উন্মাদনাই টেঁকে না বেশিক্ষণ, যত বড়ই তাহাব সূচনা হোক না কেন, যত বড়ই প্রেরণা। কোন একটা প্রশ্নেব সূত্র ধরিয়া স্তিমিত হইযা আসে, তাহার পব বিরক্তি, তাহার পর তিক্ততা, অবসাদ, হতাশা—

গঙ্গাধব ভাবিতেছিলেন—সিদ্ধি তো কবতলগত, কিন্তু কি সিদ্ধিব রূপ ! এব জন্যই কি ছিল তাঁহাদের সেই মৃত্যু-পণ সাধনা ?—অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, বোগে ঔষধ নাই, তাহাও যে অভাবে নাই এমন নয, থাকিতেও নাই, অর্থপিশাচদের লালসা দিনদিনই বাড়িযা মানুষকে তাহার ন্যায্যপ্রাপা থেকে বঞ্চিত করিতেছে। প্রতিকার নাই, কে করিবে ? যাহাদের হাতে শাসন তাহাদের টিকি ঐ পিশাচদের মুঠোর মধ্যে, মাঝে মাঝে এক-একটি ফাঁকা হুঙ্কাবে ঠাট বজায রাখে—তাহাতে প্রজারা হয ক্ষণিকের জন্য অ . ৮, ওদিকে পিশাচেরা হাসে, কেননা ওটা ওদের উভযেব মধ্যে একটা চুপি চুপি বন্দোবস্ত।—এদিকে দ্বেষা-দ্বেষি, হানা-হানি—নিজেদেব মধ্যে, আবার প্রদেশে-প্রদেশে। গালাগালি, ইতবোমির ফুলঝুরি। তারপর কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ—এরা যে মাকে খণ্ডিত করিল, এ যেন তাঁহার দুই-চক্ষেব জ্বালা, অভিশাপ হইযা সন্তানদের ওপর আসিযা পড়িতেছে।

কিশোরদের জযোল্লাস দূরে রাস্তায় কোন্ বাঁক থেকে ভাসিযা আসিতেছে—"ভাবত মাতা কি জয় ! !" কেমন যেন বিদ্রূপের মতো কানে আসিযা বাজিতেছে, মনটা এব মধ্যেই এতখানি গেছে বিষাইযা।

এই সময ডাক-হরকরা আসিযা খানতিনেক চিঠি আব দৈনিক কাগজ দুইখানা দিয়া গেল। চিঠি তিনখানা পড়িলেন, একখানা পুত্র প্রমথর, শিয়ালদহেব পূর্ববঙ্গেব প[illegible]দের দুরবস্থার কথা লিখিযাছে। কেনই বা যে লেখে এ সব !—কাগজ দুইখানা খুলিতে না হয সাহস, না হয় প্রবৃত্তি। আগাগোড়া যেন অশ্রুর মসী দিয়া ছাপা। তবু পড়িতে হয. বাহিরের জগতের সঙ্গে ঐটুকুমাত্র যোগসূত্র। রেলে, স্টীমারে, নৌকায় দুই দিনের পুরানো খবর লইয়া আসে, এই দুই দিনের মধ্যে ওদিকে আরও কত অশ্রু গড়াইয়াছে কে জানে ?

একবার চোখ বুলাইয়া গেলেন একখানা কাগজের ওপর—পাকিস্তানীরা ভালোভাবেই ঢুকিয়া পড়িয়াছে কাশ্মীরে বড় ক্যালিবারের কামান লইয়া—বাজাকারেরা পণ করিয়াছে আর হিন্দু বলিয়া কিছু থাকিতে দিবে না—দুইটা সংবাদ খোঁজা একটা যেন বাতিকে দাঁড়াইয়া গেছে গঙ্গাধরের। একটা অনেকদিন আগের পুরানো খবরের জের—মন্ত্রীর দল হানা দিয়া কোন মাড়োয়ারীর ময়দার কলে তেঁতুলের বিচির পাহাড় আবিষ্কার করে ; কি হইল তারপর ? দ্বিতীয় খবর, বাঙালীদের নাকি একটা পল্টন তোলা হইবে, অপেক্ষাকৃত অধুনাতন খবর, আবার চাপা পড়িয়া গেছে। দুটাতেই বড় আশা জাগাইয়াছিল—রোজ একবার এ-কোণ থেকে ও-কোণ পর্যন্ত খুঁজিয়া যান—প্রায় পাগলামি।—একখানি চিঠি—"...সম্পাদক মহাশয়েষু—উলীপাড়া গোবিন্দপুরের হাটে চালের অবস্থা দিন-দিনই শঙ্কাজনক হইয়া উঠিতেছে, গত সপ্তাহের অপেক্ষা এ সপ্তাহে মণ পিছু তিন টাকা বর্ধিত হইয়া এখন সাড়ে তেইশ টাকায় দাঁড়াইয়াছে, আরও আশঙ্কার বিষয় যে, কাঁকরের অনুপাত দিন-দিনই বাড়িয়া যাইতেছে। এ-বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি বার বার আকর্ষণ করিয়াও—"

কাগজটা তাড়াতাড়ি মুড়িয়া ফেলিতে ফেলিতেও একটা শীর্ষের ওপর নজর পড়িয়া গেল—"বস্ত্রাভাবে গর্ভিনীর আত্মহত্যা—"

এই সময় পতিত মণ্ডল আসিয়া উপস্থিত হইল। গঙ্গাধর যেন বাঁচিলেন, বলিলেন "এস পতিতপাবন, ক'দিন দেখি নি!"

পতিত উঠিয়া আসিয়া চরণ স্পর্শ করিয়া হাতটা কপালে ঠেকাইল, একটু তফাতে মেঝের ওপর বসিয়া বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা এসি নি, একটু ঝঞ্ঝাটে পড়ে গেচলুম কিনা।"

২

পতিত মণ্ডল জাতিতে হরিজন। গঙ্গাধরদেব নবপ্রেরণার যুগে—সেই চল্লিশ বছর আগে, পতিতের সঙ্গে সখ্যের সূত্রপাত হয়। ওঁরা মন্ত্র পাইয়াছিলেন বিবেকানন্দের কাছে "হে ভারত, ভুলিও না, নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সদর্পে বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।"—সেই অনুপ্রেরণাতেই কোল বাড়াইয়া হরিজন পল্লীতে উপস্থিত হন। 'সখ্য' কথাটা কিন্তু গঙ্গাধরের দিক থেকেই ব্যবহার করা হইল। পতিত মণ্ডল নিজের দিক থেকে সে-স্তরে উঠিতে পারে নাই বা চাহে নাই। যুগ-যুগের সংস্কার অত শীঘ্র তো যায় না—ঐ পদস্পর্শ করিয়া এক হাতের নিচে বসিবার অধিকারটুকু পাইয়া সন্তুষ্ট আছে। এর বেশি তোলা গেল না তাকে। কিন্তু একটা বিষয়ে গঙ্গাধর বেশ কৃতকার্য হইলেন, নেশা-ভাঙ প্রভৃতি জাতিগত দোষগুলি ছাড়াইয়া নিজের জাতব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া উহাকে উহাদের সমাজেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন, এখন গ্রামের সমাজের মধ্যেও পতিত মণ্ডলের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, হউক না কেন হরিজন। আশা করা যায়, দেশের মধ্যেও তাঁহাদের গ্রামের এই মণ্ডল পরিবারের একটা দিন আসিতেছে।

তাহার কারণ, পতিতের মধ্যে যেটুকু সাধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছিল, ওর ছেলের মধ্যে সেটা ভালোভাবে মিটাইয়া লইয়াছেন গঙ্গাধর, নিজের হাতে তাহাকে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা দিয়া। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। ইংরাজ আমলে তপসিলী জাতি হিসাবে একটি ডেপুটির পদ পায়। অসহযোগ আন্দোলনে সেটি ত্যাগ করিয়া দেশের কাজে নামে।

এখন শাসনবিভাগে কোন বিশিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত, এর পরের ধাপই মন্ত্রিত্ব।

পতিতপাবন বসিয়া নিজের অভ্যাসমতো কথাটার পুনরুক্তি করিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, পড়ে গেচলুম একটু ঝঞ্ঝাটে। অমরা নিকোচল, একটু খাওযা-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তাই একটু যোগাড়ে ঘুবছিনু—কোথায পাঁটা বে, কোথায একটু ভালো মযদা রে, কোথায একটু ভালো ঘি রে, জানেনই তো অবস্থা, পুকুরের মাছ সেও জালের দিকে ভেড়ে না, কি এক অস'যোগ মন্তবই সবাব কানে দিয়ে দিলেন মহাৎমাজী!—উরিব মধ্যে ভাবি বাবাঠাকুরেব পা ছুঁযে এসি একবার, হযেই ওঠে না। শেযে বিধেতাপুরুষ বললেন—দাঁড়া, তোর এমনি হবে না সময।—তা হ্যাঁ বাবাঠাকুর, সাধিনতা জিনিসটা কি?—এই মাত্তোর অমবার এক চিঠি পেলুম -এই ডাকে—সাধিন্‌তা-ডিনার দিতে হবে সবাইকে—আজই সন্দেয। ডিনাবটা জানি—সাযেবদের খানসামাগিবি কবে গোড়ার দিকটা কাটল তো আপনাব পাযেব ধুলো পাবাব আগে; ধিন্‌তাও না হয বুঝলুম—ওবা বলত বল্‌ডান্‌স্, কিন্তু সাধিন্‌তা বলে আবাব আলাদা একটা আচে তা কৈ জানি না তো! কথাটা এর আগে গেচে এক-আধবাব কানে, অত গা করি নি, আজ একেবারে শিয়রে সংক্রান্তি হযে এসে পড়ল। চিঠি পড়ে দিলে অমরাব ছোট ছেলে পুটে, সে মানেটা কিন্তু বলতে পাবলে না, শিশু তো একটা! তখন মনে কবলুম, যাই দাদাঠাকুরেব কাচে, অনেকদিন পাযেব ধুলোও নেওযা হয নি ইদিকে।—এখন, সাধিন্‌তার মানেটা কি হোল? বিপদেব ওপর বিপদ—আজই সন্দেয ডিনাব, মিনিসটাবও আসচেন। এই দেখুন না চিঠিটা।"

আগুন ধবিয়া গেছে গঙ্গাধরের মাথায, এ অবস্থাতেও ভোজ খাইযা বেড়ায? তাও সাদা দিশী ভোজ নয, ডিনাব! অমরেশটাও দলে পড়িযা গেল শেষ পর্যন্ত? লিখিতে কলম সবিল কি কবিযা? পাণ্ডাবাও বহিযাছে- -আসল কাজ সামলায না, দেশে হাহাকার, হবিজন-গৃহে ভোজ খাইযা কাগজে ফাঁকা ঢক্কানিনাদ—পপুলাবিটি—ভবিষ্যতের ভোট আগলানো!

বেশ একটু অন্যমনস্ক হইযা গিয়াছিলেন, নিজেকে সামলাইযা লইযা চিঠিটা পড়িতে লাগিলেন

শ্রীচবণকমলেষু -

আপনাকে পূর্বপত্রে যে ভোজেব ব্যবস্থাব কথা লিখিযাছিলাম আশা করি সে বিষযে তৎপর আছেন। সাতচল্লিশ সালে ১৫ই আগস্ট আমবা যে ইংরেজদের নিকট হইতে বাজাভাব লাভ করি, তাহাব এক বৎসব পূর্ণ হইতে যাইতেছে, এবং এই উপলক্ষেই এই উৎসব। আমাদেব সঙ্গে আমাদের মাননীয মিনিস্টার মহাশয এবং কযেকজন বিশিষ্ট কর্মচাবী থাকিবেন, সর্বসমেত কুড়িজনেব আহাবেব ব্যবস্থা রাখিবেন। পথে কযেক জাযগায কিসাণ-সম্মেলন ও মিনিস্টাব মহাশয দ্বাবা জাতীয পতাকা উত্তোলন আছে। সেই সমস্ত সাবিযা বাত্রি ৮ ঘটিকাব সময আমবা সকলে ঐখানে উপস্থিত হইব। সব যেন প্রস্তুত থাকে, কেননা সঙ্গে সঙ্গে আহার সাবিযা মিনিস্টাব মহাশয এক মাইল দূরে রাযগঞ্জের স্টীমাবঘাটে কিযাণ-সম্মেলনে বক্তৃতা দিবাব জন্য যাত্রা করিবেন। আমরা সেইখান থেকে বাত্রি দশটার সময আমাদেব স্পেশাল লঞ্চে ফিবিযা আসিব।

আপনি ও জননীদেবী আমার শতকোটি প্রণাম লইবেন এবং সবাইকে আশীর্বাদ জানাইবেন।

ইতি-

প্রণত সেবক
শ্রীঅমরেশ মণ্ডল।

পুনশ্চ—

এটি সাধারণ ভোজ হইবে না। স্বাধীনতা-ডিনার নাম দিয়া সবাইকে আহ্বান করিয়া লইয়া যাইতেছি। অনুগ্রহ করিয়া লক্ষ্য রাখিবেন সমস্ত ব্যবস্থাই যেন তাহার উপযোগী হয়, আমরা এত সাধনা করিয়া যে বস্তু লাভ করিয়াছি তাহার যেন মর্যাদা রক্ষা হয়।

চিঠিটা পড়িয়া ভিতরের রাগে গঙ্গাধরের কান দুইটা পর্যন্ত গরম হইয়া উঠিল। নিজেকে সংযত করিয়া লইতে একটু বিলম্ব হইল, তাহার পর সহজ ভাবেই বলিলেন—"তুমি কথাটার যা অর্থ করেছ পতিতপাবন, তা প্রায় কাছাকাছি গেছে। মাথার চুল পাকলো, বেশি ভুল তো আর করবে না। স্বাধীনতা হচ্ছে তোমরা যাকে বল—স্বরাজ, যার জন্যে এত কাণ্ড হোল। এখন এই স্বরাজটা যে পাওয়া গেল তার মধ্যে সাপ আছে কি ব্যাঙ আছে তাই নিয়ে কান্নাকাটি না করে, একটু ধিন্‌তা-ধিন্‌তা দরকার নয় ? তাই হয়েছে স্বাধীনতা, তারই ডিনার। অবশ্য বলড্যান্সের মতন কিছু নয়, তবে একটু ফুর্তি করাই কি নাচ নয় ? এই যে বলি, আমাদের মনটা নেচে উঠছে, সে কি আর ঘুঙুর পরে সত্যিকার নাচ ?—সেই রকম আর কি ! বুঝলে না ?"

পতিত মণ্ডল একটু নড়িয়াচড়িয়া গুছাইয়া বসিল, ঈষৎ হাসিযা বলিল—"আমি বললুম না ?—বলি, পতিত, ভেবে সারা হচ্ছিস কেন ?—চল্ বাবাঠাকুরের কাচে, গেলেই সঙ্গে সঙ্গে মুসকিল আসান হয়ে যাবে, চিরজন্মটা তাই হয়ে এল, আর আজ হবে না ?—তাহলে সাধিন্‌তা হোল আমাদের এই স্বরাজ। আমাদের চাষাভুষোদের মধ্যে সেই যে বলে 'মসনে কলকেতায় গিয়ে তিসি হয়েচে'—সেই গোচের। এইবার বুঝলুম বাবাঠাকুর। হ্যাঁ, তা কত কষ্টে পাওয়া গেল স্বরাজ, মনটা নেচে উঠবে বৈকি বাবাঠাকুর, একটা হারানো গরু পাওযা গেলে ইচ্চে করে—"

"তবেই বোঝ। অমরেশ স্বরাজই লিখত, তাহলেই বুঝতে তুমি সোজা কথাটা, কিন্তু ঐ যে ডিনার রয়েছে—একটু সামঞ্জস্য করে লিখলে—স্বাধীনতা, পেটে বিদ্যে রয়েছে কিনা—"

পতিতপাবন গদগদ হইয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিল—"সব আপনার পায়ের ধুলোর মহিমে বাবাঠাকুর। সামঞ্জস্যি-জ্ঞান থাকবে না ? কার হাতে মানুষ হোল দেখতে হবে তো ? তা এখন করতে হবে কি আমায় ? একবার তো নিকেচিল ভোজেব কথা। আমি পাঁটা রে, ময়দা রে, হ্যানরে, ত্যানরে—যোগাড় করে থুয়েচি। আজ আবার নিকচে মামুলী ভোজ নয়। তাহলে সমিস্যে দাঁড়াচ্ছে না ? আমি বললুম—পতে, এ তোর কম্ম নয়, চল বাবাঠাকুরের কাচে। তুই আর সব ঠাঁই মুড়ুলি করগে, তবে যেখেনে খাটবে না সেখেনে এগুস নি, ন্যাজে-গোবরে হয়ে মরবি !—তাহলে বাবাঠাকুর—"

কি একটা চিন্তার স্রোত চলিতেছে ভিতরে ভিতরে, তাহাতেই গঙ্গাধরের মুখ হইতে সেই প্রচ্ছন্ন ক্রোধের ভাবটা কাটিয়া গিয়া ধীরে ধীরে মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। বলিলেন—"এই দেখো, পতিতপাবন আমাদের বুঝেও বোঝে না ! সোজা পথ ধরে এগোও না, আপনি পরিষ্কার হয়ে যাবে সব। এই ধরো শ্রাদ্ধের ভোজ আর অন্নপ্রাশনের ভোজ কি এক হয়েছে কখনও ?"

"আজ্ঞে তা কি হয় কখনও, না পারে হতে?"

"তাহলে তোমার মামুলী ভোজ আর স্বাধীনতা-ডিনার এক হচ্ছে কি করে?"

পতিতপাবন আবার নড়িয়াচড়িয়া মুখে হাসি ফুটাইয়া ভালো করিয়া বসিল, বলিল—"আমি তাই বললুম না?—পতে, তুই যতই মুড়ুলি কর না কেন—"

"আচ্ছা এই আর একটা কথার জবাব দাও। একরকম তো নয় দুটো ভোজ, কিন্তু সরঞ্জামের কোন তারতম্য আছে? সেই তেল, ঘি, মসলা, চাল-ডাল, আলু-পটল—আছে কি কোন ইতর-বিশেষ?"

"আজ্ঞে না, শুধু মাছটা-মাংসটা শ্রাদ্ধতে আর—"

খুব কুণ্ঠার সহিত পতিত মণ্ডল ভুলটা শুধরাইয়া দিতে যাইতেছিল, গঙ্গাধর হাসিয়া বলিলেন—"এই দেখো। পতিতপাবনের আমাদের আজ পদে পদেই ভুল! শ্রাদ্ধ তো আর অন্নপ্রাশন নয় গো যে, তাতে মাছ-মাংস দেওয়া চলবে। যেগুলো চলবে তাতে আছে তারতম্য—সেই তেল মসলা চাল ডাল আলু—"

"আজ্ঞে, তফাৎ আর কৈ?"

"অথচ বলছ দুটো ভোজ একরকম নয়, তাহলে প্রভেদটা দাঁড়াচ্ছে কোথায়?"

পতিতপাবন বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া রহিল। গঙ্গাধর একটু সময় দিয়া বলিলেন—"দাঁড়াচ্ছে এইখানে—তুমি একটাতে ঐ মাল-মসলা দিয়ে রাঁধলে ভাত, ঘণ্ট, ছেঁচকি, ডালনা, চচ্চড়ি, অম্বল, পায়েস। একটাতে রাঁধলে সাদা পোলাও, ছক্কা, দম, কালিয়া, চাটনি, ক্ষীর। তাহলে তারতম্যটা দাঁড়াচ্ছে কোথায়?—না রান্নায়! বটে কিনা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, রান্নাতেই তো দাঁড়াচ্চে, তাবতম্যিটা তো রান্নাতেই গিয়ে দাঁড়াল।"

"এইবার মিলিয়ে দেখো। তুমি যোগাড় করেছ পাঁঠা, মাছ, ময়দা, সরু চাল, ঘি, তারপর তরি-তরকারি। ওদিকে দই, সন্দেশ, রসগোল্লা,—এই তো?—বেশ, রান্নার ব্যবস্থাটা করছ কি?"

"আজ্ঞে, অম্‌রার মাকে বললুম, দেখ, কলকেতা থেকে তা-বড় তা-বড় সব এসচে, পোলাও আর লুচি দুটোরই ব্যবস্থা কবি, তারপর শাক ভাজা, পটল ভাজা, কুমড়োর ছক্কা, মাংসর কোর্মা, মাছের—"

গঙ্গাধর হাতটা ওঁচাইয়া বলিলেন—"বুঝলুম, সেই মাছের ··লিয়া, ছোলার ডাল, ছ্যাঁচড়া, চাটনি—কিন্তু তাতে স্বাধীনতা-ডিনাবটা হচ্ছে কোত্থেকে? এ তো চৌধুরীদের বাড়িব বৌ-ভাত হয়ে গেল!"

মুখের পানে আড়চোখে চাহিয়া গড়গড়া টানিতে লাগিলেন। একটু পবে আবার বলিলেন—"কৈ গো মোড়লের পো, উত্তুর দিচ্ছ না যে?—এ তো তোমার সেই চৌধুরী-বাড়িব বৌ-ভাত হয়ে গেল, ওর সঙ্গে দই ক্ষীর আর চারটে মিষ্টি জুড়ে দিলেই নিশ্চিন্দি।"

পতিতপাবনের আবার আগের অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে। অপ্রতিভভাবে বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই তো দেখি, এ যে চৌধুরীবাড়ির বৌ-ভাত হয়ে পড়ল!"

"তাহলেই ভেবে দেখো, অমরেশ তোমায় আন্দাজ করে নিয়ে ঠিকই লেখে নি?—নিয়ে যাচ্ছি স্বাধীনতা-ডিনার খাওয়াতে—মিনিস্টার পর্যন্ত রয়েছেন, তা যদি চৌধুরীবাড়ির বৌ-ভাত খেয়েই ফিরতে হয়—তার চেয়ে বাবাকে একটু স্পষ্ট করেই লিখে দিই—একখানা চিঠির ওয়াস্তা তো?—"

"তাহলে বাবাঠাকুর, এখন উপায়? আর সময়ই বা কোথায়?"

"উপায় তো হাতেই রয়েছে। মাল তো তোমার নতুন যোগাড় করতে হচ্ছে না - ঐ ময়দা, ঐ চাল, ঐ পাঁঠা, শুধু রান্নার তরকিবটা দিতে হবে বদলে—যাতে ঐ জিনিসেই ধিন্‌তা-ধিন্‌তা ভাবটা আসে। বুঝছ না ?—তাদের ধিন্‌তা-ধিন্‌তা ভাবটা আসত বোতলের গুণে, সে তো তোমার দেখা-ই। এরা তো আর সেদিকে যাবে না, মহাত্মাজীর চেলাই তো ?—এদের ও-ভাবটা জাগাতে হবে রান্নার তরকিবে। সেটা তোমার আসে কি ? তুমি তো সায়েবের খানসামাগিরিই করেছ, এসবের হদিস তো জানা নেই-"

"আজ্ঞে, আমি তো সায়েবেরই খানসামাগিরি করেচি, এসবের হদিস জানব কোত্থেকে ?—তাহলে ?"

"তাহলে জানে এমন লোক খুঁজে বের করতে হবে।"

"এমন লোকটা গ্রামের মধ্যে কে বাবাঠাকুর ?"—পতিত মণ্ডল ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

গঙ্গাধর গড়গড়া টানিতে টানিতে অনেকক্ষণ চক্ষু ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া খোঁজাখুঁজি করিলেন, তাহার পর বলিলেন,—"তাই তো দেখছি, সে লোক কোথায় গ্রামে ?- তাহলে কি—আমাকেই নামতে হবে শেষ পর্যন্ত ?"

পতিতপাবন একেবারে পায়ের ওপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল, বলিল-"তাই নামুন বাবাঠাকুর, ও আপনার দ্বারাই হবে ; কত গুণ ধরেন ঐ শরীরে তা আমার তো জানা, ছিচরণের বুড়ো আঙুলটুকু ঠেকিয়ে আর একবার অহুল্লো-উদ্ধার করুন কিরপা করে যা চান, যত লোক চান যোগাড় করে দিচ্ছি।"

"অত হৈ-চৈ-এর ব্যাপার নয়, সবই যেমন হয় হবে। আমি শুধু আমার তরকিবটুকু করে দোব, তার মধ্যে হৈ-চৈ নেই, একরকম মন্তরপড়া গোছেরও বলতে পার। তবে মন্তর গোছেরই যখন ব্যাপারটা, সে ক্ষেত্রে আমি যে ঘরটিতে বসে কাজ করব সেটিকে নিরিবিলি রাখতে হবে বাপু, মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করতে হবে কিনা, বুঝলে না !"

"আজ্ঞে, বুঝব না এ-সামান্য কথাটা ! মন্তর,—তাহলে সে তো পুজোর ঘর হয়ে দাঁড়াল কিনা।"

"শুধু মন্তর নয়, যোগাড়-যন্ত্রও চাই। তা সে সবের জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না, আমি নিজেই ঠিক করে নিয়ে যাব। তুমি তাহলে যাও, আর সময় নেই তো।"

৩

বেশ বড় দালান-বাড়ি পতিতপাবনের, কিন্তু গঙ্গাধরের পরামর্শেই সামনের প্রাঙ্গণে একটা হোগলার ম্যারাপ দাঁড় করানো হইয়াছে। রঙিন কাগজ আর দেবদারুর পাতা দিয়া সাজানোও হইয়াছে। খাওয়ার ব্যবস্থা টেবিলে। এবাড়ি-ওবাড়ি থেকে যোগাড় করিয়া ম্যারাপের মাঝখানে বসানো হইয়াছে, তাহার ওপর চাদর, তাহার ওপর ফুলদানিও। একটা গ্যাসলাইট বাড়িতেই ছিল, আরও দুইটা যোগাড় হইয়াছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত সব কিছুর ব্যবস্থা ঠিক করিয়া সকলে অভ্যর্থনার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আটটার অল্প কিছু পূর্বেই দলটি আসিয়া উপস্থিত হইল। সময় নাই, সামান্য একটু পরিচয়াদির পরই আহারের উদ্যোগ করিয়া দিতে হইল, সকলে টেবিলে বসিল।

আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই কুড়ি-পাটি দাঁতের নিচে কট-কট্-কটাস করিয়া একটা শব্দ

উঠিল। সকলেই একবার মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিয়া শব্দটা চাপিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু দু'এক গ্রাসেই বোঝা গেল অসম্ভব, পোলাওয়ের চালের সঙ্গে কম করিয়া ধরিলেও আধাআধি কাঁকর মেশানো। লুচিতে গিয়া পড়িল সবাই, একটু আগুপিছু করিয়া যতটা সম্ভব আবু বাঁচাইয়া। অসম্ভব, একে তো বোধহয় বারো আনা ভেজিটেব্‌ল ঘিয়ে ভাজা, তাহার ওপর টানিয়া ছিঁড়িতে আহত দাঁতের শক্তিতে আর কুলায় না—ক্রমে এক-একটা শক্ত টুকরাও বাহির হইতে লাগিল, কষা, মনে হয় যেন কিছুর বিচি—ময়দার সাহচর্যে সে যে বিচ নিশ্চয় বুঝিতে বাকি রহিল না কাহারও। ঘাড় নিচু হইয়া আসিয়াছে সবার। এদিকে তরকারি মুখে তোলা যায় না, তিসি এবং বোধ হয় তাহার চেয়েও কোন অপাঙ্‌ক্তেয় তৈলের দুর্গন্ধ। মাছের আরও দুরবস্থা, মাংসের আবার ততোধিক।

ময়লা তেল, তাহাও পর্যাপ্ত নয়; আলোগুলা একসঙ্গে এবং দ্রুত নিভিয়া আসিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি চার-পাঁচটা সাধারণ লান্‌ঠেন্ আনিয়া সেগুলার স্থানে বসানো হইল। অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলার শিখা সুপ্রচুর ধূমের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া বাঁচিল। এদিকে পতিতপাবন একটি জীর্ণ আধময়লা আঙরাখা আর একটি সংক্ষিপ্ত বস্ত্র পরিয়া হাতজোড় করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অনুরোধের দ্বারা সবাইকে আহারে উৎসাহিত করিয়া। এটাও গঙ্গাধরেরই ব্যবস্থা, বলিয়াছিলেন—"ও কি পতিতপাবন, আজ কখনো ভালো জামা প'রে বেরোয় ? মনে করবে—দেখেছ, ব্যাটা হরিজনের টাকা হয়েছে, ভদ্র সেজে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে—টাকা হওয়া না হওয়া আবার ওদেরই হাতে কিনা—"

যাহারা পরিবেশন করিতেছে তাহাদের পরিধেয়েরও ঐ অবস্থা, যাহারা আশেপাশে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, তাহাদেরও। ঘটে বুদ্ধি নাই এমন তো নয়, কিছু একটা চক্রান্ত যে আছে কোথাও সেটা বোধ হয় উনারভোজীদের অনেকেই আঁচ করিয়াছে, লুচি পোলাও কোন রকমে ডিঙাইয়া মিষ্টান্নে গিয়া পড়িল,—রসমুণ্ডির মতো ছোট ছোট সন্দেশ, তাহার বোধ হয় পনের আনাই চালের পিটুলি, চিনি নাই বলিলেই চলে। রসগোল্লা কিসের বোঝা যায় না, মনে হয় এর মধ্যেও তেঁতুলের বিচির অধিষ্ঠান হইয়াছে, অমন জলের মতো পাতলা রস, তাহারও এতটুকু প্রবেশাধিকার নাই।

গঙ্গাধরও করজোড়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আহারে উৎসাহিত করিতেছেন, বলিতেছেন—"আপনাদের হাত না চললে অপযশটা আমারই হবে, পতিতপাবন তো নিমিত্ত মাত্র—সমস্তদিন খেটেখুটে আমিই কোন রকমে এইটুকু দাঁড় করিয়েছি—নেহাতই বিদুরের আয়োজন"

অমরেশ মাথা তুলিতে পারিতেছে না।

দৈবও প্রতিকূলতা করিল, পাতলা একটু মেঘ করিয়া আসিয়াছিল, মন্থর ধারায় বৃষ্টি নামিল।

প্রতিকূলতা, না আনুকূল্যই ?—সবাই উঠিয়া বাঁচিল।

পরদিন সকালে পতিতপাবন বিষণ্ণভাবে আসিয়া পায়ের ধূলা লইয়া নিজের জায়গাটিতে বসিল। বলিল—"বাবাঠাকুর, এ কি হোল ?"

পূতচরিত্র পুরুষ, চিরকাল ভালোই করিয়াছেন ওর, আজ পতিতপাবনের যা কিছু প্রতিষ্ঠা সব গঙ্গাধরেরই জন্য। শিক্ষা দিবার এতবড় সুযোগটাকে প্রাণ ধরিয়া আর হাতছাড়া করিতে পারেন নাই, তবু মনটা খুব ব্যথিত বৈ কি।

বলিলেন—"সমস্তদিন ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছে, পেট কাঁদবেই, তবু এটুকু দরকার

ছিল মোড়লের পো, তা আমি ঘুরে ঘুরে সবাইকে বলেই দিয়েছি এ আমার কীর্তি। যত কিছুই হোক, সবার বুদ্ধি আছে তো—তোমার ঘাড়ে দোষ চাপাবে না।—আর অমরেশের কথা বলছ ?—"

একটা স্নেহের গালাগাল দিয়া বলিলেন—"ওরও একটু শিক্ষা দরকার ছিল পতিতপাবন, বড্ড ও ওগুলোর দলে ভিড়ে গেছে। তা ওর কিছু অপকার করতে পারবে না জেনে রেখো। উপায় নেই যে করবার সে খোঁজটা রাখি বলেই এটা করলাম। বরং ও যে একদিন মিনিস্টার হবেই একজন, এই ধাক্কায় তার জন্যে ভালো করে তোয়ের হয়ে রইল। মনে কোরো এটা ওকে আমার আশীর্বাদই।"

মিনুর স্বপ্ন

মা বলিয়াছে আজ রাত্রে খাওয়া বন্ধ। বকুনি আর তাহার উপর উত্তম-মধ্যম একপ্রস্থ যা হইয়াছে তাহাতে মিনুর স্পৃহাও নাই আহারে। বাড়ির মধ্যে একটু যা আদর তা এক বাবার কাছে। তাস খেলিয়া কখন যে ফিরিবে !—ততক্ষণ কি এত দুঃখ-কষ্ট লইয়া বাঁচিবে মিনু ? বেশ হয় যদি না বাঁচে—বাবা আসিয়া মাকে বলে—আহা, এমন করে মারলে মেয়েটাকে যে শেষে—

চোখের কোণ দিয়া বালিশের ওপর অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তাহার শ্লেটের লেখা যেমন মুছিয়া যায়, মিনুর মনে হইল সেই চোখের জলে এদিককার সব আস্তে আস্তে ধুইয়া মুছিয়া গেল।—মিনু দেখিতেছে একটি যেন প্রকাণ্ড বাড়ি, তাহার সামনেটা অনেকটা রায়-চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপের মতো—

কিন্তু স্বপ্নের কথা পরে হইবে, আগে এত নির্যাতনটা কিসের জন্য সেই কাহিনীটাই বলা যাক।—

আজ ছিল লক্ষ্মীপূজা। একেবারে শেষরাত্রে মা উঠিয়া শাঁখ বাজাইয়া যখন জলপিঁড়া স্থাপন করিল, মিনুর ঘুমটাও গেল ভাঙিয়া। বাহিরে আসিয়া রকের ওপর দাঁড়াইল, এই সময় নাকি মা-লক্ষ্মী তাঁহার স্বর্গের বাড়ি থেকে নামিয়া আসেন।

সামনের আকাশটায় একটু একটু আলো, আর ঠিক সেই আলোর ওপরটায় দপদপে তারার মতো কি। মিনু মাকে জিজ্ঞাসা করিল—"ঐ নাকি মা-লক্ষ্মীর রথ মা ?"

মা বলিল—"হ্যাঁ, রথ। তুমি কিন্তু ঘুমাওগে, ঠাণ্ডা লেগে যাবে এত ভোরে।"

মিনু দাঁড়াইয়া রহিল, দেখিবে ওঁর আসাটা।—সত্যই তো, রথটা আস্তে আস্তে যেন নামিয়া আসিতেছে, আর সত্যই তো, নিচের আকাশটায় আরও আলো, তাহার পর আরও আলো, তাহার পর আরও—একেবারে নিচে মেঘের টুকরার মতো ছোট ছোট সিঁড়িগুলি ঐ রাঙা হইয়া উঠিল—সোনার জলের ছড়া পড়িয়াছে। মিনু আজ দেখিবে, নিশ্চয় দেখিবে, ওই সিঁড়ি দিয়া নামিয়াই ঠাকুর মিনুদের চৌকাঠে পায়ের আলপনার ওপর তাঁহার আলতাপরা রাঙা পা দুটি রাখিবেন, তাহার পর আলপনায় পা দিয়া পূজার ঘরে আসিয়া উঠিবেন।

মা কাজের মধ্যে চঞ্চলভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শাঁখটা ধুইয়া ঘরে রাখিয়া আসিল, দোরে দোরে জলছড়া দিল, তাহার পর বাড়ির ওদিকে কি একটা কাজে চলিয়া গেল।

আকাশের সিঁড়ি একেবারে সোনা হইয়া উঠিয়াছে, বোধ হয় মা-লক্ষ্মী দিলেন পা। হয় কিনা সোনা, মায়ের কাছে শোনে নাই গল্প মিনু ?—মা অন্নপূর্ণার পা ঠেকিয়া নৌকার কাঠের সেঁউতি সোনা হইয়া গিয়াছিল।

মা আসিয়া বলিল—"ওমা, তুই এখনও দাঁড়িয়ে! শুতে বললাম না গিয়ে ? ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে।"

"আমি দেখব আজ, হ্যাঁ মা, লক্ষ্মীটি !"

মা একটু বিব্রত হইয়া বলিল—"না, যাও ঠাণ্ডা লাগবে, নোতুন ঠাণ্ডা পড়েছে।—আর, কেউ চেয়ে থাকলে কি দেন দেখা ? টের পেলেই মিলিয়ে যান।"

"যতক্ষণ না টের পান দেখব মা।—হ্যাঁ, ঠাকুর দেখলে লাগতে পারে নাকি ঠাণ্ডা ?"

মা মেয়ের রোগ জানে, একটু ভাবিল, বলিল—"তবে থাকো, আমার কি, করলে অসুখ পেসাদ খেতে পাবে না।"—মা চলিয়া গেল।

তবুও খানিকটা দাঁড়াইয়াই রহিল মিনু, ঠাকুরকে দেখাটা ভালো কি প্রসাদ খাওযাটা, ঠিক করিতে পারিতেছে না।—এদিকে আকাশের সোনা আরও জ্বলজ্বলে হইযা উঠিতেছে, এদিকে প্রসাদ—আগে নৈবেদ্য,—শশা, কলা, খেজুর, নারকেলনাড়ু, ক্ষীরের নাড়ু। তাহার পর ভোগ, মুগের ডালের খিচুড়ি, যত রকম তরকারি হইতে হয, কত রকম ভাজা, তাহার পর পায়েস, পিঠা, দই, অমৃতি--

আকাশে সোনার পানে একবার চোখ দুইটা তুলিযা মিনু মুখটি চুন কবিযা আবাব বিছানায গিযা উঠিল।

২

যখন ঘুম ভাঙিল তখন অনেকক্ষণ মা-লক্ষ্মী আসিযা গেছেন। দাদা একাই ফুল তুলিযা আনিযাছে, বড়দিদি স্নান সারিযা চুলে গেরো দিযা চন্দন ঘষিতেছে রান্নাঘরে মাযের ভোগ রান্নাও অর্ধেক শেষ। এবার যেন কি হইযা গেল, ওদিকে মা-লক্ষ্মীর আসাও দেখা গেল না, এদিকে পূজারও গেল অনেকখানি বাদ পড়িযা, না হইল ফুল-দূর্বা তোলা, না হইল চন্দন ঘষা। মুখটা ভার করিযা মিনু কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিযা বেড়াইল। কাহার ওপর যে রাগ করিবে বুঝিতেছে না।

একবার দাদার সামনে পড়িযা যাইতে প্রশ্ন করিল—"তুই এখনও চান করিস নি মিনু ? ফুল তুলতেও গেলি নি আমার সঙ্গে—"

"এই তো উঠলাম।"

"কেন রে ? পূজোর দিন এত দেরি করে ? অসুখ-বিসুখ কবে নি তো ? দেখি তোর গা !"

মিনুর বুকটা ছাঁৎ করিযা উঠিল। কিন্তু এই সমথ দাদাকে বাহির হইতে কে ডাকায দাদা চলিযা গেল। আর নয়, একটা যেন ফাঁড়া কাটিয়া গেল। অসুখ কি করিয়া করে, মিনুর মনে নাই। তবে এটা দেখিয়াছে যখনই কেহ অসুখ করিয়াছে কিনা দেখিবার জন্য গায়ে হাত দিয়াছে, তখনই বেশি না লইলেও একটু অসুখ কেমন করিয়া যেন পড়িয়াই

গেছে ধরা। মিনুর মনে হয় ওটা যেন ক্ষিদে পাওয়ার মতো, হাজার খাইলেও কোথায় যেন একটু থাকেই লাগিয়া। দাদা তবুও রাত থাকিতে ওঠার কথাটা জানে না, মা যদি আবার এই কথা বলে তাহা হইলে সর্বনাশ।

মিনু আর রাগ পুষিয়া না রাখিয়া তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া লইল। তাহার পরই পুরুত ঠাকুর আসিলেন, শাঁখ ঘণ্টা ধূপ-ধূনার সঙ্গে পূজার মধ্যে মনের খেদটুকু কাটিয়া গেল মিনুর। যেটুকু বা রহিল, নৈবেদ্যর সঙ্গে কোথায় তলাইয়া গেল। তাহার পরেও ছিটেফোঁটা যেটুকু বাকি থাকিল, ভোগের সঙ্গে। মা-লক্ষ্মীর প্রসাদ হয় বড় ভালো, মা দৃষ্টি দিয়া উচ্ছিষ্ট করিয়া দেন কিনা! পায়েসটি আবার এমন চমৎকার হইয়াছিল, মিনুর মনে হয় মাও নিশ্চয় একেবারে দৃষ্টি সরাইতে পারেন নাই ও-থেকে।

আজ স্কুল যাওয়া নাই, নৈবেদ্য-ভোগে শরীরটা একটু ভারী করিয়া দিয়াছিল, মিনু একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। যখন উঠিল দেখে আর সবাইও নিজের নিজের ঘরে ফোঁস ফোঁস করিয়া ঘুমাইতেছে- কাল থেকে বেশ একচোট মেহনত গেছে তো। শুধু মা রান্নাঘরে। চমৎকার একটি গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। ক্ষীর যখন তৈয়ার হয়, একটু একটু সাদা ধোঁয়া উঠিতে থাকে, সেই সময়ের গন্ধ। মিনু আস্তে আস্তে গিয়া চৌকাঠের ওদিকে দোরে পিঠ দিয়া বসিল, মিনি-বেড়ালটা অন্য পাল্লাটার গা ঘেঁষাইয়া বসিয়া ছিল, সেটাকে নিজের কোলে টানিয়া লইল মিনু। মা একবার দেখিয়া লইয়া একটু হাসিল।

মিনু জিজ্ঞাসা করিল--"হাসছ কেন মা?"

"দুটি হ্যাংলাকে একসঙ্গে দেখছি, পাবে না একটু হাসি?--না, মা-লক্ষ্মীর শেতলের ক্ষীর, ও সব মনে করতে নেই। এক্ষুনি উঠে এলি যে?"

"আর কত ঘুমুব, মেয়েদের অত আছে ঘুমোতে?-শেতলে খালি বুঝি খান মা লক্ষ্মী, মা?"

কাজের মধ্যে গল্পের দোসর পাইয়া মায়ের বোধ হয় একটু ভালোই লাগে। মনটি আজ সেবায়, পূজায়, ভক্তিরসে টলমল করিতেছে, ভালো লাগে ঠাকুরকে লইয়া একটু আবদার-অনুযোগের কথা কহিতে, বলিল হ্যাঁ, ঐ শুকনো ক্ষীরের সন্দেশ করে দোব, নট-ক্ষীর রইল এক বাটি, নারকেলনাড়ু আর খানকতক চন্দ্রপুলি আছে। খান তো ভারী, শুধু খেটেই মরা। তেমন ভাগ্যি করেছি যে খাবেন মা!"

একটি কালো পাথরের রেকাবিতে টাটকা শুকনো ক্ষীর তাল করা রহিয়াছে, কড়ায় নট-ক্ষীরের সাদা সাদা ধুঁয়া উঠিয়া মিলাইয়া যাইতেছে। বাহিরে থেকে যে গন্ধটা পাইয়াছিল, সেটা সমস্ত ঘরটিতে যেন বোঝাই হইয়া রহিয়াছে।- মিনুর মনের একেবারে কোথায় একটু মনে হইতেছে ভাগ্যিস মা-লক্ষ্মী খান না?- কিন্তু সে-কথা ভাবিতে নাই। মিনু মায়ের মতনই একটু নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল--"তেমন ভাগ্যি হলে বুঝি খান মা?"

"খান না? আমার বাপের বাড়িতেই তো একবার খেয়েছিলেন, অবিশ্যি সে অনেক দিনের কথা, আমার ঠাকুমার শাশুড়ীর আমলে। কোথাই বা আমরা সেরকম ভক্তি পাব, কোথাই বা সে নিষ্ঠে?"

গল্প করিতে করিতে ওদিকে ক্ষীর হইয়া গেল। কড়াটা নামাইয়া একটি ছোট আর একটি বড় পাথর বাটিতে ঢালিয়া রাখিল; বলিল- "যাই, এবার রেখে দিগে পূজোর ঘরে।"

বেশ লাগিতেছিল দেখিতে। মিনু প্রশ্ন করিল--"ক্ষীরের নাড়ু পাকালে না মা?"

"না মা, এখন আর পাচ্ছি না, কোমর পিঠ টন্ টন্ করছে। একটু গড়িয়ে নিগে। উঠি তখন টপটপ করে ছাঁচে বসিয়ে তুলে নোব।—চল্ দিকিন্, পারবি একটু কোমরটা টিপে দিতে ?"

পূজার ঘরে সব তুলিয়া রাখিয়া শিকল তুলিয়া দিয়া ওদিককার বারান্দার মেঝের ওপর মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িল। মিনুর হাত খুব মিষ্ট, একটুর মধ্যেই ঘুম আসিয়া গেল।

৩

ঠাকুরের প্রসাদের এটা একটি দোষই হোক বা গুণই হোক—বড শীঘ্র হজম হইযা যায়, আর কাহারও হয় কিনা জানে না মিনু, কিন্তু মিনুর তো হয়, অন্তত আজ যে হইয়াছে এ তো স্পষ্ট দেখিতেছে। মনে অবশ্য না ভাবিবার প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে মিনু, কিন্তু নাক তো মন নয়, সেখানে ক্ষীরেব গন্ধটি যদি লাগিয়া থাকে, কি করে বেচারী ?

কোমর পিঠ টিপিযা দিতে মা যখন ঘুমাইয়া পড়িল, মিনু উঠিয়া বাহিরে আসিল। সব ঘরে সবাই তখনও ঘুমাইতেছে, একটু ভিতরে গিযা এ-ঘর ও-ঘর করিল, এমন যদি কিছু একটু পাওয়া যায় যাহাতে ক্ষুধাটা মেটে, অন্তত নাকেব গন্ধটা যায ! ওটাও থাকিতে নাই কিনা, মা-লক্ষ্মীর শেতলের জিনিস। কোন ঘরে কিছু নাই, শুধু বডদির ঘরে একটা বিস্কুটের টিন, খোকা যখন অবদার ধবে, দুটি একটি করিযা দিযা ভোলায দিদি। আলমারীতেই রোজ থাকে টিনটা, আজ কি করিযা টেবিলের ওপরেই থাকিযা গেছে।

বিছানার ওপর দিদি ওদিকে মুখ করিযা খোকাকে লইযা ঘুমাইতেছে। মিনু চুপ করিয়া একটা আঙুল কামডাইয়া দাঁডাইযা বহিল। ছোট বোনপোকে নিজের ভাগ থেকেই দিতে হয, তাহার জিনিস খাইতে নাই। মাও বলে, দিদিও পিঠে হাত বুলাইযা, আদব করিয়া বলে—"লক্ষ্মীটি, তুই মাসী হোস মীনু, খাস নি ওর বিস্কুট, ভালো বিস্কুট একে যায না পাওযা পযসা দিযেও।"—দিদি দেযও, নিজের হাতে যাহাতে নিজে লইযা না খায মিনু।

মিনু অনেকক্ষণ দাঁডাইযা রহিল, তারপর হঠাৎ মনে পডিল—কিন্তু নাক থেকে ক্ষীরের গন্ধ যে সরাইতে হইবে, ওটা বোনপোর জিনিস খাওয়ার চেযে বড পাপ নয ? এই কথাটুকু মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিনুর মনের খুঁৎখুঁতুনিটা কাটিয়া গেল, মিনুর মনে হইল মা-লক্ষ্মীই দিলেন কাটাইযা, তিনি তো কাহাকেও দিয়া পাপ করাইতে চান না।

মিনু আগে দুইটা লইল, তারপর আরও দুইটা, তারপর আরও দুইটা লইবে কিনা ভাবিতেছে, খোকা নডিয়া উঠিল। মিনু কাঠ হইয়া সেই দিকে চাহিযা দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর দিদি ঘুমের ঘোরেই তাহাকে ঠুকিয়া ঠুকিযা আবার ঘুম পাড়াইযা দিলে পা টিপিযা টিপিয়া চারিটা বিস্কুট লইযা বাহির হইয়া গেল।

বিস্কুটের আবার একটা রোগ, কুট কুট করিয়া শব্দ হইবে। মিনু একেবারে উঠানের ওদিকে চলিয়া গেল ; ওদিকে রান্নাঘর, ভাঁড়াবঘর, তারপর খিডকিব পুকুরের দিকে যাওযার গলিটার পরে ঠাকুরঘর।

মনে হইতেছে নাকে আর ক্ষীরের গন্ধটা নাই, বিস্কুটের গন্ধটা তাডাইয়া দিযাছে ; কিন্তু খিদেটা যে আরও বাড়িয়া গেল। খিদের ওপর কম জিনিস খাইলে এটা হয়ই ; মিনুর মনে ছিল না। পরশু রাযচৌধুরীদের বাডি নেমন্তন্ন গিয়া প্রথমে একটু শাকভাজা আর

লুচি খাইয়া নিজেকে যেন আর সামলাইতে পারা যায় নাই। মনে ছিল না মিনুর, তাহা হইলে কি আর খায় বিস্কুট দুটি!

এই সময় আব একটা কাণ্ড হইল, মিনুর মনে হইল ক্ষীরের গন্ধটা হঠাৎ আবার যেন নাকে ফিরিয়া আসিতেছে। রান্নাঘরের সামনে দাঁড়াইয়াছিল মিনু, মনে হইল—দেখি তো গন্ধটা নাকেই, কি পূজার ঘর থেকে আসিতেছে—

দরজাব ফাঁকে নাক দিয়া ঠিক বোঝা গেল না। তাহা হইলে করা যায় কি এখন? বিস্কুটেও যায় না এমন পাপ কি করিয়া সরায় মিনু নাকের মধ্যে থেকে?

ইহার পরেই সব যেন কি করিয়া একসঙ্গে হুড়মুড় করিয়া হইয়া গেল, একেবারে উল্টা কাণ্ড—কি করিয়া যে হইল মিনু এখন পর্যন্ত বুঝিযা উঠিতে পারে না,—তাড়াতাড়ি উঠানের ওপার থেকে তেপাইটা আনিয়া পূজার ঘরের শিকলটা খুলিয়া ফেলিল মিনু। একটু ভাবিল, তাহার পর তেপাইটার ওপর উঠিয়াই একটা নাড়ু মুখে গুঁজিয়া দিল এবং সেটা ভালো করিয়া গলার নিচে যাইবার আগেই ক্ষীরের ছোট বাটিটা নামাইয়া একেবারে চোঁ চোঁ করিয়া চুমুক দিয়া বসিল; তারপর যখন আর একটু নাই, বাটিটা নামাইয়া দিযা ফ্যালফ্যাল করিয়া সেই খালি বাটিটার পানে চাহিযা ভয়ে আড়ষ্ট হইযা দাঁড়াইযা রহিল।

এর পরের যা ঘটনা সে সম্বন্ধে গোড়াতেই বলা হইয়াছে।

মিনু সামলাইয়া লইয়াছিল, এমন কি মা-লক্ষ্মী যখন খানই—মার ঠাকুরমাব শাশুড়ীর সময় একবার খাইয়াছিলেন—তখন একখানা বিস্কুটও পূজার চৌকির সামনে ভাঙিযা ছড়াইযা ও চারখানাও তাঁহার ঘাড়ে চাপাইবাব ব্যবস্থা কবিযাছিল মিনু; কিন্তু টিকিল না কিছুই।

মিনু স্বপ্ন দেখিতেছে—যেন একটা প্রকাণ্ড বাড়ি—তাহার সামনেটা অনেকটা বায-চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপের মত। বড বড থাম, আলোয আলোয ঝলমল করিতেছে, আব সেই বাড়িতে মা-দুর্গা! ঘুরিযা ঘুরিয়া কত কি কাজ করিযা বেড়াইতেছেন; ওদিকে কার্তিক, এদিকে গণেশ, আলিপুরের চিড়িযাখানার মত ওদিককাব একটা দরজা দিযা সিংহ আসিযা মা-দুর্গার কাছে ঘেঁষিযা দাঁড়াইল। এমন সময বাহিবে কোথা হইতে সিঁড়ি দিযা একটা মেযে উঠিযা আসিল, রেশমেব জমজমে শাড়ি পরা, গাযে এক গা গয়না, মাথায মুকুট, বাঁ হাতে একটা ঝাঁপি—লক্ষ্মীব ছবিতে যেমন দেখিযাছে মিনু।

লক্ষ্মীই।

"এই যে, লক্ষ্মী এসেছিস?"—বলিযা মা-দুর্গা তাড়াতাড়ি হাতের কাজ ফেলিযা আগাইয়া গেলেন।

লক্ষ্মীর কিন্তু চোখে আঁচল। মা-দুর্গা কাছে যাইতেই ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন—"এমন বাড়িতে পূজো নিতে পাঠিয়েছিলে মা, শেযে চোর অপবাদ নিযে আসতে হোল—ক্ষীর চুরি, নাড়ু চুরি, তার ওপব বিস্কুট পর্যন্ত চুরি!"—

চাকরি

রামধনবাবু বেশ একটু অসহিষ্ণু কণ্ঠেই উত্তর করিলেন—"একে আমি চাকরি বলি না স্যার, আমার পেন্সনের সময় হয়েছে, তাহলে রিটায়ার করিয়ে দিন।"

এই অসহিষ্ণুতার একটু ইতিহাস আছে, আগে না হয় সেইটুকু বলিয়া লই।

আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর রামধনবাবু এই অফিসে চাকরি করিয়া আসিতেছেন। তাহার মধ্যে ওদিককার ষোল বৎসরের কথা বাদ দিলে, বড়বাবুগিরিই হইল আজ চৌদ্দ বৎসর, অর্থাৎ সাহেবের একেবারে শ্যেনদৃষ্টির নিচে থাকিয়া এত বড় অফিসটাকে চালানো, আর কপালে সাহেবও জুটিয়াছিল একেবারে বাছা বাছা।

প্রথমেই পড়িতে হইল ম্যাকডোনাল্ডের হাতে। খাঁটি স্কচ। রাঙা টকটকে হাঁড়িপানা মুখখানা, এক বর্ণ কথা বুঝিতে পারা যায় না, মনে হয় সমস্ত মুখটায় শুধু কতকগুলো জিভ আছে, নাড়াচাড়া করিয়া একটা হুসহাস শব্দ করিতেছে! নিতান্তই দু'চারটা কথা যাহা বোঝা যাইত, তাহা না বোঝা গেলেই ছিল ভাল। ম্যাকডোনাল্ডের বাপ ছেঁড়া জুতা সেলাই করিত, সেই উত্তরাধিকারে ম্যাকডোনাল্ডের গালাগালটা খুব রপ্ত ছিল, ছোট বড় নির্বিশেষে অফিসের সবাইকে বিতরণ করিত, একটু চটিলেই যেমন পিয়ন, তেমনি বড়বাবু। একটুও কখনও ঠাণ্ডা থাকিতে শেখে নাই বলিয়া অনর্গল স্রোতে অভ্যাসটা থাকিয়া গিয়াছিল—ড্যাম-সোয়াইন, ব্লাডি, স্কাউন্ড্রেল—আরও কতকগুলা ছিল, বেশ অস্পষ্ট কিন্তু অর্থগৌরবে আরও উঁচু—সেগুলা ওরা হোমেই চালায়, ইণ্ডিয়ায় বড় একটা ছাড়ে না।

প্রথম যেদিন বড়বাবুর পদে উন্নীত হইলেন, সাহেব ঠিক এগারটার সময় ডাকিয়া পাঠাইল, সাড়ে দশটায় অফিস।

উপস্থিত হইতে চেয়ারটা ঘুরাইয়া কটা কটা কুৎকুতে চোখ দুইটা মুখের উপর রাখিয়া গড়গড় করিয়া একরাশ কি বলিয়া গেল। রামধনের এখনও যেন চোখের সামনে ভাসিতেছে, আওয়াজটাও যেন কানে লাগিয়া আছে—একটা টানা হুসহাস ফস-ফস শব্দ—একটা গালাগাল বোঝা গেল, তাহার মধ্যে আর এই রকম একটা প্রশ্ন যে, রামধন এতক্ষণ সাহেবের সামনে আসেন নাই কেন? এটাও যে বুঝিলেন তাহা আন্দাজেই, কেননা আফিসে আসিয়াই সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া যাওয়া নিয়ম, কিন্তু ভয়ে পা উঠিতেছিল না বলিয়াই সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে তাঁহার দ্বারা; ও প্রশ্নটা যে উঠিবেই কতকটা জানা ছিল।

সাহেবের একেবারে মুখোমুখি হইয়া এই প্রথম কথা। এর আগে যখন সেকেণ্ড ক্লার্ক, কোন কাগজপত্র লইয়া তখনকার বড়বাবুর পেছনে পেছনে আসিয়া সাহেবের টেবিলের কাছে আড়াল হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, ব্লাডি-স্কাউণ্ড্রেলের সঙ্গী হিসাবে এক-আধটা গালাগাল তাঁহার গায়েও ছিটকাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এরকম একা দাঁড়াইয়া সব মহড়াটা বুক পাতিয়া লইতে হয় নাই। ওরকম সাহেবের অধীনে এরকম আফিসে যাহারা কাজ করে, তাহাদের সর্বদাই সবরকম জবাবদিহি গড়া থাকে, বিলম্বের জন্য রামধনবাবুও একটা ঠিক করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সাহেবরা রাগী হয় কিন্তু চালাক হয় না, বলিয়া দিলে বোধ হয় কাজ হইত, কিন্তু মুখ দিয়া একটি কথা বাহির হইল না। আর কি বলিয়াছে—একটি গালাগাল

ছাড়া আর এক বর্ণ বোঝেন নাই, "ভেরি গুড স্যার"—বলিয়া চারটি ঘন ঘন সেলাম ঠুকিয়া চলিয়া আসিলেন।

কেশিয়ার জয়হরিবাবু টেবিলের অন্য দিকে দাঁড়াইয়াছিলেন। বৃদ্ধ লোক, আফিসের ঠাকুরদা, তা ভিন্ন এই সাহেবের কাছেই দুই বছর কাজ করিয়াছেন, কি বলে অনেকটা আঁচ পান, অফিস থেকে দেরি করিয়াই ফিরিয়া রামধনবাবু সোজা তাঁহার বাসায় গেলেন। খুবই চিন্তিত আর বিষণ্ণ, বলিলেন—"এ ব্যাটার আণ্ডারে তো মান-ইজ্জৎ নিয়ে কাজ করা চলবে না মশাই ; কি অর্ডার দিলে, কি বললে কিছুই বুঝতে পারলাম না, একেবারে অত তেরিয়া হয়ে উঠলে কি মানুষের সাড থাকে, বোঝবাব দিকে মন থাকে ? তাই ভাবলাম ঠাকুরদার কাছে যাই। আপনি তো শুনলেন, কি কি হুকুম করলে বলুন দেকিন, আটটাব সময় আফিস গিয়ে তামিল করে বাখি।"

জয়হরিবাবু বলিলেন—"কাল থেকে ঠিক সাড়ে দশটার সময় গিয়ে হাজরি দেবেন বেটার কাছে, দবকাবী কাগজপত্রগুলো নিয়ে।"

"সেটা বুঝেছি, একেবারে যে না বুঝি এমন নয় তো। তাবপবে কি ফস্-ফস্ করে বলে গেল ধরতে পাবলাম না।"

"আর যা বললে সে ধর্তব্যের মধ্যে নয়—আপনি বাড়ি যান, মুখ হাত পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হোন গে।"

সন্দেহটা বাড়িয়া যাইতে রামধনবাবু আরও ধরিয়া পড়িলেন, শুনিলেন সাহেব বলিয়াছে, বড়বাবুর পদের জন্য তাঁহাকে সুপারিশ করিয়া সাহেবের অনুতাপ হইয়াছে, বলিয়াছে, পরের মেলেই তাঁহাকে একেবারে অফিস থেকে বরখাস্ত করিবার জন্য লণ্ডন অফিসে লিখিয়া পাঠাইবে।

সেই দুঁদে স্কচের কাছে ঝাড়া পাঁচটি বছর কাটাইলেন। যাইবার সময় নিজের ঘড়িটা হাতে দিয়া বলিল—"Her's something to remember me Babu."

ঘড়িটি নারায়ণশিলার মতো করিয়া সযত্নে তোলা আছে। ছেলে, নাতি, নাতকুড়—সবাই বুঝিবে রামধন লোকটা কে ছিলেন।

২

ইহার পর আসিল হিল্টন। এক নম্বর হারামজাদা, খাঁটি ইংরেজ বেনে, তাহার মূলমন্ত্র হইল খরচ কমানো, আয় বাড়ানো। একটু এদিক-ওদিক দেখে, আর খট করিয়া ডিসমিস। আড়াইশত কেরানী, মাস চারেকের মধ্যে প্রায় শ'দুইয়ে আসিয়া ঠেকিল। কাহার ঘাড়ে যে কোপ পড়িবে কেহ জানে না, অফিসে ত্রাহি ত্রাহি ডাক পড়িয়া গেল। নিতান্ত যখন অচল অবস্থা, রামধনকে গিয়া বলিতে হইল।

হিল্টনের অন্য পদ্ধতি, একটু সামনের দিকে মাথাটা ঝুঁকাইয়া একটি একটি করিয়া খুব স্পষ্টভাবে কথা বলে—চোখের ওপর এমনভাবে চোখ পাতিয়া চাহিয়া থাকে যে, মনে হয় সমস্ত শরীর যেন হিম হইয়া গেল। এদিকে কথাগুলাতে আবার একটু বিদ্রূপের ভাবও থাকে মেশানো।

বলিল—"আমার যতদূর স্মরণ হচ্ছে, তুমিই বোধ হয় এই অফিসের বরবাবু ?"

গলা শুকাইয়া গেছে, রামধন ঢোক গিলিয়া বলিলেন—"আমাকেই সে গৌরবের

অধিকারী করা হয়েছে হুজুর।"

"এত বড় ভুল কোম্পানি তার সমস্ত কেরিয়ারে আর করে নি। এটা পরের মেলেই লণ্ডন অফিসে লিখে তাদের জানিয়ে দোব আমি।"

চোখের ওপর সেই রকম খট্টাশের মত দৃষ্টি পাতিয়া চাহিয়া রহিল, প্যাণ্টালুনের মধ্যে রামধনের হাঁটু দুটো আস্তে আস্তে কাঁপিতেছে। একটু পরে সাহেবই প্রশ্ন করিল—"কতদিন বড়বাবু রয়েছ, অনুগ্রহ করে জানাবে কি?"

"আজ্ঞে পাঁচ বছরের কিছু বেশি।"

"পাঁচ বছর চার মাস তের দিন। কিছু বেশি মানে দু'দিন বেশিও হতে পারে। আমাব কাছে ফাঁকি চলবে না।"

"আমার মাসচারেক বলার উদ্দেশ্য ছিল, স্যার।"

"তোমার মিথ্যা কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল, তোমাদের প্রত্যেক ইণ্ডিয়ানের যা রোগ।"

মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলিয়া চাহিয়া রহিল। বোধ হয একেবারে নিজের ঘাড থেকে জাতের ঘাড়ে গিযা পডায একটু হাল্কা বোধ হইল, রামধন বলিলেন—"আমাদের ইণ্ডিয়ানদের ও দোষটা আছে স্যার একটু।"

"একটু নয়, যথেষ্ট।"

রামধন চুপ করিয়া থাকাই সমীচীন মনে করিলেন।

"আর যার হাতে যত দাযিত্বের কাজ, সে তত মিথ্যাবাদী।"

"উপরোউপরি দুইটা মন্তব্যে নিরুত্তর থাকিতে সাহস হইল না, বামধন বলিলেন,—"সেটা অস্বীকার করা যায না স্যার।"

"এখন কাজের কথায় আসা যাক—বোধ হয় আশা করতে পাবি লোক কমালে—অর্থাৎ বাজে বাবিশ ঝেঁটিযে বের করে দিলে অফিসের কাজ কি করে চালাতে হয, একটা প্রায ছয় বছরের অভিজ্ঞ বডবাবু সেটা জানবে?"

"কাজ আমি বার্কি দুশোর মধ্যে চারিয়ে দিযেছি স্যার, শুধু নিবেদন করতে এসেছি যে আর কমালে—"

সাহেব বাঁ হাত দিয়া থামিতে নির্দেশ করিযা ড্রয়ার থেকে একটা চিরকুট বাহির করিয়া সামনে রাখিল, বলিল—"এই আরও নযজনের নাম আমার নোট করা আছে, এরা যাবে। তুমি বডবাবু, তোমার প্রস্তাব আমার শোনা উচিত, সে হিসেবে আমি একজনের নাম বাদ দিচ্ছি।"

একবার তালিকাটার ওপর চোখ বুলাইয়া মাঝখানে একটা নাম কাটিয়া দিল, মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"এবাব বোধ হয় চালিযে নিতে পাববে?"

আরও আটজন লোক কম!—রামধন ফ্যালফ্যাল কবিয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

"পারবে না? তাহলে ওটাকে আবার ন'জনই করতে হোল বডবাবু।"

কাটা নামটার পাশে একটা নূতন নাম লিখিয়া চিরকুটটা সামনে সবাইয়া দিযা বলিল—"এই দেখে নাও।"—রামধন চোখের পাতা নামাইযা দেখিলেন, ইংরাজীতে লেখা রহিযাছে—রামধন স্যানিয়াল।

চোখ তুলিয়া দেখেন সাহেব মুখের পানে চাহিয়া আছে, ক্রূর-ব্যঙ্গে ঠোঁটেব কোণটা ঈষৎ কুঞ্চিত। ধীরে ধীরে একটু মাথাটাও দুলাইল, তাহার পর প্রশ্ন করিল—"খুব বিপদে

পড়লে, নয় কি ? তা আমি তোমার এই সঙ্কটে সাহায্য করতে পারি কি ?"

"সে তো আপনার অশেষ করুণা স্যার।"

হিল্টন আর একটা চিরকুট টানিয়া লইয়া খস খস করিয়া খানিকটা লিখিয়া দিয়া কাগজটা আবার সামনে ঠেলিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে চেয়ার ঠেলিয়া দিয়া র‍্যাক থেকে হ্যাট আর ছড়িটা লইয়া শিস্ দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল। রামধন পড়িলেন 'কোম্পানির দুঃসময় যাইতেছে, সেইহেতু দ্বিতীয় হুকুম না হওয়া পর্যন্ত অফিসের কার্যকাল এক ঘণ্টা বাড়াইয়া দেওয়া হইল। প্রয়োজন হইলে উর্ধ্বতন কর্মচারীরা আরও বেশিক্ষণ থাকিয়া কাজ সামলাইয়া লইবে।'

৩

অত বড় কুচুটে বদমাইস সাহেব আর আসে নাই অফিসে। তিন বৎসর পরে, প্রাণ যখন কণ্ঠাগত সবার, বিদায় লইল। তাহারও একটা নিদর্শন আছে বৈঠকখানায় ফ্রেমে বাঁধানো একটা ভালো সার্টিফিকেট, ভাবী বংশধরেরা বড় গলা করিয়া পরিচয় দিবে।

ইহার পর আসিল ও'কনোর, একজন আইরিশ। লোকটা আসিয়াই যেভাবে অফিসের সময়টা আবার কমাইয়া দিল তাহাতে একটু আশা হইল, বোধ হয় সুদিন আসিতেছে। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল ওটা করিয়াছে ওদের জাতিগত ইংরাজ-বিদ্বেষের জন্য, কর্মচারীদের প্রতি অনুকম্পায় নয়। ঐ যে হিল্টন ওটা করিয়া গেছে, সুতরাং ওর নাকচ করা চাই। হিল্টন যে অতগুলা কেরানীকে ছাড়াইয়া গেছে, তুই যেমন সময় কমাইয়া দিলি, তাহাদের ফিরাইয়া আন—সেদিক দিয়াও গেল না। এদিকে লণ্ডন অফিসকে ভয় আছে, তাহাদের কাজ চাই, নিজের কক্ষ ছাড়িয়া কেরানীদের ডেস্কে ডেস্কে ঘুরিয়া তাগাদা দিয়া যেন উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাহার নিজের কাজ গিয়া পড়িল রামধনবাবুর ঘাড়ে, রাত্রি পর্যন্ত বাতি জ্বালিয়া কাজ করিতে করিতে দম ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। ইহার পর খিঁচুনি বকুনি তো আছেই—ওটা সাদা চামড়ারই ধর্ম, স্কচ হোক, ইংরাজ হোক, আইরিশ হোক, ইতর-বিশেষ হয় না।

কি যে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াইত কিছুই বলা যায় না, তবে দিন দশেকের মধ্যে সবাইকে নাকানিচোবানি খাওয়াইয়া আফিসে ছোটখাটো একটি বিপ্লব বাধাইয়া ও'কনোর হঠাৎ একদিন হার্টফেল করিয়া মারা গেল। সমস্ত অফিসের লোক ওর কবরে গিয়া মালা দিয়া আসিল, অনেকে স্পষ্টই ব্যক্ত করিল মনের ভাবটা—"স্বচক্ষে দেখে আসি মশাই, বিশ্বাস নেই।"

ও'কনোরের পর আসিল ম্যাকনীল। লোকটা বর্ণশঙ্কর,—বাপ স্কচ, মা, কেহ বলিল আইরিশ, কেহ বলিল ইংরাজ। একটা সাহেবের মধ্যে যা দোষের কিছু হইতে পারে সবগুলা আছে ম্যাকনীলের রক্তের মধ্যে। গোঁয়ার, বগচটা, এদিকে কথা অত্যন্ত অস্পষ্ট অথচ হুকুম অনুযায়ী কাজ না হইয়া যদি একচুল এদিক ওদিক হয় তো দারুণ অনর্থ। ইহার উপর এক একদিন যখন বেহেড মাতাল হইয়া অফিসে প্রবেশ করে, কোন্ দিকে মতিগতি যাইবে, কি করিবে কিছুই বোঝা যায় না, সমস্ত আফিস সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে।

হয়তো রামধনবাবুকেই মদ খাইবার জন্য ধরিয়া পড়িল। মদের মুখেও ফিচলেমি যায় না, আরম্ভ করে খুব সূক্ষ্মভাবে। রামধন কাগজপত্র দস্তখত করাইতে গেছেন -অবশ্য

ডাকার পর-বোতল থেকে টমব্লারে মদ ঢালিয়া তাঁহার সামনে টেবিলের ওপর বসাইয়া দিয়া নিঃশব্দে মাথা গুঁজিয়া দস্তখৎ করিতে লাগিল। শেষ হইলে গেলাসটার দিকে একবার চাহিয়া লইয়া রামধনবাবুর মুখের পানে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দারুণ বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিল—"তুমি খাও নি, না সেটা শেষ করে আর এক গ্লাস ঢেলে নিয়েছ?—তাহলে হাত বাড়াও, শেকহ্যাণ্ড করি।" দুইদিকেই বিপদ, যে উত্তরটা আগে আসে মুখে সেইটাই দিয়া দেন—

"না, আমি খাই না, আপনি তো জানেন স্যার।"

"জানি!—তাহলে তোমায় অফার্ করব কেন এ-ভাবে অপমানিত হবার জন্যে?"—হঠাৎ রাগে টলমলে মাথাটা সোজা করিবার চেষ্টা করিয়া মুখের পানে চাহিয়া থাকে।

"তাহলে বোধ হয় জানতেন না স্যার।"

"বোধ হয়! বোধ হয় মানে কি?"

"তাহলে নিশ্চয় জানতেন না হুজুর?"

মাথাটা বোধ হয় এদিকে আর খেলে না, সাহেব টেবিলের ওপর দৃষ্টি নত করিয়া টলিতে থাকে, প্রশ্ন যোগাইতেছে না বলিয়া রাগে মুখটা ক্রমশ আরও রাঙা হইয়া উঠিতে থাকে, এক সময় প্রশ্ন করে—

"কেন খাও না? খাওয়াটা দোষ?"

সমস্ত গেলাসটা একচুমুকে নিঃশেষ করিয়া সেটা সশব্দে টেবিলে বসাইয়া মুখের পানে চায়, প্রশ্নটার পুনরুক্তি করে—"খাওয়াটা দোষ, না পাপ?"

"না, দোষ-পাপ মোটেই নয় হুজুর, সব বড় লোকেরাই যখন খান—"

"তাহলে?—আমি আশা করেছিলাম তুমি আমায় পাপী বলবে—বলতে সাহস করবে, আর তার জন্যে তোয়ের ছিলাম—"

টেবিলে এমন একটা ঘুষি মারে যে গেলাসটা পড়ে উল্টাইয়া।

বোতলটা বাঁ হাতে মুঠাইয়া, বুকটা টেবিলে চাপিয়া প্রশ্ন করে—"তাহলে?—আমি যা করি তা করবে না কেন?—এ অপমান কিসের জন্যে?—কিসের জন্যে?—আমি জানতে চাই, কিসের?"

নেহাৎ পরমায়ু আছে রামধনের, যোগাইয়া যায়—"ডাক্তারে বারণ করেছে স্যার, লিভারের দোষ আছে।"

সাহেবের দৃষ্টি হঠাৎ নরম হইয়া যায়, ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে। মদটা মাথায় চনচন করিয়া উঠিতেছে, একটা সমীচীন উত্তরের উপর কি করা উচিত মাথায় আসে না। টেবিলের উপর দৃষ্টি নত করিয়া আবার ভাবিতে থাকে।

একটা সুযোগ, রামধন সাহস সঞ্চয় করিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিতে যান—"কাগজগুলো তাহলে এখন নিয়ে যেতে—?"

"হ্যাঁ, খুব পার—যদি সাহস থাকে তো—!!"

উৎকট গর্জনের সঙ্গে চেয়ারটি পেছনে চার হাত ঠেলিয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়।

সব দিন দৃশ্যটা যে একই ধরণের হয় এমন নয়, তবে নাটকের পরিণামটা হয় প্রায় একই।

অফিসের যত কেরানী পা টিপিয়া টিপিয়া সাহেবের ঘরের দরজার বাহিরে ভিড় করিয়া কান পাতিয়া দাঁড়ায়। রামধনের কথাগুলা যত হয় যুক্তিপূর্ণ, উত্তরের অভাবে সাহেবের

মেজাজ তত যায় ভিতরে ভিতরে বিগড়াইয়া, তাহার পর যে কোন একটা সামান্য কথার ওপর যখন ঐভাবে আসবাবপত্র ছড়াইয়া গর্জাইয়া ওঠে, দোরের ওদিকে সেই ভিড় ছত্রভঙ্গ হইয়া যে যার নিজের জায়গা লক্ষ্য করিয়া ছোটে, চেয়ার ছিটকাইয়া পড়ে, টেবিল ওল্টাইয়া যায়, ফাইলগুলা ছত্রাকার, দোয়াত কালি কলমের কোন হিসাব নাই।

"হোয়াটস দ্যাট !"—বলিয়া সাহেব যখন দরজা ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়, সমস্ত অফিসটা যেন একটা পটে আঁকা ছবি,—কেহ চেয়ারটা কুড়াইয়া আনিতে আনিতে থামিয়া গেছে, কোথাও দুইজনে মিলিয়া টেবিলটা তুলিয়া দাঁড় করাইতে করাইতে—কেহ ফাইলের কাগজগুলো পাখার হাওয়ার মধ্যে একত্র করিবার চেষ্টা করিতেছিল, প্রস্তরবৎ নিশ্চল হইয়া গেছে, কেহ চেয়ারের অভাবে তাড়াতাড়ি টেবিলে বসিয়াই লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল, আর কলম চালাইতে পারিতেছে না।

টলিতে টলিতে খানিকক্ষণ ধরিয়া ব্যাপারটা দেখিয়া কখনও হয় তো হুঁস হয় সাহেবের ; কখনও আরও বেহুঁস হইয়া পড়ে। এই ধ্বংসস্তূপের ওপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, যেটুকু শৃঙ্খলা থাকে সেটুকু পর্যন্ত নষ্ট করিয়া নিজের কামরায় গিয়া গেলাসে দেয় ডুব।

ম্যাকনীলের অধীনেও দেড় বছর কাজ করেন রামধন। থাকি দুইটা মাসও নিশ্চয় করিতেন, কিন্তু একদিন ঐ রকম অভিনযেব মধ্যেই নিজের চেয়ারটাকে আছড়াইয়া আশ না মেটায়, বোধহয় নিজের টেবিলের পাযা লক্ষ্য করিয়া বুটসুদ্ধ প্রচণ্ড লাথি চালাইল, তাহার শেষের ঝোঁকটা পড়িল রামধনবাবুর বাঁ পাযের গুলফে। একটা ছোট গোছেব চাক্‌লা উঠিয়া গেল।

চৌদ্দ বৎসরের একটানা সুখের চাকরি, ডাযবিটিস অসুখ ধরিয়া গিয়াছিল, বামধন বিছানা লইলেন।

৪

গোড়াতেই যে সহিষ্ণু আলাপের উল্লেখ কবা হইয়াছে সেটা আট মাস পবের কথা। বামধন মাস ছয়েক ভুগিয়া, তাহার পর মাস দুযেক সুস্থ-সমর্থ হইয়া আবাব অফিসে জয়েন করিয়াছেন। নূতন ম্যানেজারের সঙ্গে কথাবার্তা হইতেছিল।

এই আট মাসে কিন্তু অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। দেশের শাসনভাব হাতফের হইয়া নিজেদের হাতে আসিযাছে। বিলাতী কোম্পানীগুলি টলটলাযমান, কোনবকমে গড়াইয়া গড়াইয়া ছোট মাঝারি সাইজের কতকগুলি ফার্ম শেষ পর্যন্ত ভারতীযদের হাতে নিজেদের স্বত্ব বিক্রয় করিযা এদেশ থেকে পাত্তাড়ি গুটাইল। রামধনবাবুদেব অফিস একজন বাঙালীর হাতে গিয়া পড়িয়াছে। পূর্ববঙ্গের এক বেশ বড পুরাতন জমিদারবংশ। স্বত্বাধিকারীর জ্যেষ্ঠপুত্র নিখিলেশ রায় ম্যানেজিং ডিরেক্টার। আজ তিন মাস হইতে কাজ চলিতেছে, রামধন সুস্থ হইয়া উঠিলে উহাদের অনুরোধে আবার নিজের চেযারে আসিযা বসিয়াছেন।

নিখিলেশের বয়স সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ এই রকম, অর্থাৎ চল্লিশের মধ্যেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো ছাত্র, এম-এতে অর্থনীতিশাস্ত্রে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

প্রথম যেদিন রামধন আবার কাজ শুরু করিলেন, নিখিলেশ অফিস হলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তদারক করিয়া বেড়াইতেছিলেন, একটু পরেই আসিয়া তাঁহার টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া

নমস্কার করিলেন।

এই প্রথম দেখা, চেনা নাই, রামধন প্রতিনমস্কার করিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি দরকার আপনার ?"

নিখিলেশ একটু হাসিয়া বলিলেন—"একটু আমার ঘরে আসুন দয়া করে।"

রামধন বুঝিলেন। সাহেবী যুগের অভ্যাসে একেবারে ধড়মড়িয়া বিশৃঙ্খলভাবে উঠিয়া যেমন-তেমন করিয়া জুতা পরিতে পরিতে পা বাড়াইলেন। নিখিলেশ বলিলেন—"আপনি ধীরেসুস্থে আসুন, অসুস্থই বলতে হবে তো এখনও, আমি এগুচ্ছি।"

ঘরটার চেহারা বদলাইয়াছে। আর সবের মধ্যে দেয়ালে একখানি গান্ধীজী আর একখানি নেতাজীর বড তৈলচিত্র ; যেখানে ম্যাকনীলের মদের বোতল থাকিত সেখানে টাটকা ফুলে ভরা একটা বড নীল কাচের ফুলদানি।

বডবাবু গিয়া উপস্থিত হইলে একটা চেয়ার দেখাইয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন এবং বসিলে আগে শরীবের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, সুকৌশলে রোগেব একেবারে গোডার কথাটা এডাইয়া তারপর আফিস সংক্রান্তও কিছু কথা হইল। রামধন উঠিবার সময বলিলেন- "এখন দিন-কতক আপনি সুবিধে মতোই যাওয়া-আসা করবেন, অসুস্থই বলতে হবে তো ; কাজ এক রকম চলে যাচ্ছে।"

—এক রকম নয, এত সুশৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ যে চলিতে পারে, আজ প্রায ত্রিশ বৎসবের অভিজ্ঞতাব মধ্যে সে ধাবণা কখনও গডিযা উঠিতে পারে নাই রামধনেব। ক্রমে ক্রমে বুঝিলেন, এই কযেক দিনেব মধ্যেই আফিসের সব কিছুই নিখিলেশের নখদর্পণে আসিযা গেছে। একে ভালো ছাত্র, তায নিজে অসম্ভব খাটেনও।

সবই ভালো, অখণ্ড শান্তিব মধ্যে কাজ, পুবাতন কর্মচাবী হিসাবে শ্রদ্ধা খাতির এত বেশি যে, মনে হয তিনিই যেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা আরো ওপরের কেহ ; তবুও যত দিন যাইতে লাগিল বামধন যেন ভিতবে ভিতরে অতিষ্ঠ হইযা উঠিতে লাগিলেন। কি কাবণ ? সেইটা অনুসন্ধান কবিতে গিয়া বামধনের নিজেব স্বভাবও বদলাইযা আসিতে লাগিল একটু একটু কবিযা।

নিজেব আফিসেও ঘুণ হইয়া আফিসটাকে নিজেব মুঠাব ম'' রাখিবার অভিসন্ধি আছে কি নিখিলেশেব ?—দেখা গেল একেবাবেই নয, সবাই নিজের নিজের আসন-অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত। কাজ হালকা কবিয়া লোক কমাইবার মতলব ? মোটেই নয, হিলটন যাহাদেব তাডাইযাছিল তাহাদের মধ্যে এতদিনেও যাহারা সুবিধা করিতে পারে নাই, তাহাদের ডাকিযা লওযা হইযাছে।—তা হোক, তবুও ভিতবের একটা অস্পষ্ট অশান্তিতে মনটা খুঁৎখুঁতে হইয়া উঠিল বামধনেব। এতদিন এত বিপদের মধ্যে যে রামধন সব কেরানীদের আগলাইযা আসিতেছিলেন সাধ্যমত, তিনিই যেন ধীবে ধীরে সবাব বৈরী হইযা উঠিতে লাগিলেন। একদিন দুইজন পুরাতন কেরানীর পুনর্নিযোগে অযথাই গিয়া মৃদু অনুযোগ করিলেন—"বেশ তো কাজ চলছিলই—এটা কোম্পানীর বাজে খরচের মধ্যেই পডবে তো ?"

নিখিলেশ একটু হাসিযা বলিলেন—"একটু ক্ষতি হবেই রামধনবাবু খুব খতিয়ে দেখতে গেলে, কিন্তু জন পঞ্চাশেক যে লোকটা ছাডিয়েছিল, তার মাত্র একুশ জন আমরা নিয়েছি, তার মানে এখনও যথেষ্ট চাপ রয়েছে সবার ঘাড়ে।"

"কিন্তু কেউ তো গ্রাম্বল্ করছে না।"

"তার কারণ একটু ভালো ব্যবহার পাচ্ছে আগেকার চেয়ে, তা ভিন্ন নতুন স্বাধীনতা এসেছে, বাঙালীর ফার্ম বলেই সবাই বোধ হয় অনুভব করে অনেকটা নিজেদেরই জিনিস -- সেই ভাবটাই বাড়াই না আমরা, ফল ভালোই হবে—"

ভালো কথাই, কিন্তু মনের গভীর রহস্যের কথা কে বুঝিবে ?—যে টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া মাতালের মুখে ড্যাম-স্কাউণ্ড্রেল শুনিতে অভ্যস্ত, সেই টেবিলের সামনে চেয়ারে বসিয়া রামধন কথাগুলা শুনিয়া ভিতরে ভিতরে জ্বলিতে লাগিলেন, অবশ্য ওপরে শুধু একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—অর্থাৎ যাকে বলে মামার বাড়ি—"

সেই দিন এই পর্যন্ত রহিল। কিন্তু জমিতে লাগিল। কারণ কিছু নাই, শুধু বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে, বুটের নিচে থাকিয়া যে শৃঙ্খলা যে শান্তির জন্য প্রাণপাত করিতেন--বিনিদ্র রজনী দুশ্চিন্তায় কাটাইয়া আলো জ্বালিয়া অফিস করিয়া তবুও যাহা আয়ত্ত হয় নাই, অনায়াসলব্ধ সেই শান্তি শৃঙ্খলা যেন বিষ হইয়া উঠিতে লাগিল—ঝোঁকটা নিরীহ কেরানীদের ওপর গিয়া পড়িল, ক্রমে সেটা মৃদু অত্যাচারে গিয়া দাঁড়াইল।

সেই লইয়াই একদিন কথা। নিখিলেশ যত বুঝাইতে চান, রামধন ততই ভিতরে ভিতরে উত্ত্যক্ত হইয়া ওঠেন, ওদিকে যুক্তি যতই সমীচীন, যতই অকাট্য, এদিকে ততই জ্বালা। আক্রোশ যায় না দেখিয়া নিখিলেশ কতকটা এ্যাপীলের মতো করিয়াই বলিলেন-- "রামধনবাবু, চাকরি তো আমাদেরও করতে হচ্ছে, না হয় ওপরেই, বুঝতেই তো পাচ্ছি যে মনে শান্তি না থাকলে—"

ম্যাকনীলের মতোই দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন রামধন, বলিলেন-- "একে আমি চাকরি বলি না স্যার, আমার পেন্সনের সময় হয়েছে, তাহলে রিটায়ার করিয়ে দিন। আমি বড় বড় সায়েবের আণ্ডারে কাজ করেছি, আমার ট্রেনিং অন্যরকম, চাকরির ধারণাও আমার অন্যরকম—সে বিষয়ে আমায় অন্য কারুর কাছে শিক্ষা নিতে হবে না।"

—নিজে ইস্তফা দিয়া রিটায়ারই করিলেন।

মাতুল-সংবাদ

মকদ্দমার দলিলপত্র দেখিয়া রায়সাহেব একটু চিন্তিতভাবেই মাথা দুলাইয়া অভিমত দিলেন, "হুঁ—কেসটা কিন্তু বড় দুর্বল সারদাবাবু, রফা করে নিলেই ভাল হোত।"

রায়সাহেব অপরেশ সান্যাল দেওয়ানী সাইডে শহরের সবচেয়ে বড় উকীল। সারদাবাবু ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"আমি চেষ্টা করেছিলুম রায়সাহেব। চোরাবাজারে ফেঁপে উঠে ও ধরাটাকে সরা দেখছে, জানি বৃথা হবে, তবু গিয়ে বললাম অনেক করে, শুনলে না। আমি এগুতুমও না, তবে চেষ্টা না করে উপায় নেই। জমিটা পেলে ওর হদ্দ খানদুয়েক ঘর বাড়বে, ওপর নিচেয়, আমার কিন্তু মান ইজ্জৎ নিয়ে থাকা দায় হবে। হঠাৎ বড়লোক, তায় কাঁচা পয়সা, এর বেশি আর কি বলব আপনাকে ?-- আপনাদের মত বনেদী ঘর তো নয়—"

রায়সাহেব একটু স্মিত হাসিয়া বলিলেন—"সব তো বুঝছি, কিন্তু—এই রকম একটা

উইক কেস নিয়ে- ”

সারদাবাবু দুহাত ধরিয়া ফেলিলেন—“নিন কেসটা দয়া করে, অনেক উইক স্ট্রং হয়ে গেছে আপনার হাতে, এই শহরেরই লোক আমি, জানি তো। আমার সাধ্যি নয় আপনাকে এন্‌গেজ করা, তবুও আপনার দ্বারস্থ যে হয়েছি সে শুধু ওর হাত থেকে আপনাকে কেড়ে রাখবার জন্যে। আপনি নিন তো কেসটা—তারপর আমার অদেষ্ট, হেরে যান মনে করবেন—একটা ভদ্রপরিবারের ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্যে একটু অপযশ নিলেন নিজের ওপর—জেনেশুনেই।”

রায়সাহেব একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—“ধরুন না হয় নিলুম, কিন্তু ফলটা কি হচ্ছে ? লোয়ার কোর্টে আপনি হেরেছেন, এখানকার এ্যাপীলে যদি জিতেই যান, ও হাইকোর্ট পর্যন্ত যাবে, টাকার জোর আছে, সেখানে তো আপনি ওর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবেন না—”

সারদাবাবু বলিলেন- -“ ও যাবে না হাইকোর্টে, ভেতরকার এ খবরটা আমি টের পেয়েই এসেছি ; চোরাবাজারে ওর এখন ভয়ানক মরশুম চলছে, ওর এখান থেকে নড়লে চলবে না, চারদিকে ঘুষ-ঘাষ খাইয়ে সামলে-সুমলে চলা তো। আমি ঐটুকু জানতে পেরেই করে দিলাম এ্যাপীলটা রায়সাহেব, নৈলে ডুবেই ছিলাম, ডুবতাম।”

রায়সাহেব বোধ হয় গা-ঝাড়া দিবার জন্য আর একটু চিন্তা করিলেন,· যুক্তিসঙ্গত আর কিছু হাতের কাছে না পাওয়ায় একটু হাসিয়া বলিলেন—“নেহাৎই ছাড়বেন না ?—তা বেশ।”

সারদাবাবু চলিয়া যাওয়ার একটু পরে গাড়ি-বারান্দায় একটি নূতন মডেলের মোটরকার আসিয়া দাঁড়াইল এবং অচলবাবু ধীরেসুস্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনিই সারদাবাবুর প্রতিপক্ষ। প্রাথমিক শিষ্টভাষণাদির পর জানাইলেন—কেসটি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

রায়সাহেব একটু আগের কথা বলিলেন, অপরপক্ষ তাঁহাকে পূর্বেই এন্‌গেজ করিয়া গেছে, তিনি নিরুপায়।

অচলবাবু একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন- “এ আর শক্ত ক কি রায়সাহেব ? সারদাবাবুর এ্যাপীলের শখটা আমি মেটাব, আপনাকে চাই আমার, খরচে আমি পেছ-পা নই।”

রায়সাহেব মিষ্টভাষী লোক, তবে প্রয়োজন হইলে ভাষাটাকে দিয়া মিষ্ট পাদুকারও কাজ নেন, হাসিয়াই বলিলেন—“অর্থাৎ কি দু’গুণ, চারগুণ—যা চাই ; কথাটা আপনার উপযুক্ত হয়েছে অচলবাবু, তবে আদালতের একেবারে মাঝখানে বসে ব্ল্যাক মার্কেটিং করতে সাহস হয় না।”

যুগধর্ম লইয়া নিতান্ত একটা সাদা পরিহাস, নিজেও সেইভাবেই হাসিয়া উঠিলেন, অচলবাবুও হাসিতে হাসিতে বিদায় লইলেন, তাঁহার মুখখানি কালো করিয়া গাড়িতে বসিলেন।

সাব-জজ বামাচরণবাবুর এজলাসে কেস উঠিযাছে, তারিখও পড়িয়াছে। কেস হিসাবে বিশেষ বড নয়, তবে জেদাজেদির ব্যাপার, শহরে বেশ একটু চাঞ্চল্যও পড়িয়া গেছে।

তারিখের দিন চার আগে সন্ধ্যার সময় সারদাবাবু বেশ একটু বিষণ্নভাবে বৈঠকখানায় ফরাসের এক ধারটিতে আসিয়া বসিলেন। মাঝখানটিতে দাবাখেলা চলিতেছিল, রায়সাহেব একবার চোখ তুলিয়া দেখিয়া আবার তাহাতে নিবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। শেষ হইলে খানিকটা গল্পগুজব করিযা সবাই উঠিয়া গেলে প্রশ্ন করিলেন—"তারপর, সারদাবাবু যে ? মনমরা ভাব, নূতন কিছু খবর আছে নাকি ?"

সারদাবাবু উত্তর করিলেন—"আজ্ঞে আছে একটু, তাই অসময়ে ছুটে আসতে হল—"

চাকর গড়গড়ায় নূতন করিয়া ছিলিম বসাইযা দিযা গেল, রায়সাহেব গির্দায হেলান দিয়া সট্‌কাটা তুলিয়া লইয' বলিলেন—"তাই নাকি ? শুনতে হচ্ছে তো—"

"অচলবাবু একটা মস্ত বড় চাল দিযেছেন। শুনলাম, বোগ্‌ড়ো থেকে বামাচরণবাবুর মামাকে নিযে আসছেন। তিনি ওখানকার পুরনো উকীল, এদিকে রাযবাহাদুর। ভেতরে ভেতরে খবর নিয়ে যতটা বুঝলুম উকীল যে খুব ভালো তা নয, তবে সদরালা সাহেবের একেবারে মামা।—অচলবাবু অবশ্য সেটা প্রকাশ করেন নি, আমিই খোঁজ নিযে জানলাম, বলি, ভালো রে ভালো, এত দেশ থাকতে হঠাৎ বোগ্‌ড়ো ছুটল কেন লোকটা !"

রায়সাহেব গড়গডা টানিতে লাগিলেন। মুখটা একটু ভার। বলিলেন--"রাযসাহেব না পেয়ে রায়বাহাদুর ?"

সারদাবাবু সুযোগটা হাতছাডা করিলেন না, বলিলেন—"তা আনছে আনুক, সবাই আনে, কিন্তু যেমনভাবে গেযে বেডাচ্ছে, সেইটেই হযেছে শ্রুতিকটু কিনা --"

"গালমন্দ দিয়ে বেডাচ্ছে নাকি ?"

"সোজা গালমন্দ তো ভাল রাযসাহেব ; কিন্তু চোরাকারবারী লোক, ওপন্ মার্কেটে বেচাকেনা করে না তো, সোজা গালাগাল দেবার হিম্মৎ কোথায ? তাহলে আপনাকেই তো সেদিন মুখের উপর শুনিয়ে দিতে পারত, শুনেছি তো থাপ্পড়টা কি রকম খেয়েছিল আপনার কাছে সেদিন এন্‌গেজ করতে এসে। এখন এখানে-ওখানে আডালে বলে বেডাচ্ছে, রায়সাহেবের ওপর রায়বাহাদুর চাপিযেছি, দেখি কি করে সামলায ! আপনার কানে উঠছে না, আমাদের কানে বিষ ঢালছে—"

রায়সাহেব চুপ করিয়া গডগডা টানিয়া যাইতে লাগিলেন। সারদাবাবুও চুপ করিযা বসিয়া রহিলেন, কথাগুলি মনে বেশ থিতাইযা বসুক, শুধু চোখের কোণে এক-একবার দৃষ্টিপাত করিয়া যাইতে লাগিলেন, তাহার পর এক সময বলিলেন,—"মরুক গে, সে ভয করি না, আমাদের রাযসাহেবের সঙ্গে বোগ্‌ড়োর উইযে-ধরা রাযবাহাদুরের লডাইটা না হয় দেখাই যেত একবার ; কিন্তু তা তো হচ্ছে না, ভেতরের চালটা যে মস্ত বড দিযেছে। সদরালা সাহেব সম্বন্ধে তো জানেই সব কথা—"

রাযসাহেব একটু চকিত হইয়াই প্রশ্ন করিলেন—"মামার হাত দিযে খাবে নাকি ? কৈ, এসব দোষের কথা শুনি নি তো—"

"আজ্ঞে না, ওসব দোষ নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে ভয়ঙ্কর মাতৃভক্ত মানুষ, প্রণাম করে কোর্টে যান, ফিরে এসে প্রণাম করে ঘরে ঢোকেন। গুণই তো, খুব বড গুণ। অত বযসেও ছেলে বাধ্য, আর অমন ছেলে—কিন্তু আমাদের কপালদোষে এক্ষেত্রে যে দোষে দাড়াচ্ছে।

মা যদি আবার বড ভাইয়েব ঐরকম বাধ্য হন, না হবাব কারণ তো কিছু নেই—তাহলে রেজাল্টটা যা দাঁড়াবে, বুঝতেই তো পারেন, আব তাই জেনেই তো তাকে কাঁধে করে নিয়ে আসা অত দূর থেকে!"

এবারে মুখ থেকে সট্‌কাটা সরাইতে অনেকক্ষণ দেরি হইল, রায়সাহেব খুব গম্ভীর চিন্তায় নিমগ্ন। সারদাবাবু মনে মনে পুলকিত হইয়া উঠিলেন, মকদ্দমাটায় বিশেষ কিছু নাই, যাহাতে ওপক্ষে না যান শুধু সেই জন্য জোর করিয়া গছাইয়া দেওয়া তাঁহাকে। এতদিন হাঁটাহাঁটি করিযাও রায়সাহেবকে বিশেষ অবহিত করিতে পারেন নাই, এখন এই নূতন ব্যাপারটিতে তাঁহাকে যেন একটু খোসামোদ করিবার সুযোগ পাওয়া গেল, তেমনি উত্তেজিত করিবারও। সফল হইবার লক্ষণ দেখিযা তিনিও নীরবেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

একটু পরে একটা দীর্ঘ টানের সঙ্গে "হুঁ!" শব্দ করিয়া সারদাবাবুর দিকে মুখ ফিরাইলেন রাযসাহেব। বলিলেন—"যতই ভাবছি, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, অচলবাবু নিজেব পাযে নিজে কুড়ুল মারলে। ব্যাপারটা আমাদেরই ফেবারে যাবে। আর কিছু না হোক, মানুষেব একটা সহজ সম্ভ্রম স্থান আছে তো। মামা এজ্‌লাসে এল আর মকদ্দমা জিতে নিযে গেল, এটা এত দৃষ্টিকটু ব্যাপাব—ব্রড ডে লাইটে—তাবও পর যে রকম শুনছি আপনার কাছে, লোকটা একটু ধর্মপ্রবণ—বিবেক বলে একটা জিনিস আছে। আচ্ছা দাঁড়ান, আব একটু ভাবি।"

আবও খানিকক্ষণ গুড়গুড়া টানিযা বলিলেন—"অবশ্য এরকম যে না হচ্ছে তা নয়, মানুষেব অনেক বকম দুর্বলতাই আছে তো, হয়তো এদিকে ধার্মিকই, অথচ আত্মীযস্বজন ফাঁকতালে কিছু পেযে গেলে সেটা অপছন্দ নয়। আমাদেবই অনেকেরই তো সাধুতাব আইডিযা—নিজেব হাত পেতে না নেওয়া—ধূর্ত মক্কেলে তাব সুযোগটুকু নিতে ছাড়ে না—"

সারদাবাবু হাসিযা বলিলেন "আর মাব অবাধ্য হওযাটা বেশি পাপ, কি মাব বাধ্য হযে অপরেব সর্বনাশ করাটা বেশি পাপ—এটা ঠিক করাও তো অনেকের পক্ষে শক্ত—"

রাযসাহেবও একটু হাসিলেন, বলিলেন—"তা বৈ কি। —আপনি এক কাজ করুন সারদাবাবু। সত্যি দুনিযাব যেমন হালচাল দেখি—ধর্মটা কিছু নয়, অনেকের পক্ষে একটা অভ্যাস। সদরালা সাহেব লোকটা কি রকম জানি না, নতুন এসেছে ওর কোর্টে যাবারও বড একটা দরকার পড়ে নি এ পর্যন্ত। আপনি খবব যোগাড় করতে যেমন ধুরন্ধর দেখছি, একটু সন্ধান নিন তো ওঁর এ উইক্‌নেসটা আছে কিনা—এই মামা, খুড়ো, পিসে দাঁড়ালে কেস্‌ জিতিযে দেওয়া—ভেবে দেখে মনে হচ্ছে যেন আছে, নৈলে অচলবাবুই বা এরকম করতে যাবে কেন? ঝানু লোক, বোঝে তো সেরকম মানুষ হলে কেস্‌ এতে কেঁচে যাওযারই কথা।"

সারদাবাবু বাহিব হইযা গেলে চাকরকে দিযা রাস্তা হইতে আবার ডাকিয়া পাঠাইলেন, উপস্থিত হইলে বলিলেন,—"হ্যাঁ, আব এক কথা, সদরালা সাহেবেব পরিবার, আত্মীযস্বজন সম্বন্ধেও একটু খোঁজ নিন—কে কোথায থাকে, কি কি কাজ করে, এদিকে বাড়িতে কে কে আছে? কাল পর্যন্ত কিন্তু সব খবরটুকু পেযে যাওযা চাই, সময নেই আর।"

অত বিলম্ব হইল না। সেই দিনই সন্ধ্যার সময দাবা পড়িবার আগেই সারদাবাবু সব খবর সংগ্রহ করিযা আনিয়া দিলেন। সদরালা সাহেবরা তিন ভাই—এক ভাই ডেপুটি, থাকেন খুলনায, এক ভাই ঢাকায প্রফেসার। দুই বোন: এক বোন বিধবা, এক ভগ্নীপতি আবগারী বিভাগে কি একটা বড চাকরি করেন। ওদিকে সদরালা সাহেবের নিজেব দুই বিবাহ—

রায়সাহেব সোজা হইয়া বসিলেন, কতকটা কৌতুকমিশ্রিত উল্লাসের সহিতই বাধা দিয়া প্রশ্ন করিলেন—"দুই বিয়ে !"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বেশ, তারপর ?"—গড়গড়ার টানটা দ্রুত হইয়া উঠিল।

"এক বিবাহে ক্রমাগত মেয়ে হোতে লাগল, বংশ থাকে না, তাই বছরতিনেক হল দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেছেন—"

"হয়েছে বংশ-রক্ষা ?—এ পক্ষ এখন কোথায় ?"—প্রশ্নগুলা যেন হুড়াহুড়ি করিয়া বাহির হইয়া আসিতে চায়।

সারদাবাবু এ ভাবান্তরে একটু যেন বিমূঢ়ভাবেই উত্তর করিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ, একটি পুত্রসন্তান হয়েছে, দুই স্ত্রী-ই এখানে, এ পর্যন্ত খবর পেলাম দুজনের মধ্যে বেশ বনিবনাও—"

রায়সাহেব হাতের সট্‌কাটা নামাইয়া বিরক্তভাবে ফরাসের ওপর চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন, "চুলোয় যাক বনিবনাও, ওদের বাপের বাড়ির খবর বলুন আগে মশাই, এখানে দুজনে গলায় গলায় হলেই বা আমার কি, ঝোঁটাঝুঁটি করে মলেই বা আমার কি ?—বলি, ওদের বাপের বাড়ির—"

এই সময় দাবাড়ের দল হৈ হৈ করিতে করিতে উপস্থিত হইল, উকিল, মোক্তার, প্রফেসার, একজন বেকার সরকারী খুড়ো। কথাটা চাপা পড়িয়া গেল।

৩

কাহিনীটাকে সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য এবার একেবারে সদরালা সাহেবের অন্তঃপুরেই প্রবেশ করা যাক, কেননা ফয়সলাটা আসলে সেইখানেই হইল।

দুইদিন পরের কথা। মর্ণিং কোর্ট, দুপুরের নিদ্রা হইতে উঠিয়া ঘরের মধ্যে একটা আরাম কেদারায় হেলান দিয়া একটা কেসের কথা ভাবিতেছেন, এইবার অফিস ঘরে গিয়া স্টেনোকে দিয়া রায় লিখাইবেন, মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দুইটা একথা সেকথার পর বলিলেন—"দাদা এসেছেন, শুনেছিস বোধ হয় ?"

সদরালা সাহেব একটু সচকিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"এখানে ?"

"এতই কি আক্কেলের মাথা খেয়ে বসবেন ?"

"এই শহরে বলছ ? শুনেছি, কে এক অচলবাবু আছে, সে-ই নাকি আনিয়েছে।"

একটু চুপচাপ গেল, তাহার পর—

"শুনেছি নাকি তোর এজলাসেই মকদ্দমাটা উঠেছে ?"

"হ্যাঁ, তাও শুনেছি, ঐ কেস্‌টাতেই নাকি এসেছেন। কেন যে রাজী হন আসতে এভাবে ? একটা বদনাম—"

"শোন কথা ! কেন আসেন ! ভালো উকিল, ডাকে—তাই আসেন।"

"অনেক জায়গায় আর সামলাতেও পারেন না মা, দেখছি তো। মানে, বয়েস তো হয়ে আসছে—"

"ঠিকই তো কথা বাবা, বুড়ো হলে আর যায় সামলানো ? তেমনি আবার যিনি বার্ধক্য দেন, তিনি সামলাবার লোকও ঠিক করে দেন। এই তো আমি আর পারি সামলাতে সংসারটা ?—তেমনি আবার বৌমারা রয়েছেন তো—"

ইঙ্গিতটার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নাই, সদরালা সাহেব চুপ করিয়া রহিলেন। একটু পরে মা বলিলেন—"তাহলে ?—থাকব নিশ্চিন্দি ?—দাদা একটা চিঠিও দিয়েছেন—অমনি, বামাচরণ কেমন আছে ? বৌমারা, ছেলেমেয়েরা কেমন আছে ? একবার যে গিয়ে দেখেও আসব সবাইকে, তার উপায় নেই। শুনছি নাকি তার এজলাসেই মকদ্দমা—গেরো দেখো না। নিজের ভাগনের বাড়ি, অথচ একবার যে আসবেন তার উপায় নেই। কেন রে বাপু ?"

আবার একটু চুপচাপ গেল, তাহার পর সদরালা সাহেবই টানিয়া টানিয়া বলিলেন—"নিশ্চিন্দি—মানে, শুনছি কেসটা নাকি অচলবাবুরই অনুকূলে ; এখনও হাতে আসে নি, তবে শুনছি এই রকম। তাইতে যতটা নিশ্চিন্দি থাকা যায় মা। সত্যি, অধর্ম তো করতে পারি না, তুমিও নিশ্চয় বলবেও না তা।"

"তাই কখনও পারি বলতে মা হয়ে ? তবে কথা হচ্ছে, বুড়ো মামা, ছেলেগুলো তেমন মানুষ হল না—'রিটার' করবার সময় পর্যন্তও বাড়ি ছেড়ে দুটো পয়সার জন্যে ছুটাছুটি করতে হচ্ছে, তাঁকে দেখাও তো একটা ধর্ম বাবা ; 'না' বলতে পারিস,—বল না ?"

"তা তো বুঝি মা, কিন্তু—"

"ঐ বুঝলেই হল, নিতে হবে সামলে একটু ; ঐ তো বললাম—বৌমারা কেন সামলে বেড়াচ্ছেন বুড়ো শাশুড়ীকে ? তাঁদের সেটা ধর্ম বলেই তো ?"

পরদিনের কথা। বাসার ওপর-তলায় সদরালা সাহেব যে-ঘরটিতে শয়ন করেন, তাহার সামনে একটু খোলা ছাদ আছে। রাত্রের আহার শেষ করিয়া সেইখানে একটি ডেকচেয়ারে গা এলাইয়া সিগারেট টানিতেছিলেন, দ্বিতীয় সহধর্মিণী কিরণময়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কোলে এক বছরের বংশধরটি।

জ্যোৎস্না রাত্রি। একটু এদিক ওদিক কথার পর জ্যোৎস্নার সৌন্দর্যের কথা আসিয়া পড়িল, তাহা হইতে সৌন্দর্য মাত্রেরই কথা, শেষে সদরালা সাহেব অভিমত দিলেন সব সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ জ্যোৎস্না রাত্রেই। কিরণময়ী এটা সমর্থন না করায় একটু মৃদু তর্ক উঠিল, হারিবার মুখে কিরণময়ী মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা আচ্ছা, কাব্যি রাখো, ঢের হয়েছে।"

এই গৌরচন্দ্রিকাটুকু সারিয়া নিজেও একটি ডেকচেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন। আর একটু একথা সেকথার পর বলিলেন—"ঠিক, ভুলেই যাচ্ছিলাম বাজে কথার মধ্যে, দাদা এসেছেন শুনেছ বোধ হয় ?"

সদরালা সাহেব বিলক্ষণ শুনিয়াছেন, এবং কখন কোন্ পথে কথাটা ওঠে, সেই ভয়ে কাঁটা হইয়া আছেন, অজ্ঞতার ভান করিয়া বলিলেন—"সত্যি নাকি ?"

"হ্যাঁ, এসেছেন ; মা লিখেছেন আদালতে বেরিয়েই খুব নাম হয়েছে, এখানকার কে একজন সারদাবাবু নাকি তিনগুণ ফি দিয়ে নিয়ে এসেছে।"

"বেশ আহ্লাদের কথা তো।"

একটু চুপচাপ গেল, তাহার পর কিরণময়ী বলিলেন—"শুনছি নাকি তোমারই এজলাসে আছে কেস্‌টা !"

"ও, অচলবাবুর সেই কেস্‌টা ? ওরা ওদিকে মামাকে এনে বসে আছে, মা বলছিলেন।"

এরপর স্তব্ধতাটুকু একটু বেশিক্ষণ রহিল, তাহার পর কিরণময়ী বলিলেন,—"মামাই জিতবেন নিশ্চয়, পুরনো লোক—"

"সেই রকম মনে হয়, কেস্‌টাও ওদের ভালো কিনা।"

আবার একটু চুপচাপের পর কিরণময়ী মুখটা একটু ভার-ভার করিয়া বলিলেন—"মামা না জিতলেও তেমন ক্ষতি ছিল না, অনেক জিতেছেন, এখন রিটায়ার করবার বয়েস, হারলে এমন কিছু লোকসান নেই—"

জবাবের জন্য যথেষ্ট সময় দিয়াও কোনরকম জবাব না পাইয়া আবার বলিলেন—"অথচ দাদা যদি হেরে যায় তো উঠতির মুখে একেবারে মুষড়ে পড়বে।"

"কেস্‌টা নেওয়াই উচিত হয় নি কিরণ—একেবারে জুনিয়ার, এই তো সবে মাস ছয়েক হল জয়েন করেছে আদালতে, আজকাল ছ'বছরেও লোকে কিছু করে উঠতে পারছে না।"

কিরণময়ী মুখটা আরও ভার-ভার করিলেন এবং কথাটা এইবার আরও স্পষ্ট করিয়া দিয়া বলিলেন—"নিয়েছেন নিশ্চয় এই ভরসায় যে, ভগ্নীপতি আছেন। প্রাণপণে চেষ্টা তো করবেই। একটু এদিক-ওদিক হয়, তিনি নিশ্চয় সামলে দেবেন।—অবিশ্যি ভুল হয়েছে এরকম ভরসা করা।"

"সেটা কি অধর্ম হয় না কিরণ?"

"একটা মানুষ এল অত দূর থেকে আশা করে, হেরে মনমরা হয়ে ফিরে যাবে, পশার একটু জমবার মুখেই যাবে ভেস্তে—সেইটেই হল ধর্ম? কে জানে বাপু, ধর্মের কথা তাহলে তোমার কাছে নতুন করে শিখতে হয়।"

কথাটা যখন হইযাই গেল এতটা স্পষ্ট, আর গোপন করিয়া ফল কি! সদরালা সাহেব একটু বিপর্যস্ত ভাবেই ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন—"তুমি বুঝছ না কিরণ, অচলবাবুর কেস্‌ এমনই ভালো, তার মামার মতন একজন সিনিয়ার লোককে নিয়ে এসেছে, তাঁর যদি হার হয়, আর সমরের যদি জিত হয় তো আমার একটা বদনাম হয়ে যাবে না? একেবারে জুনিয়ার, মাস ছয়েকও হয় নি—"

"জুনিয়ার হোন, সিনিয়ার হোন, আমার তো দাদাই। আমারও তো একটা ধর্ম আছে, তাই বললুম। হেরে মুখটি চুন করে ফিরে যাবেন—কখনও হাসিখুশি বই অন্যরকম দেখি নি দাদার মুখ—"

আঁচলের কোণটা গুটাইয়া ডান হাতে লইলেন। সদরালা সাহেব একবার আড়চোখে দেখিয়া লইয়া একটু সভয়েই বলিলেন—"তাকে বুঝিয়ে বোলো কিরণ, লক্ষ্মীটি, সে নিশ্চয় বুঝবে। শিক্ষিত—"

"আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না বাপু, এক শিক্ষিতকেই বড় বুঝিয়ে উঠতে পারলাম—সোনার মেডেল পাওয়া—আর তিনি একটা মামুলী বি-এ।—আমারও যেমন জ্বালা; কেন যে অপমান হবার জন্যে বলতে গেলাম—কি করেই যে দাদার সামনে দেখাব এ পোড়া মুখ! এমন অদেষ্ট, এলেন শহরে, একবার যে একটু নেমন্তন্ন করেও খাওয়াব, মায়ের পেটের ভাই—তার ওপর মুখটি চুন করে—"

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কথাগুলো ভাঙিয়া যাইতে লাগিল, হাতের আঁচল চোখে উঠিল।

* *

মকদ্দমার শুনানী হইল। দিন সাতেক পরে রায়ও বাহির হইয়া গেল, অবশ্য সারদাবাবুরই সপক্ষে।

রায়সাহেবের বৈঠকখানায় সেদিন আর স্থিরভাবে বসিয়া দাবা খেলিবার মতো কাহারও মনের অবস্থা নয়। মকদ্দমার রায় লইয়া রং-বেরঙের আলোচনার হুল্লোড় চলিতেছিল।

সারদাবাবু নিজের উকিলকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া হাসিমুখে আসিয়া রায়সাহেবের পদধূলি লইতে যাইতেছিলেন, তিনি পূর্বাহ্নেই মাথায় হাতটা চাপিয়া বলিলেন—"প্রণাম হবে'খন—বড় যে খবর রাখেন, আগে রায়বাহাদুরের খবর দিন তো। ভারি যে রায়সাহেবের ঘাড়ে চড়তে এসেছিলেন, আছেন কোথায় এখন ছিটকে পড়ে ?—এ মকদ্দমা সারদা পাল বনাম অচল চৌধুরীও নয়, রায়সাহেব বনাম রায়বাহাদুরও নয়, একেবারে বাবার শালা versus নিজের শালা, মায়ের দাদা versus গিন্নীর দাদা—রায় মকদ্দমার আগেই লিখে রাখতে পারা যায়।—"

হাসি-হুল্লোড়ের মধ্যে অপর কে একজন বলিল—"তা বৈকি, আর এ রায় তো সাহেব কেরানীকে লেখাচ্ছেন না, মেমসাহেব লেখাচ্ছেন সাহেবকে।—খোকার মামাকে এই শহরেই এসে আস্তানা গাড়তে বললেন না কেন মশাই ?—"

রমেনদের পলিটিক্স

রমেন রায় খুব একচোট মাতামাতি করিয়া বেলা প্রায় আড়াইটার সময় মেসে ফিরিল। কমিটির অফিসে মিটিং ছিল বেলা প্রায় ন'টার সময়, বহুবাজার-ওয়েলিংটন-ধর্মতলা হইয়া প্রসেশন লইয়া গেলে কম্যুনিস্টদের একেবারে নাকের নিচে দিয়া যাইতে হইবে, সংঘর্ষ অনিবার্য, সুতরাং যাওয়া হইবে কিনা সেই লইয়া তুমুল আলোচনা চলিল। একটা ভালো দিন, স্বাধীনতার দ্বিতীয় বাৎসরিক উৎসব, যদি সম্ভব হয় তো এদিনটাকে অক্ষত রাখিবারই ইচ্ছা ছিল অনেকের, মেয়েদের মধ্যে নীলিমার। নীলিমা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"সেদিনের মিটিং-এ আমি ছিলাম না, কিন্তু শুনলাম কোন্ পথে যাওয়া হবে স্থির করতে পারা যায় নি বলেই একটা অলটারনেট রুট-এর ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে লাইসেন্সে। আমার তো এইটেই আশ্চর্য বোধ হচ্ছিল, এরকম একটা দ্বিধা পেয়েছিল উঠতে আমাদের মনে ? আমরা আজকের দিনটিকে নিষ্কলুষ রাখতে চাই, সেটা তখনই সম্ভব হতে পারে যদি নিতান্ত নির্বিরোধ ভাবেই আমরা সে আনন্দটুকু উপভোগ করবার চেষ্টা করি। ওদের ঈর্ষাকে খোঁচা দিয়ে জাগাতে গেলে—"

রমেন উঠিয়া দাঁড়াইল।

"কোথায় ঈর্ষা আছে ভ্রূ কুঁচকে, কোথায় হিংসা আছে তার অস্ত্র শানিয়ে—অত খতিয়ে দেখতে গেলে কি আজকের দিনটি আদৌ এনে ফেলতে পারতাম আমরা ?"

অনেকের ভ্রূ-ই কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—বিস্ময়ে। কানাঘুষায় রমেনের নাম পড়িয়া গিয়াছিল নীলিমার 'ইয়েস ম্যান'—মূল কথা নীলিমার, রমেন বলিবে—'তাই তো, তাই তো', এই ছিল নিয়ম, আজ হঠাৎ ব্যতিক্রম যে !

ভ্রূ কুঞ্চিত হইল না নীলিমার, সে যেন জানিতই এই রকম হইবে। বেশ সহজ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"কিন্তু সাধনার নিয়ম আর সিদ্ধির নিয়ম এক হবে ! সিদ্ধির মধ্যে থাকুক না খানিকটা ক্ষমা ; তা সিদ্ধিকে উজ্জ্বলই করবে। এই স্বাধীনতা আনতে যারা বাধা দিয়েছিল—"

বাধা দিয়াই বলিল—"ক্ষমা কিন্তু সিদ্ধিকে উজ্জ্বল না করে স্পর্ধাকে প্রবলও করতে

পারে। এই স্বাধীনতা আনতে যারা বাধা দিয়েছিল, তারা সেটা দিয়েছিল অক্ষম স্পর্ধায়, প্রতি পদেই যদি তাদের সে কথাটি না জানিয়ে দিই তো তাদের স্পর্ধা যাবে বেড়ে। আর সেটা যাচ্ছেই যে বেড়ে তার প্রমাণের অভাব আছে কি ? ক্ষমা আসে নিশ্চিন্ততা থেকে, কিন্তু সে নিশ্চিন্ততার অবসর ওরা দিয়েছে কি ? আমার মতে স্বাধীনতাও যেমন অর্জন করবার জিনিস, ক্ষমাও তেমনই--ওরা করুক অর্জন, আমরা দোব হাত তুলে।"

তর্ক জমিয়া উঠিল। পলিটিক্সের মধ্যে এ আবার নূতন পলিটিক্স,--রমেন হঠাৎ নীলিমার উল্টা দিকে যায় কেন! মেয়েদের মধ্যে বেশির ভাগই রমেনের পক্ষে আসিয়া গেল, কারণের মধ্যে অবশ্য একটাই প্রকাশ পাইল--এড়াইয়া গেলে ওরা অর্থাৎ কম্যুনিস্টরা এও তো ভাবিতে পারে, ভয়ে ও-পথ মাড়াইল না, আজকের মতো একটা গৌরবের দিনে ও মিথ্যা অগৌরবটা মাথা পাতিয়া লই কেন ? এমন একটা তর্ক যে, বেটাছেলেদের মধ্যে যাহাদের ইচ্ছা ছিল এমন অনেকেও নীলিমার দিকে যাইতে পারিল না। ঐ পথই ঠিক হইল মিছিলের জন্য।

সংঘর্ষ হইল। অ্যাম্বুলেন্সও আসিল। অনেকগুলিকেই তুলিতে হইল তাহাতে, সবচেয়ে বেশি আহত অবস্থায় নীলিমা। রমেন- আজকের অভিযানের পাণ্ডা রমেন নিশ্চয় তাহা হইলে মৃতকল্প হইয়াই কোনখানে পড়িয়া আছে। খোঁজ পড়িয়া গেল, কিন্তু পাওয়া গেল না কোনখানেই।

এ-মেসটা ছাড়িতে হইল রমেনকে। এ পাড়ার পলিটিক্সও ওর গেল কাঁচিয়া, আর থাকা চলে না। পটলডাঙা থেকে বাগাবাজারে একটি জানাশোনা মেসে গিয়া উঠিল। সেখানে পরিচয় হইল বীরেশবাবুদের সঙ্গে।

রাস্তাটা একটা চওড়া গলি। এদিকে রমেনদের মেস, ওদিকে কয়েক হাত দক্ষিণে গিয়া বীরেশবাবুদের দোতলা বাড়িটা। সামনে একটা গেট, তাহার পর হাত দশেকের একটা ছোট প্রাঙ্গণের পর একটা বারান্দা, বারান্দার দুইদিকে দুইটা বড় ঘর, বাঁয়েরটা বৈঠকখানা, ডাইনেরটা বাড়ির মধ্যে পড়ে।

বাড়িটা পলিটিক্সের একটা আড্ডা। বীরেশবাবু নিজে একজন অধ্যাপক। বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ হইবে। উগ্র কম্যুনিস্ট। তবে বয়স হইয়াছে, কাজ এক সময় যদি বা কিছু কিছু করিয়া থাকেন, এখন থিয়োরী আর তর্ক লইয়া আছেন।

তবে কাজ করিবার লোক আছে। চারটি ছেলে কম্যুনিস্ট, একটি বিধবা ভগ্নী, বছর ত্রিশ বয়স, পাকা কম্যুনিস্ট। একটি সধবা ভগ্নী, তাঁহার স্বামীসুদ্ধ কম্যুনিস্ট, এই গলিতেই অল্প একটু দূরে বাড়ি, কিন্তু এই বাড়ির কর্মকেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তারপর আছে বীরেশবাবুর বাইরের শিষ্য-সাকরেদরা, সমস্ত দিনই বাড়িটাতে একটা কর্ম-চঞ্চলতা লাগিয়া থাকে।

এ-বাড়ির সঙ্গে রমেনের পরিচয় করাইল সুকুমার। ছেলেটি এইদিককারই একটি বড় দৈনিক কাগজের অফিসে কাজ করে, একেবারে অষ্টপ্রহর খদ্দরধারী কংগ্রেসী, সেই সূত্রেই রমেনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হইল। পলিটিক্সের যা কিছু চর্চা এখানে আসিয়া অবধি তা ঐ সুকুমারের সঙ্গেই হয়। কিন্তু আশ মেটে না, মাত্র দু'জনের আলোচনা, তার মতের প্রভেদ নাই, আর হইলই যদি কখনও রমেনের দিক থেকে, তো সুকুমার এমন নির্বিরোধভাবে মানিয়া লয় যে তর্ক একেবারে দানা বাঁধিতে পারে না। রমেনের অভ্যাসটা অন্যরকম।

সেও অবশ্য মানিয়া লইত এক সময়, কিন্তু সে শুধু নীলিমার কথা, তাহার পর কিন্তু এই মানিয়া লওয়া থেকেই অন্যদের সঙ্গে তর্ক জমিয়া উঠিত। তাহার ওপর ছিল কাজ, প্রসেশন, মিটিং, হেন তেন। এ যেন দিন দিন মিয়াইয়া যাইতেছে।

মুশকিল হইতেছে একেবারে কাজ লইয়া নামিতে সাহস হইতেছে না। কংগ্রেসের ছোট বড় কমিটিগুলার মধ্যে একটা জ্ঞাতি সম্বন্ধ আছে, প্রত্যেকটা প্রত্যেকের ভালোমন্দের খবর রাখে, স্বাধীনতার দিনের ব্যাপারটা জানাজানি হইয়া যাইবে।

একদিন সামনের ঐ বাড়িটার কথা সুকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল। বাড়িটা এ-পাড়ায় অনেক দিক দিয়াই বিশিষ্ট, ওখানে মাঝে মাঝে যে তর্কের লহরী ওঠে, স্পষ্ট কিছু বিশেষ বোঝা না গেলেও তাহার কল্লোলটা কখনও কখনও এখানে আসিয়া পৌঁছায় ; সর্বোপরি, সুকুমারকে কয়েকবার ও-বাড়িতে যাইতে এবং ও-বাড়ি থেকে বাহির হইতে দেখিয়াছে। একদিন প্রশ্ন করিল—"ও বাড়িটা কার ? একটা উষ্ণ প্রস্রবণ বলে মনে হয় যেন ?"

"বীরেশ লাহিড়ীর বাড়ি, তুমি জান না ?"—বেশ বিস্মিতভাবেই মুখের পানে চাহিল সুকুমার।

"তোমার কথার ভাবে বোধ হচ্ছে বিশ্ব-বিশ্রুত লোক। না জানার অপরাধটা মেনে নিচ্ছি, কিন্তু তুমিও তো জানাও নি।"

"মস্ত বড় কম্যুনিস্ট।—আমি মনে করতাম তুমি জান, আর কম্যুনিস্ট বলেই আগ্রহ নেই।"

"আগ্রহ আর রইল না—কিন্তু একটা কথা, তোমায়ও তো যেতে দেখেছি, আসতে দেখেছি। অথচ খদ্দরের তো তীর্থস্থান ওটা নয়।"

সুকুমার অল্প একটু থামিয়া বলিল—"হ্যাঁ, আমার পরিচয় আছে বীরেশবাবুর সঙ্গে—আর সেই জন্যেই তোমায় নিয়ে যেতে সাহস করি নি।"

"হেঁয়ালিটা একটু ভেঙে বলো।"

"ঐ তো বললাম, একজন ঘোর কম্যুনিস্ট। এখন আর কাজকর্ম কিছু করেন না নিজে, শুধু ডিরেক্‌শন্ দেন। আরো সেটা ভয়ের কথা, সাকরেদ যোগাবার ঝোঁক আছে। তোমায় হারাতে পারি ওখানে নিয়ে গেলে।"

"কিন্তু কৈ নিজেকে তো হারাও নি ?"

আবার একটু থামিল সুকুমার। কি যেন ভাবিয়া লইয়া বলিল—"হয় তো পারিও হারিয়ে ফেলতে একদিন।—তা বেশ, তোমার আপত্তি না থাকে চলো না। ভালোই, আমি একজন দোসর পাই। তর্কে বড্ড কোণ-ঠাসা করেন মাঝে মাঝে।"

সেই একদিন সন্ধ্যার পর গেল রমেন। জন সাত-আট যুবক সামনের চৌকিতে বসিয়া আছে, আলোচনা হইতেছে, সুকুমার যাইতে যে বিরতিটুকু হইল, তাহাতেই সে পরিচয় করাইয়া দিল, অবশ্য সংক্ষিপ্ত—বন্ধু, ওরই মেসে থাকে, অমুক অফিসে কাজ করে। রাজনীতিগত পরিচয়টা আর দিল না।

একটু মোটা-সোটা মানুষটি, মুখশ্রী প্রসন্ন, প্রায় সব মোটা মানুষের মতো হাসির ভাগটা তাহাতে একটু বেশি। অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন—"এসো, সুকুমারের বন্ধু তুমি, বেশ আনন্দ হোল।"

চা বোধ হয় সবে হইয়া গিয়া থাকিবে, আরও দুজনের জন্য বলিয়া দিলেন।

রাজনীতিগত পরিচযটা রমেন নিজেই দিল।—

বীরেশবাবু আবার আরম্ভ করিলেন—"হ্যাঁ, যা বলছিলাম, এটা স্বাধীনতা যখন নয় তখন এটা নিয়ে আমরা অত লাফালাফি করতে যাব কেন! এ-স্বাধীনতা আমাদের ডেফিনেশনের সঙ্গে মিলছে না। আমাদের স্বাধীনতা সব মানুষ নিযে। ওবা যেটাকে নিযে লাফালাফি করছে সেটাকে হদ্দ ওপরের কতকগুলো লোকের কতকগুলো কাজ করবার সুযোগ বলে মেনে নিতে রাজী আছি। কিন্তু সে-সুযোগ তো আরও সাংঘাতিক--তার মধ্যে নতুন-লাভ করার উন্মাদনা আছে, অথচ সে উন্মাদনাকে সংযত করবার জন্যে যে জনমতের দরকার সেটা নেই একেবারে। সুতরাং ও-সুযোগে সেই 'কতকগুলো কাজ' যে কি ধরণের হবে, তা বেশ বোঝা যায, বুঝছিও তো দিন দিন—"

রমেন বাধা দিল--"মাফ করবেন, উদ্ধত মনে করবেন জেনেও একটা প্রশ্ন করি--এই সুযোগটা কংগ্রেস না পেযে যদি আপনারাই পেতেন একটা চান্স দিতেন না কি?"

একেবারে সম্মুখ আক্রমণ, তর্কটাতেও জোর আছে, অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গে সেটাকে আরও জোরালো করিযাছে। বীরেশবাবু অবশ্য একটু বিস্মিতভাবেই মুখের পানে চাহিলেন, তবে মুখের প্রসন্নতার সঙ্গে একটু প্রশংসাও রহিয়াছে; একটু হাসিযাই প্রশ্ন করিলেন—"অর্থাৎ বলছ ঈর্ষায বলছি কথাটা?"

"সেই ধারণাই কি জন্মাবে না মনে সবার?"

"যে-সব মনে এই রকম ধারণা জন্মায, সেই সব মনের ওপর শ্রদ্ধা রাখতে গেলে কি কোন কাজ চলে পৃথিবীতে?"

"অশ্রদ্ধার কথাটা আপনাদের মুখে কেমন করে মানাবে? আপনারা প্রোলিটের্‌িযেটকে পর্যন্ত কোল দেন—"

"কিন্তু মনের দিক দিযে প্রোলিটেরিয়েটদের মতন অমন শ্রদ্ধেয আর কিছুই যে নেই"

এই সময় খুব জরুরী কাজ লইযা একটু বযস্থ গোছের জনচারেক কর্মী আসিযা পড়ায তর্কটা ঐখানেই শেষ হইল। বীরেশবাবু বলিলেন—"বেশ লাগছিল তোমার কথাগুলো, এইখানেই তো থাক, এসো মাঝে মাঝে!--সুকুমারই নিয়ে আসবে রমেনকে।"

গলি দিযা আসিতে আসিতে রমেন প্রশ্ন করিল--"কি হে, আমায হারাবে বলে ভয হচ্ছে?"

সুকুমার শুধু একটু হাসিযা বলিল—"আরম্ভটা তো হতাশজনক নয।"

কাজের নমুনা স্বাধীনতা দিবসেই দেওযা হইয়াছে, নিতান্ত স্বাভাবিক নিযমেই, তর্কের দিকে ঝোঁকটা বেশি রমেনের। বীরেশবাবুর বাড়িটা একটা মস্তবড় 'আকর্ষণ' হইযা পড়িল। হারিবার ইচ্ছা না থাকিলে হারার প্রশ্ন ওঠে না। এই তো সুকুমার রহিয়াছে, এতদিন ধরিযা যাওয়া-আসা করিতেছে, বড তার্কিক নযই, বরং এত সহজে আর বিনযের সঙ্গে প্রতিপক্ষের কথা মানিযা লয যে, মনে হয যে-কোন মুহূর্তেই ধর্মান্তর গ্রহণ করিবে; কিন্তু তবুও তো এখনও সেই খদ্দরধারী অটল কংগ্রেসী। রমেনের আবার রাজনীতি মানে মাত্র তর্ক, যদি ধর্মান্তরই গ্রহণ করে, বিরোধই যায মিটে তো ওর রাজনীতি থাকে কোথায?

তবু করিল গ্রহণ।

বৈঠকখানায যেখানটায বসে, সেখান থেকে বাইরের বারান্দা, এমন কি বাইরের উঠানেরও খানিকটা দেখা যায। একদিন সন্ধ্যার পর জোর তর্ক চলিযাছে। বিষযটা ছিল, যুদ্ধের সময ভারতীয় কম্যুনিস্টদের আচরণ। তর্কের সুবিধা রমেনেরই, বেশ জোরও

লাগাইয়াছিল, এমন সময় একটি মেয়ে গটগট করিয়া আসিয়া বারান্দায় উঠিল এবং একবার এঘরের দিকে চকিতে মুখটা ঘুরাইয়া আবার বারান্দা দিয়া ওদিককার ঘরে চলিয়া গেল। যেমন ভাবে চলা, তাহাতে নজর পড়িল বোধ হয় শুধু রমেনেরই।

মেয়েটি বীরেশবাবুর বোনেদের মধ্যে কেহ নয়। বয়স সতের-আঠার বলিয়া মনে হইল। এদিকে ঘুরিতে বারান্দার মধ্যেকার বাল্বের আলোটা মুখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার মুখটা ওদিকে ঘুরিয়া গেল। যেমন ভাবে চলিয়া গেল তাহাতে মনে হইল এই বাড়িরই মেয়ে। অবশ্য রমেন আজ এই প্রথম দেখিল।

বীরেশবাবু একেবারে ভিতরের দিকে একটা ইজিচেয়ারে। রমেনের তর্কের গলা যে হঠাৎ কেন অমন স্তিমিত হইয়া গেল বুঝিতে পারিলেন না।

ঘটনাটি ছোট, কিন্তু রমেনের জীবনে অনেকগুলি দ্রুত পরিবর্তন আনিয়া দিল। প্রথমত বীরেশবাবুর বাসায় যাতায়াত বাড়িয়া গেল। ঐটুকু আসিতে বুকের ধুকধুকুনি যায় বাড়িয়া,—বারান্দা, প্রাঙ্গণ পর্যন্ত দেখা যায়- -সেই চেয়ারটি খালি আছে তো? —তর্কের ঝাঁজ কমিয়া আসিল, তাহার পর উত্তর দেবার উৎসাহ কমিয়া শ্রদ্ধাভরে বীরেশবাবুর কথাগুলা শোনার প্রবৃত্তিটা গেল বাড়িয়া। ক্রমে দেখা গেল এক-আধটা কথা মানিয়াও লইতেছে, তাহার পর এমনও হইল, বাহ্যত প্রতিপক্ষ হইলেও বীরেশবাবুর তর্কেই এক-আধবার সাহায্য করিয়া বলিতেছে।

ইতিমধ্যে মেয়েটিকে দেখিলও কয়েকবার। ঘুরিয়া চাহিল, আর মুখে আলো পড়িল এমন যোগাযোগ কমই হয়। তবে উঠিয়া আসিল, শরীরটা ঘুরাইয়া ও-ঘরে চলিয়া গেল, এ দৃশ্য এই সপ্তাহখানেকের মধ্যে বার-পাঁচেক চোখে পড়িল। একদিন বাড়ি হইতে বাহির হইয়া বারান্দা দিয়া নামিয়া গেল, দিনের বেলা। সেদিন সম্পূর্ণ ছবিটি দেখিল রমেন।

সুকুমারকে প্রশ্ন করিতে অত্যন্ত বাধ-বাধ ঠেকে। একে এর মধ্যে কয়েকবারই ঠাট্টা করিয়াছে—"তুমি তো দেখছি মাথা মুড়োলে বলে রমেন! বলি নি যে তোমায় হারাতে হবে?"

তবুও একদিন তুলিল কথাটা -"হোক কম্যুনিস্ট, কিন্তু নিজেদের কাজে সবাই বড় সিন্‌সিয়ার হে, এ যশটা দিতে হয়। ঐ একটা মেয়ে--বীরেশবাবুর বোন নয়—এমন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে যায় যেন পার্টির যত কাজ একা ওরই হাতে—দেখলাম কিনা একদিন হঠাৎ।"

সুকুমার শুধু একটু হাসিল, উত্তর দিল না ; সুতরাং কথাটা আর বাড়ানো গেল না।

মেয়েটি কে?- অথচ এই বাড়িরই মেয়ে তো-এই আপাদমস্তক কম্যুনিস্টদের বাড়ির।

দিন চার-পাঁচ প্রাণপণে যুঝিল রমেন -সঙ্কোচের সঙ্গে, বিবেকের সঙ্গেও, কেননা রমেনদেরও বিবেক থাকে একটা ; তাহার পর জিতিল। -অর্থাৎ হারিল। সুযোগ খুঁজিতেই ছিল, একদিন বীরেশবাবুকে একা পাইয়া বলিল -"আপনার তর্কে আমি কন্‌ভিন্‌সড হয়ে গেছি, আমায় কাজ দিন।"

এর পর অবশ্য আর সবাইও জানিল : ঐ প্রথম বলাটুকুতেই যত বাধা থাকে কিনা। সুকুমারও শুনিল, সহিয়া সহিয়া ব্যাপারটা এই পরিণতিতে আসিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় বিশেষ বিস্মিত বা বিচলিত হইল না।

তাহার পর আর মাত্র একটি দিনের কথা।

সন্ধ্যার পর। বর্ষা নামিযাছে বলিয়া কেহ আসে নাই, আছে শুধু সুকুমার, রমেন আর বীরেশবাবু।

যেমন একটু সদা-অন্যমনস্ক, ব্যস্ত-সমস্ত ভাব, সেইভাবেই এ মেয়েটি আসিয়া এই ঘরে প্রবেশ করিল, হাতে একটা ফ্লানেলের হাফ-শার্ট, বলিল -"এই জামাটা গাযে দাও বাবা, জোলো হাওযাটা ঠাণ্ডা।"

বীরেশবাবু বলিলেন—"এই দেখো! তুইও কম্যুনিস্ট বাবার ঘর মাড়াবি না সিপ্রা, রমেনের সঙ্গে তোর পরিচযও করে দেওয়া হযে ওঠে নি। রমেন রায, আমার একেবারে নতুন শিষ্য।—এ হচ্ছে সিপ্রা, রমেন, আমার মেয়ে—তোমার মতন এতবড উগ্র কংগ্রেসীকে ছিনিয়ে আনতে পারলাম রমেন, কিন্তু আমার মেয়ের কাছে আমি এখনও পরাস্ত। আমাব মেয়ের কাছে আর সুকুমারের কাছে—এই দুটি ব্ল্যাক শীপ্ রযেই গেল বোধ হয় আমার গণ্ডীর মধ্যে—"

নিজের রসিকতায বেশ প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

* * *

রমেন রায ও-মেস আব ও-পাডাও দিযাছে ছাডিযা।

স্বরাজ—ছেলে

কুমুদবন্ধু বি. এন. রেলওযের পার্বতীপুর স্টেশনে কাজ কবিতেছিলেন। চেষ্টা-চবিত্র করিয়া বদলির হুকুমগুলা রদ কবাইযা সতের বৎসব এক জাযগায় কাটিল : দু-পযসা পাইতেন, শহরে জাযগা-জমি কিনিযা বাডি-বাগান করিযা বেশ গুছাইযা লইযাছিলেন, এমন সময গোলমাল আরম্ভ হইল। কলিকাতা, ঢাকা, নোযাখালি। তাহাব পব পার্বতীপুবেও দু-একটা মাঝারি গোছের ধাক্কায সাক্ষাৎ পরিচয় দিয়া গেল। তাহার পর আসিল স্বাধীনতার সঙ্গে দেশ বিভাগ এবং সেই সঙ্গে লোক-বিভাগও। কর্মচাবীদেব বলা হইল তোমবা কে কোন্ দিকে থাকিতে চাও বাছিযা লও। পরাধীনতার আমলেই পাকিস্তানী স্বাধীনতাব নমুনা পাওয়া গিয়াছিল, কুমুদবন্ধু হিন্দুস্থানের সপক্ষে নাম লিখাইলেন। কিছুদিন পত্রাচারে কাটিল, তাহার পর যখন এদিকেও অতিষ্ঠ করিয়া তুলিযাছে, ওদিকেও আসাব কোন লক্ষণ নাই, এমন সময যুক্তপ্রদেশের একটি বড রেল অফিস হইতে ডাক পডিল, পার্বতীপুবেব সতেব বৎসবেব বাস উঠাইয়া কুমুদবন্ধু সপরিবারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নিতান্ত কম নয -নিজে, স্ত্রী, দুইটি কন্যা, চারিটি পুত্র—বছর দশের মধ্যে ; বিধবা এক দিদি, তাঁহার একটি ছোট দৌহিত্র।

আসিয়াই একেবারে অকুলে পডিলেন।

প্রথম সপ্তাহটা প্ল্যাটফর্মে কাটাইতে হইল। তাহার পর ওযেটিং বুমের সামনের বারান্দায়। দিদি মহামায়া খুব শক্ত মেয়েমানুষ, কিন্তু তিনিও এক সপ্তাহে অধিক অগ্রসব হইতে পারিলেন না। তবে লডাইয়ের জন্য পা পুঁতিবার একটা জাযগা পাইলেন এবং দুই দিন পরেই ওয়েটিং বুমেব একটি কোণ স্বীয পরিবারের জন্য দখল করিলেন।

কোন ব্যবস্থা নাই, অসংখ্য লোক পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আসিয়া

পড়িয়াছে, প্রতিদিনই আরও আসিতেছে। কাহারা ডাকিতেছে, কি উদ্দেশ্যে, কিছুরই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। সকালবেলায় উঠিয়া মহামায়া তোলা উনানে ওয়েটিং রুমের মধ্যেই রান্নার ব্যবস্থাটা করিয়া ফেলেন, দুইটি কোনরকমে নাকেমুখে গুঁজিয়া কুমুদবন্ধু সেই যে বাহির হন, ফেরেন একেবারে সন্ধ্যার সময়। ইহার মধ্যে কত অফিস ঘোরেন, কত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন—কোনো ফলই হয় না। রেলটার অব্যবস্থার কথা পূর্বে শোনা ছিল, কিন্তু সেটা যে এ ধরণের কিছু হইতে পারে এমন জানা ছিল না। মাসখানেক ওয়েটিং রুমে কাটিল, পশ্চিমের শীত বেশ ভাল করিয়া জাঁকিয়া আসিতেছে, দিদির মেজাজ অত্যন্ত বিগড়াইয়া যাইতেছে, প্রত্যহই ওয়েটিং রুমটার রান্নাঘরের ধোঁয়া জমিয়া উঠিলে স্টেশন মাস্টার থেকে স্টেশনের যত কর্মচারী আসিয়া দরজার বাহিরে জমা হয়, ওদিকে মহামায়াও আসিয়া দাঁড়ান, গাছকোমর বাঁধা, হাতে খুন্তি : মুখে তুবড়ি ছুটিতে থাকে—"ড্যাকরারা, অলপ্পেয়েরা, ডেকে এনে না দেবে চাকরি, না দেবে থাকবার জায়গা, ঐ ম্লেচ্ছ কাপড়-চোপড় নিয়ে আমার রান্নাঘরের চৌকাঠের এদিকে পা দিলে একধার থেকে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব। আয় না, হেম্মৎ থাকে, আয়!"

এংলো-ইন্ডিয়ান স্টেশন মাস্টার একবার দায়ে খালাস হওয়া গোছের চেষ্টা করিয়া সরিয়া পড়ে, বেচারাদের দুর্দিন পড়িয়াছে, এখন সবই সম্ভব, খুন্তিপেটা খাইলেও আহা বলিবার কেহ নাই। দেশী কর্মচারীরাও একে একে পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়, মহামায়াই রেজ জেতেন, কিন্তু এভাবে আর চলে না, কুমুদবন্ধুর কতবার মনে হইয়াছে আবার পার্বতীপুরে গিয়াই যেমন করিতেছিলাম সেইরূপ চাকরি করি, কিন্তু কয়েকবারই সন্ধান লইয়া জানিয়াছেন ও-পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এদিকে এরা মুসলমানদের জন্য দুয়ার খুলিয়া রাখিলেও, ওদিকে ওরা অর্গলিত করিবারও হাঙ্গামা রাখে নাই, দুয়ারের জায়গায় দেয়াল তুলিয়া দিয়াছে, আর কোন আশাই নাই।

শীত প্রচণ্ড হইয়া আসিল, হাতের পয়সা ফুরাইয়া আসিয়াছে, অবশেষে তিক্ত-বিরক্ত হইয়া কুমুদবন্ধু চাকরির আশা ত্যাগ করিয়া নিতান্তই অদৃষ্টের ওপর নিজেদের ছাড়িয়া বাড়িতে ফিরিয়া যাইবেন স্থির করিয়াছেন, এমন সময় পার্বতীপুর অফিস ঘুরিয়া তাঁহার হাতে একখানি বড় খাম আসিয়া পড়িল। খুলিয়া দেখিলেন—তাঁহার চাকরি হইয়াছে এই স্টেশনেই, হিসাবের সেরেস্তায় : বাসাও ঠিক হইয়াছে, একখানি চার-চাকার, অর্থাৎ সবচেয়ে যা ছোট সেই রকম মালগাড়ি। কুমুদবন্ধু ওটাকে লেখা-পড়া করাইয়া আট-চাকার করাইয়া লইলেন, এর পিছনে এংলো-ইন্ডিয়ান স্টেশন মাস্টার ও অন্যান্য কর্মচারীদের যে অক্লান্ত চেষ্টা ছিল এটুকু না বলিলে অধর্ম হয়, অবশ্য তাহার পিছনে ছিল মহামায়ার রান্নার খুন্তি আর ক্ষুরধার জিহ্বা।

ওয়েটিং রুম ছাড়িয়া সকলে নূতন সচল বাসায় গিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন

২

একেবারেই অভিনব ধরণের পল্লী। বিরাট স্টেশন-প্রাঙ্গণের একধারে এমন প্রায় দেড়শ'খানা মালগাড়ি, চার-চাকার, ছয়-চাকার, কয়েকখানা আট-চাকারও, ঐ এক-একখানা বাড়ি। অসহ্য কষ্ট, জায়গা নাই, দিনের বেলায় তাতিয়া ওঠে, শীতের দিন বলিয়া আরামের না হইলেও খুব বেশি কষ্টও হয় না, কিন্তু রাত্রে অসহ্য। প্রায় সবই পূর্ববঙ্গের লোক, পশ্চিমের

নিদারুণ শীতে যেন জমিয়া যাইবার মতো হয়। কয়লাও প্রচুর নয়, সন্ধ্যার একটু আগে প্রত্যেক বাসার সামনে সারি সারি তোলা উনুনে আগুন জ্বলিতে থাকে, সমস্ত পাড়াটা ধূমে ধূম্রাকার হইয়া ওঠে ; উনুন ধরিলেই সেগুলা গাড়ির মধ্যে উঠিয়া যায়, তাহাতে রান্না, তাহাতেই যতটা সম্ভব তাপসঞ্চয়। শেষরাত্রে শীতে আর কাহারও ঘুম হয় না, সবাই গুটিসুটি মারিয়া বসিয়া থাকে।

তবুও মানুষ পরের দুরবস্থা দেখিয়া আশ্বাস পায়, শত শত লোক প্ল্যাটফরমে পড়িয়া আছে, এ তবুও তো একটা আচ্ছাদন। দিনের বেলা এই দুঃখের জীবন থেকে যতটা পারে রস নিংড়াইয়া লয় লোকেরা, ছেলেরা হুটোপুটি করে, গৃহিণীরা বৌ-ঝিয়েরা এ-বাসা সে-বাসা ঘুরিয়া আলাপ করিয়া বেড়ায়, কোয়ার্টার্সের জন্য কোথায় এই পড়িতেছে সেই সব আলোচনা লইয়া আশায় বুক বাঁধে। মানুষের সবই সয়, তা ভিন্ন এটা বিশেষ করিয়া সহিবারই যুগ, একটা কল্পনার ভবিষ্যৎ গড়িয়া লইয়া মানুষ কল্পনাতীত এই বাস্তব বর্তমানকে ভুলিতেছে। কুমুদবন্ধুর পরিবারও ধীরে ধীরে এই দলে মিশিয়া যাইতেছে। পাঞ্জাবে যা কাণ্ড হইতেছে সে হিসাবে এ ত স্বর্গ, পার্বতীপুরের কথা আর ভাবাও যায় না।

কিন্তু এ স্বর্গও কপালে বেশি দিন কাটিল না।

প্রথমটা বাদ সাধিল পয়েণ্টসম্যান রামদিন, পাইলট ড্রাইভার করিম শেখের সহযোগিতায়। অবশ্য ভুল করিযাই, তবে সে-ভুলেও এই রেলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে।

বাসাগুলি স্টেশন-প্রাঙ্গণের নিতান্ত একদিকে পড়িয়া আছে বটে তবে একেবারে যে স্থাণু এমন নয়। লাইনের ওপর মাঝে মাঝে চলাফেরা করে। প্রত্যহ নূতন বাসা আসিতেছে, তাহাদের জায়গা দিতে হয়, রোজই দু'একখানা করিয়া পুরানো বাসা স্থানান্তরিত হইতেছে, হয়ত কেহ অন্য স্টেশনে বদলি হইল, হয়ত কোন বাসার অধিকারী পাকা কোয়ার্টার্স পাইল, তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিতে হয়। ডিপার্টমেণ্টে হুকুম দেয়, পয়েণ্টসম্যানের নির্দেশে পাইলট ইঞ্জিনে কাজটা সম্পন্ন করে। ছেলেমেয়েরা, বধূ-গৃহিণীরা মাঝখান থেকে খানিকটা গাড়ি চড়ার আনন্দ উপভোগ করিয়া লয়। এমনও হয় কর্তা অফিস থেকে আসিয়া দেখেন বাসা নাই, হয়ত লাইনের ভেতরের দিকের একটি বাসা অন্য স্টেশনে বদলি হইযাছে, তাঁহার বাসাটিকে পথ ছাড়িয়া অন্য লাইনে একটু সরিয়া দাঁড়াইতে হইযাছে। খানিকক্ষণ পরে পাইলট ইঞ্জিন আবার ল্যাজে করিয়া আনিয়া রাখিয়া গেল।

এই রকম কিছু একটা ব্যাপার কুমুদবন্ধুর বাসা লইয়াও হইতেছিল সেদিন সন্ধ্যাবেলায়।—

পয়েণ্টসম্যান রামদিনের ডিউটির শেষ দিক এটা, এইটুকু শেষ করিযা নিজের বাসায যাইবে, এক লোটা ভাঙ্ তৈয়ার আছে সেবন করিয়া দড়ির খাটিয়ায গা এলাইযা দিবে। একটু ব্যস্ত আর অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে। পাইলট করিম শেখের ডিউটিব এই আবম্ভ, একটু বাঁধামাত্রার নেশা করিয়া কাজে নামে, কাজ করিতে করিতে সেটা কাটিয়া যায। ঠিক কাটার অবস্থাটা এখনও দাঁড়ায় নাই।

কুমুদবন্ধু অফিস থেকে ফিরিয়া একটু জলযোগ করিয়া এই সময়টা ক্লাবে যান, সেখানেই গেছেন। শীত বেশ জমিয়া আসিয়াছে। লোহার উনুনটা ধরিয়া গেছে, সেটাকে গাড়ির মধ্যে তুলিয়া দু'দিককার ঝাঁপ বন্ধ করিয়া রান্নার আয়োজন হইতেছে, এমন সময় রামদিনের গলার 'হুঁসিয়ার ! হুঁসিয়ার !' শব্দ হইল এবং পাইলট আসিয়া আস্তে আস্তে

গাড়িটার সঙ্গে যুক্ত হইল। মহামায়া দরজার ফাঁক দিয়া মুখটা বাড়াইয়া বলিলেন—"কে, রামদিন ? আমরা রান্না আরম্ভ করেছি, আস্তে নাড়াচাড়া করতে বলো ড্রাইভারকে।"

"আপনি মজেসে রসুই করুন মাইজি, কুছু ভয় নেই"—বলিয়া রামদিন কাপলিংটা বসাইয়া দিল, ইঞ্জিন ধীরে ধীরে বাসা লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

খানিকটা দূরে অন্য একটা লাইনে গাড়িটাকে দাঁড় করাইয়া ইঞ্জিনটি আবার এই লাইনে প্রবেশ করিল, কুমুদবন্ধুদের পাশের গাড়িটা জুড়িয়া আবার সেই ভাবে বাহির করিয়া লইয়া প্ল্যাটফর্মের কাছাকাছি একটা লাইনে রাখিয়া আসিল। অন্য দুই-তিনটি লাইনে প্রবেশ করিয়াও গোটাকতক গাড়ি লইয়া ঐরকম টানা-পোড়েন করিল ; ততক্ষণে রাত্রি হইল, রামদিনের ডিউটি শেষ হইয়া আসিল, পরের পয়েণ্টসম্যান রামচরিত্তরকে কোথায় কোন্ গাড়ি যাইবে, কোন্ গাড়ি বাহির হইবে সব বুঝাইয়া দিয়া নিজের কোয়ার্টার্সে চলিয়া গেল।

৩

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় এই মাস দুয়েকের অভ্যাসমত ইয়ার্ডের বিদ্যুতের আলো আর টর্চের সাহায্যে লাইন ডিঙাইয়া ডিঙাইয়া যথাস্থানে আসিয়া কুমুদবন্ধু সেজ ছেলের নাম ধরিয়া ডাকিলেন—"ওবিনেশ !"

অবিনাশ দোরের কাছে কিছু জিনিসপত্র থাকিলে সরাইয়া লইবে, তাহার পর কুমুদবন্ধু গাড়িতে উঠিবেন, এই হইতেছে প্রাত্যহিক ব্যবস্থা, কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না। দারুণ শীতে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া হি-হি করিতে করিতে কুমুদবন্ধু আবার হাঁকিলেন—"ওবিনেশ, শুনছিস না। জিনিসগুলো সরিয়ে নে, উঠব—"

বন্ধু দরজা খুলিয়া উঠিতে যাইবেন, ভিতর থেকে একটি পশ্চিমা ছেলে বলিল—"ই গাড়ি নেহি।"

"তবে !" বলিয়া কুমুদবন্ধু তিন হাত পিছাইয়া আসিলেন। ঠাহর করিয়া দেখিলেন এটা তাঁহার পাশের গাড়িটা, পাশাপাশি তিনটা আটচাকার লম্বা গাড়ি ছিল, তাই ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন দারুণ শীতের এই জবড়জঙ্গ অবস্থায়। সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু শীত ছাড়িয়া গিয়া কালঘাম ছুটিল—তাহা হইলে তাঁহারটা কোথায় ?

সেই ছেলেটিকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—"আমারটা কোথায় তা হলে ?"

"শাণ্টিংমে লে গিয়া।"

"কখন ?"

"সামকো।"—অর্থাৎ সন্ধ্যার সময়।

"কোথায় ? কোন্‌দিকে ? এখনও ফেরে নি কেন ?"

ছেলেটি তিনটি প্রশ্নের কোনটিরও উত্তর দিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত কুমুদবন্ধুর মুখ দিয়া কোন প্রশ্ন সরিল না। এরকম ব্যাপার এখানে কয়েকবার হইয়াছে, একবার তিনিও ভুক্তভোগী, কিন্তু সে কয়েক মিনিটের জন্য, বড়জোর আধঘণ্টা। অফিস হইতে আসিয়া দেখেন বাসা নাই, তাহার পর তখনই আবার পাইলট ইঞ্জিন রাখিয়া গেল। এ যে সন্ধ্যা থেকে উধাও, রাত ন'টাতেও দেখা নাই !

তৃতীয় গাড়িটা একজন বাঙালীর, এক অফিসেই কাজ করেন, কুমুদবন্ধুবাবু সামনে গিয়া ডাকিলেন—"গোপেশবাবু !"

গাড়ির দরজা খুলিয়া গোপেশবাবু মুখ বাহির করিলেন।

"আমার গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না মশাই!"

"তাব মানে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনলাম সন্ধ্যের শাণ্টিঙে নিয়ে গিয়েছিল—নিশ্চয় মিশিরজীর গাড়িটা বের করবার জন্যে, তাঁর তো বদলি হয়ে গেল,—সেই থেকে এখনও পর্যন্ত ফিরে আসে নি—সব নেশাখোরদের কাণ্ড, কারুর তো নজর নেই এদিকে—"

"কাছাকাছি ইয়ার্ডটা দেখেছেন?"

"না, দেখি নি এখনও, এই শুনলাম সুরুজপ্রসাদবাবুর ছেলের কাছে।"

"দাঁড়ান, আসছি।"

ওভারকোট, র‍্যাপার, কম্ফর্টারে আপাদমস্তক ঢাকিয়া গোপেশবাবু নামিয়া আসিলেন। দুইজনে কাছাকাছি সমস্ত ইয়ার্ড খুঁজিলেন, তাহার পর দূরেও। পয়েণ্টস্‌ম্যান, পাইলট ড্রাইভার দুইজনকে প্রশ্ন করিলেন, গাড়ির কিন্তু কোন হদিস পাওয়া গেল না। প্রায় ঘণ্টা দুযেক হয়রান হইয়া অবশেষে ইয়ার্ডের এক প্রান্তে দেখা গেল একটি আট-চাকার গাড়ি একক দাঁড়াইয়া আছে। আশায় বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল, তাহার পর দুইজনে আগাইয়া নম্বরের উপর টর্চ ফেলিযা দেখেন মিশিরজীর গাড়িটা। ডাকাডাকি করিয়া মিশিরজীকে তুলিলেন, খবর পাইলেন পার্সেল এক্সপ্রেসের পেছনে তাঁহার গাড়িটা আজ জুড়িয়া তাঁহার নূতন কর্মস্থানে পৌঁছাইবার কথা ছিল, কিন্তু জোড়ে নাই। কারণটা জিজ্ঞাসা করায় এই রেলওয়েটাকে একটা কুৎসিত গালাগাল দিয়া বলিলেন- কারণ তিনি জানেন না, শুধু এইটুকু জানেন এ রেলে সবই সম্ভব, যবে খুশি লইয়া যাইবে, তিনি নিশ্চিন্ত হইযা ঘুমাইতেছেন।

কি সর্বনাশ যে হইয়াছে বুঝা গেল। দুইজনে স্টেশনে ছুটিলেন। স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে দেখা করিয়া জানাইলেন—তাঁহার গাড়িটা ভুলক্রমে সাতটা বাইশের পার্সেল এক্সপ্রেসে যুক্ত হইয়া স্টেশন ছাড়িয়া গিযাছে, সন্ধ্যান লইয়া সেটাকে আটকানো দরকার। সমস্ত ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত বলিয়া গেলেন।

এ ধরণের বা এর চেযেও গুরুতর এত ব্যাপার নিত্য হইতেছে এ-রেলে যে, স্টেশন মাস্টারের মুখে বিশেষ কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। অলসভাবে টেলিফোনটা তুলিয়া লইয়া ডাকিলেন—"হ্যাল্লো, কনট্রোল!—"

সাডা পাওয়া গেলে প্রশ্ন করিলেন—"সেভেন্‌টি-সিক্স ডাউন পার্সেল এখন কোথায়?—"

রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটা, গাড়িটা সব জায়গায় ধরে না, চার ঘণ্টায় অনেকগুলি স্টেশনই পার হইয়া গিয়াছে, কনট্রোল একটু অনুসন্ধান করিয়া সঠিক অবস্থানটা জানাইল-রাস্তায় আছে আর মিনিট পাঁচেক পরেই একটা বড স্টেশনে পৌঁছিবে।

স্টেশন মাস্টার ব্যাপারটা জানাইলেন—অমুক নম্বরের গাড়ি অমুক স্টেশনে যাইবার কথা, তাহার স্থানে ভুলক্রমে অমুক নম্বরের গাড়ি চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে খুলিয়া লইয়া পরবর্তী এক্সপ্রেস বা কোন প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে জুড়িয়া পাঠাইয়া দিতে হইবে। নির্দেশটুকু দিয়া ফোন ছাড়িয়া তিনজনে মুখোমুখি হইয়া বসিযা রহিলেন। একটু যে গল্প হইল তাহাতে স্টেশন মাস্টার জানাইলেন—"ও গাড়ি এখন বিশ-বাঁও জলে।"

"কেন?"

একটু থামিয়া নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলিলেন—"এই দেখুনই না, এটা কি রেল ভুলে যাচ্ছেন যে, এর নামই পড়েছে ওল্ড টায়ার্ড—"

এমন সময় টেলিফোনটা বাজিয়া উঠিল, স্টেশন মাস্টার তুলিয়া লইয়া সাড়া দিলেন—"হ্যালো—ইয়েস– তাই নাকি ?– তা হ'লে ?—বেশ, পার্টি বসে আছেন ততক্ষণ—খোঁজ নিয়ে বলুন।"

টেলিফোনটা রাখিয়া দিয়া কতকটা বিজয়ের হাসি হাসিয়াই বলিলেন—"ঐ নিন, সে গাড়ি পৌঁছোয়ই নি ও-স্টেশনে। আপনাকে বললাম না ?"

"পৌঁছোয় নি ! তা হ'লে ?"—কুমুদবন্ধু একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

"থামুন, খোঁজ নিচ্ছে। এ স্টেশনে আবার গার্ডের বদলি হ'ল, আগেকার গার্ড রানিং-রুমে চলে গিয়েছে, তার কাছে লোক পাঠানো হয়েছে।"

"কিন্তু সে তো সমস্ত চার্জ বুঝিয়ে যাবে-"

"বোধ হয় এটা ছেড়ে গিয়েছে—রেলটা যে কি ভুলে যাচ্ছেন যে আপনি—এর আগেকার নাম রেখেছিল বদমাইস, নালায়েক—"

এমন সময় টেলিফোনে শব্দ হইল—স্টেশন মাস্টার আবার তুলিয়া লইলেন-

"হ্যাল্লো আচ্ছা—বেশ আচ্ছা আচ্ছা—"

টেলিফোনটা রাখিয়া দিয়া সেই রকম নিরুদ্বেগ কণ্ঠে জানাইলেন টেলিফোনে বলিতেছে—এ স্টেশন ছাড়িয়া পরের স্টেশনে পৌঁছাইতে গাড়ির শেষের দিকের মালগাড়ি থেকে একটা কান্নাকাটি হট্টগোল ওঠে। স্টেশনের সবাই জড়ো হইয়া টের পায়—এক গাড়ির বদলে অন্য গাড়ি জুড়িয়া লইয়া চলিয়াছে পার্সেলটা। গাড়িটাকে কাটিয়া সাইডিঙে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। এদিকে ওমুখো আর গাড়ি নেই, একেবারে শেষরাত্রির দিকে এক্সপ্রেস, তাহাতেই জুড়িয়া ফেরত দেওয়া হইবে।

আর কিছুই তাহা হইলে করিবার নাই। বেশি দূর নয়, এদিক থেকে ধরিলে হয়তো স্টেশন পরেই, কিন্তু ডাউনের কোন গাড়ি নাই যে, কুমুদবন্ধু গিয়া পরিবারের সঙ্গে মিলিত হন। মালগাড়ি থাকিলেও চলিত, কিন্তু খবর পাইলেন যে তাহাও আর নাই, একটা ছিল, মিনিট দশ হইল ছাড়িয়া গিয়াছে।

স্টেশন মাস্টার আর একটা খবর দিলেন ; এই ধরণের দুর্ঘটনার সম্প্রতি বাড়াবাড়ি হওয়ায় এর জন্য অফিসে একটা বিভাগই খোলা হইয়াছে, সকাল ছয়টা হইতে বসে। এক্সপ্রেসে যদি মালগাড়িটা আসিয়া না পড়ে, কুমুদবন্ধু যেন অফিসেই খবর নেন, কেননা সকাল থেকে স্টেশন কর্মচারীদের হাতে কাজের চাপ, ইচ্ছা থাকিলেও এই রকম টেলিফোন ধরিয়া সাহায্য করিতে পারিবে না। অফিসটার সন্ধানও দিয়া দিলেন।

কুমুদবন্ধু একটু ভীত ভাবেই বলিলেন—"সকালের এক্সপ্রেসে নিশ্চয় এসে পড়বে—"

স্টেশন মাস্টার শুধু একটু মুচকি হাসিলেন, বলিলেন—"এসে পড়ে ভালই, আপনাকে আর অফিসে দৌড়োতে হবে না।"

৪

এক্সপ্রেসটা পৌঁছবার সময় পাঁচটা, সাড়ে সাতটায় আসিল। মালগাড়িটা নাই। কুমুদবন্ধু চারিটা থেকে আসিয়া বসিয়া আছেন, অবসন্ন শরীরে নূতন অফিসে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

একটি ছোট ঘর, মাঝখানে টেবিলের সামনে একজন অত্যন্ত স্থূল আধ-বুড়োগোছের ভদ্রলোক বসিয়া আছেন, বাঙালীই। অন্য একটি টেবিলে মুখোমুখি হইয়া দুইজন পশ্চিমা ছোকরা কেরানী, একজন টাইপিং লইয়া আর একজন কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত রহিয়াছে। শীতের সকাল, তায় নূতন অফিস, এখনও অনেকে সন্ধানই জানে না, তবুও কাউণ্টারে পাঁচ-সাতজন লোক ভিড় করিয়া রহিয়াছে।

কুমুদবন্ধু দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আমি রেলেরই লোক, এই স্টেশনেই থাকি, ভেতরে আসতে পারি কি ?"

"আসু-ন"—ভদ্রলোক টানিয়া কথাটা বলিয়াই কাশিতে আরম্ভ করিলেন, সেই অবস্থাতেই ডান হাতটা সামনের চেয়ারের দিকে বাড়াইয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। গলায় একটা কম্ফর্টারের ওপর র‍্যাপাব জড়ানো, কাশিটা থামিলে দুটাকেই আরও টানিয়া দিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি ব্যাপার ?"

"একটা বড় বিপদে পড়া গেছে—ইয়ে, পাকিস্তান থেকে এসেছি, আছি মালগাড়িতে, কাল সন্ধ্যেয় সেটা পার্সেল এক্সপ্রেসে—"

"টেনে নিয়ে গেছে ?—প্রাতর্বাক্যে বলা ঠিক নয়, কিন্তু আর আশা নেই—"

"আশা নেই কি মশাই !"

ভদ্রলোক টানিযা টানিযা কথা বলেন, এদিকে একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব লাগিয়া আছে, তুড়ি দিতে দিতে হাই তুলিলেন,তাহার মাঝখানেই কাশি আসিয়া পড়িল, সব শেষ হইলে বলিলেন—"আৎমারাম, লস্ট্ ওয়াগন্স্‌কা ফাইল সব উতারো তো।"

কুমুদবন্ধু লক্ষ্য করিলেন অফিস নূতন হইলেও ফাইলের গাদা লাগিয়া গেছে এরই মধ্যে, একজন কেরানী উঠিযা কাঠের র‍্যাক্ থেকে এক থাক্ নামাইয়া আনিল। ভদ্রলোক সেই রকম অলসকণ্ঠে বলিলেন—"ঐ দেখুন, বিশ্বাস না হয়—পঁয়ত্রিশখানা মালগাড়ি সমস্ত লাইনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মা-বাপ নেই—ক্লাসিফিকেশন, আৎমারাম— ?"

"ট্রেন্ উইথ্ ফ্যামিলি হুজুর, অলেভুন উইথ, ফ্রেট্, ফোবটিন্ এম্পটি--"

"ঐ নিন—দশখানা আপনার মত পরিবার নিয়ে, এগারখানায় মাল, বাকি খালি।-- প্যাঁকাল মাছের মতন পিছলে পিছলে বেড়াচ্ছে সমস্ত লাইনে, ধরবার উপায় নেই, আজ খোঁজ পেলেন এই পাশের স্টেশনে, ধরবেন ক্যাঁক করে, কাল খবর এল একশ' মাইল দূরে একটা সাইডিঙে পড়ে আছে—"

হাই তুলিয়া কাশিয়া কম্ফর্টার র‍্যাপার টানিযা দিয়া বলিলেন—"খেলে কচুপোড়া ! বুড়ো বয়সে বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে এসে এক ছেঁড়া ন্যাতা হাতে দিযে—তারপর আর কিছু পেয়েছেন খবর, না ঐ পর্যন্ত ?"

কুমুদবন্ধুর মুখ একেবারে শুকাইয়া গেছে, বলিলেন—"কাল রাত্তিবে খবব পাওয়া গেল এখান থেকে পাঁচটা স্টেশন আগে একটা সাইডিঙে পড়ে আছে—এদিককার নামগুলোও মনে থাকে না—পার্সেলের ফার্স্ট স্টপেজ আর কি—ঠিক ছিল সকালের এক্সপ্রেসে জুড়ে নিয়ে আসবে, তা আসে নি।"

ভদ্রলোক অলসভাবে টেলিফোনটা তুলিয়া লইলেন, ডাকিলেন—"হ্যালো কনট্রোল !"- সাড়া পাওয়া যাইতে আগাগোড়া সমস্ত খবরটা দিয়া গেলেন। তাহার পর টেলিফোনটা রাখিয়া দিয়া বলিলেন—"খোঁজ নিচ্ছে।"

একটু যে সময় পাওয়া গেল তাহাতে নিজের দুঃখের কথা তুলিলেন—নাম অনুকূল

ভাদুড়ী। রিটায়ার করিয়া বসিয়া ছিলেন—ছোট মেয়েটির বিবাহ দিয়া এইবার দু'জনে কাশীবাসী হইবেন, আবার ডাকিয়া এই ফ্যাসাদ—হাতে আছে পাত্র-টাত্র একটা?—এই পেটে একটু বিদ্যে থাকে—কিছু জমি-জমা—নেহাত চাকরির ওপরই না ভরসা—চাকরির সুখ তো দেখাই যাইতেছে—

এমন সময় টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। তুলিয়া বলিলেন—"হ্যালো!—আচ্ছা—ঠিক—"

রাখিয়া দিয়া একটু বিজয়ের হাসি হাসিয়াই বলিলেন—"ঐ নিন্, যা বলেছিলাম—সে গাড়ি ও স্টেশনে আর নেই—"

"বলেন কি!—নেই?—আমি ভেবেছিলাম বুঝি ভুলে—"

"নেই।—তার কারণ হয়েছে, হাণ্ড্রেড্ টোয়েন্টি সিক্স ডাউন গুড্স্ বাত আডাইটের সময় শান্টিং করতে করতে ভুল করে তুলে নিয়ে গেছে।"

"তার পর?"

"কোন্ স্টেশনে ড্রপ করলে খবর পেতে দেরি হবে, এক এক করে জিগ্যেস করবে তো?"

বহু দূরে দুইটা স্টেশনের নাম করিয়া বলিলেন, মালগাড়িটা এখন সেই দুইটার মাঝখানে, ঘণ্টা দুয়েক তার কোন খবর নাই, হয়তো ইঞ্জিন ফেল করিয়া মাঝপথে দাঁড়াইয়া আছে।

তাহার পর একটু নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—"ফেলই কি করে সব সময় মশাই? মাঝপথে দাঁড় করিয়ে এটা ঠুকছে ওটা ঠুকছে, ওদিকে ওয়াগনকে ওয়াগন্ খালি করে মাল সরিয়ে নিচ্ছে—ট্রিক্স!—আমরাই কিছু করতে পারলাম না।"

উপায় নাই, একবার অফিসে বাহির হইবার সময় এদিক হইয়া যাইতে যাইতে বলিলেন—যত দূর সম্ভব খোঁজখবর লইয়া রাখিবেন। মেয়ের বিবাহের কথাটা মনে রাখিতে বলিলেন—"আমরা হলাম ভাদুড়ী—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ—বাগচি, সান্ন্যাল—মানে ভাদুড়ী ছাড়া আর যা হয়—ছেলেটির যেন খাওয়ার-পরবার একটু সংস্থান থাকে—"

৫

এগার দিন হইয়া গিয়াছে গাড়ির কোন সন্ধান নাই; ঠিক যে সন্ধান নাই এমন নয়, পাওয়া যাইতেছে খবর, সব ব্যবস্থা ঠিক, আবার কি করিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, আজ এক জায়গায়, কাল হয়ত দেড়শ' মাইল দূরে। দিদির কাছ থেকে খানতিনেক চিঠিও পাইলেন, হতাশায় ভরা, আর গালাগালি রেলওয়েকে, আর এমন রেলওয়েতে কাজ করার জন্য কুমুদবন্ধুকেও।

কুমুদবন্ধুও একেবারে আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন। বারদুয়েক সব ঠিকঠাক করিয়া নিজে পর্যন্ত গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার আগেই গাড়ি উধাও হইয়াছে, একেবারে সামনের দিকেই, একবার এদিকে আসিয়া পাশের একটা জংশন স্টেশন হইয়া ব্রাঞ্চ লাইনে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

হতাশায় হতাশায় এমন অবস্থা হইয়াছে যে একটা বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গেছে আর ইহজন্মে পাওয়া যাইবে না। দিনে তিন-চারবার করিয়া অফিসে যান, খোঁজ পান অমুক স্টেশনে রহিয়াছে, তাহার পর আবার নিরুদ্দেশ; অনুকূলবাবু নির্বিকার কণ্ঠে মেয়ের জন্য পাত্রের কথা তোলেন। সর্বোচ্চ অফিসার পর্যন্ত চিঠি লিখিয়া লিখিয়া হয়রান হইয়া গেছেন,

সবগুলো অনুকূলবাবুর অফিসে আসিয়া জমা হয। এদিকে ফাইলের সংখ্যাও পঁয়ত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। কাউণ্টারে লোকদের ভিড়, গুলতসন গেছে বাড়িয়া।

মরীয়া হইয়া এক ঝোঁকে গাড়ির সন্ধান লইতে লইতে এক নাগাড়ে পাঁচ দিন সমস্ত লাইনটা এমুড়ো ওমুড়ো চষিয়া ফেলিলেন, ধবা গেল না। পশ্চিমেব শীতে, অনিযমে শবীব ভাঙিয়া গিয়াছে, আবার হেড কোযার্টারে ফিরিয়া আসিলেন।

তাহার পব ব্যাপারটা চরমে আসিয়া ঠেকিল।

একদিন নিজের অফিসে চেযারে বসিয়া চিন্তা কবিতেছেন, পাশেব সঙ্গী কেবানীবা যখন যাহার অবসব হইতেছে সান্ত্বনা দিতেছে--গাড়ি যখন লাইনের ওপর আছে, ভয কি ?--একদিন না একদিন পাওয়া যাইবেই--এ তো সমুদ্র নয, কোথায ঝড়ে ডুবিল, কোথায পাহাড়ে ঠোক্কর লাগিল--এ যতই কিছু হোক, বাঁধা লাইন ছাড়িয়া যাইতে পাবিবে না--ঐ তো পাঞ্জাবে পরিবারকে পরিবার নষ্ট হইয়া গেল, এ তো তাহাব চেযে ঢেব ভাল ধরা যাক, যদি নাই আব দেখা হয, বাঁচিয়া তো থাকিবেই সবাই--

এমন সময অনুকূলবাবুর পিয়ন আসিয়া খবব দিল, বাবু সেলাম দিয়াছেন।

কাশিতেছিলেন, সেই অবস্থাতেই দক্ষিণ হাতটা বাড়াইয়া বসিতে ইঙ্গিত কবিলেন। বেগটা থামিলে ব্যাপাব আব কম্ফর্টার ভাল কবিযা জড়াইয়া লইয়া বলিলেন - "নিন মশাই, টেনে তুলেছি, এসব ব্যাপারে অত হেদুলে চলে ? এইবার গিন্নী এসে পৌঁছুলে একটা ভোজ দিযে দিন--"

নিজেব বসিকতায হাসিতে গিয়া আবাব একচোট কাশি আসিয়া পড়িল।

কুমুদবন্ধুবাবু ব্যাকুল আগ্রহে প্রশ্ন কবিলেন "এসে গেছে ?"

"এসে গেছেই বলতে পারেন ; টু ডাউন এক্সপ্রেস নেক্সট্ স্টপেজ থেকে তুলে নিযে স্টার্ট কবেছে--মাঝে পাঁচটা স্টেশন--"

ঘড়িটা দেখিযা বলিলেন--"আব আধ ঘন্টাব মধ্যে এসে পড়বে "

"তা হলে উঠি আমি -"

"আবে বসুন, আধ ঘন্টা বল্লাম বলে কি আধ ঘন্টাই ভেবেছেন নাকি ? হয়তো শুনবেন কোথাও ইঞ্জিন ফেল কবে বসে আছে, কিম্বা কোন স্টেশনে লাইন ক্লিয়াবই পায নি, ছিলেন বি. এন. আর-এ, এসব কাণ্ড তো জানা নেই।--পেলেন পাত্রেব খোঁজ ? মেয়েটিকে তো আব বাখা যায না ; এই দেখুন না, গিন্নী যা চিঠি লিখেছেন তাতে পতিগুরুব গুরুত্ব আব কিছু বাখেন নি। আমরা হলাম ভাদুড়ী--এটুকু মনে রাখতে হবে, বাগচি, সান্ন্যাল--"

কোন রকমে মুক্ত হইয়া স্টেশনে আসিয়া দেখেন গার্ডেব গাড়িব দিকে একটা তুমুল জটলা, এক রকম ছুটিতে ছুটিতে গিয়াই উপস্থিত হইলেন।

ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে গিয়া দেখেন একটা বেলেব সাঁওতালী কুলীব পবিবার, মেযে, মাগী, আণ্ডাবাচ্চা মিলাইয়া আট-দশজন ; বলা নাই, কওয়া নাই, তাহাদের নিজেব স্টেশন থেকে টানিয়া আনিবার জন্য একধার থেকে সবাই মিলিয়া অকথ্য ভাষায গালাগাল দিতেছে, একটা লোক কাপলিংটা খুলিয়া গাড়িটাকে ছাড়াইয়া লইতেছে।

অফিসে আসিয়া খবর পাইলেন, সেই স্টেশনেই আপ্ পার্সেল এক্সপ্রেসটা দাঁড়াইয়া ছিল, টুডাউন পৌঁছিবামাত্র কুমুদবন্ধুর গাড়িটা জুড়িয়া লইয়া উল্টা দিকে চলিয়া গিয়াছে।

শরীর গেছে, মন দিন-দিনই ভাঙিয়া পড়িতেছে ; ওদিকে কুড়ি বৎসরের তিল তিল করিয়া সঞ্চয় করা সম্পত্তি নষ্ট হইল, তাহার পর এই—একেবারে মূলে হাবাত। বৈরাগ্য অনেক দিন থেকেই প্রবেশ করিয়াছিল মনে, ক্রমে ক্রমে উগ্র হইয়া উঠিল।

আর অনুকূলবাবুর অফিসেও যান না, নিজের অফিসে গিয়া টেবিলের সামনে বসিয়া সান্ত্বনা শোনেন, ছুটি হইলে উঠিয়া আসেন। ওয়েটিং রুমের একটা কোণে পড়িয়া থাকেন, হোটেলে নেহাত প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এক মুঠা খান।

দিনআষ্টেক পরের কথা। একজন সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন কুমুদবন্ধু, তিনি তত্ত্বজ্ঞান দিয়াছেন, সমস্ত জীবনটাই এই রকম বৃথা অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ানো ; ঠিক হইয়াছে সব ত্যাগ করিয়া এই দিক দিয়াই গিয়া হিমালয়ে উঠিবেন। কাজে ইস্তফা দিয়া সকাল সকালই অফিস হইতে বাহির হইয়া গেটের কাছে আসিয়াছেন, ডাকপিয়ন প্রবেশ করিতেছিল, হাতে একটা চিঠি দিল, খামের ওপর অনেকগুলি মোহরের ছাপ। কুমুদবন্ধু তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলিয়া পড়িলেন

পার্বতীপুর
সোমবার

আশীর্বাদ জানিবা,

আমরা অনেক কষ্টে তিন দিন হইল এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বাড়ির চারখানা দরজা আর দুইটা জানালা খুলিয়া লইয়া গিয়াছে ; তাহার পরই পাড়ায় পুলিস মোতায়েন হয়, আর কিছু করিতে পারে নাই। এখানে আর হাঙ্গামাও কিছু নাই ; শোনা যাইতেছে এখানকার মুসলমানদের সঙ্গে পশ্চিমা মোছলাদের বনিতেছে না। কাল কলিমুদ্দি আসিয়া অনেক দুঃখ করিল - বলিল মা ঠাকরুণ, যখন এয়েছেন আর যাবেন না, ওরা আপনাদের তাড়িয়ে আমাদেরও তাড়াবে। কলিমুদ্দির ছেলে তো কালেজে লেখাপড়া করিতেছে, সেই নাকি ভেতরের কথা টের পাইয়া এই সব বলিয়াছে।

আমায় চিঠি লিখিয়া দিল অম্বিকার ছেলে ললিত উহারাও আসাম থেকে ফিরিয়া আসিয়াছে। বলে তাদের চেয়ে ঘরের মুসলমান ঢের ভাল। তবে বাঙালীকে একেবারে পছন্দ করে না।

যাই হোক, তুমি পত্রপাঠই ইস্তফা দিয়া চলিয়া আসিবে, আর ও সুখের চাকরিতে কাজ নাই যা আছে তাহাতেই চলিয়া যাইবে। আমরা কি করিয়া পরিত্রাণ পাইয়া পলাইয়া আসিয়াছি এক ভগবানই জানেন, চিরদিনই বোধ হয় বেলে বেলে ঘুরিতে হইত

আমরা শরীরগতিক ভাল। ফসল ভাল হইয়াছে, কলিমুদ্দি, পাঁচু সেখ, জয়নাল, সাতকড়ি মণ্ডল সবাই বলিতেছে আমাদের অংশ আমরা পাইব

তুমি চলিয়া আসিতে বিলম্ব করিবা না। পুনরায় আশীর্বাদ জানিবা ইতি—

আশীর্বাদিকা
দিদি

রণ-তাণ্ডব

কলিকাতায় আমাদের পাড়ায় মায়ের আবির্ভাবের কাহিনীটা কতক কতক চালু আছে এখনও ; বিশ্বাস জিনিসটা এমনই যে—

যাক্ গল্পটাই বলি। দাঙ্গার সময়কার কথা। যে-কোন সময় যে-কোন জায়গায় একটা কাণ্ড ঘটিয়া যাইতে পারে, জীবনটা যে সত্যিই বুদ্বুদ—শঙ্কর-বুদ্ধও এত পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই। দূরে কাছে, যখন-তখন জয় হিন্দ! আল্লা হো আকবর! বন্দেমাতরম্! কথাগুলার মানে বদলাইয়া গেছে, সেই মাতালটার কথা মনে পড়ে -বেটারা মধুর হরিনামকে তেতো করে দিলে।

ওর মধ্যে আবার বিবাহ আছে, পূজা আছে, যাত্রা-থিয়েটার আছে : সিনেমা আছে, জীবনবুদ্বুদ যতটুকু থাকে একটু আলোর ঝিকিমিকি মাখিয়া থাকিতেই চায়।

যেখানেই দেখ ঐ এক আলোচনা। লোকে চলিতে চলিতে যেন জট পাকাইয়া যাইতেছে—গলিতে, ফুটপাথে, পার্কে ; চারিদিককার খবর আসিয়া জুটিতেছে- -সত্য, কাল্পনিক। আবার জট খুলিয়া যে-যার কাজে-অকাজে চলিয়া গেল। চাপা আতঙ্ক, সেইটাই আবার মত্ত স্লোগানে রূপান্তরিত হইয়া উঠে—জয় হিন্দ! আল্লা হো আকবর! ভয়-ভরসায় চলে মাখামাখি।

এ ভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় দল আছে, রীতিমত কুচকাওয়াজ, ডিসিপ্লিন্ ; অস্ত্র সংগ্রহ। অবশ্য আত্মরক্ষার ওজুহাতেই, তবে সেটা প্রধানতঃ ওজুহাতই। আমাদের পাড়ার দলটা আড্ডা করিয়াছে দত্তদের বৈঠকখানায়। দত্তরা ফেরার, একটা নেপালী দারোয়ানের হাতে চাবি, বেশ ভাল করিয়া তাহাকে দলের মধ্যে টানিয়া লইয়াছে। সবাই হাবিলদার সাহেব বলিয়া ডাকে। এ খেতাবটা যে ওর পূর্ব থেকেই ছিল এমন তো শুনি নাই ; মানে, দস্তুরমত মিলিটারি কাণ্ড। ও. সি, মেজর, হাবিলদার, ক্যাপ্টেন—কিছুই বাদ নেই।

যেমন সব ক্ষেপিয়াছে, একটু যোগসূত্র ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করি। মাঝে মাঝে ঘরটাতে গিয়া বসি। নিজেদের নাম দিয়াছে সঙ্কটত্রাণ সমিতি ; খবর লুকায়, তবু বুঝি অপরের সঙ্কট কম বাড়াইতেছে না। উপায় নাই, ওদিককার কাণ্ড শুনিয়া এক এক সময় নিজেদের রক্তই গরম হইয়া উঠে। তবুও গিয়া বসি মাঝে মাঝে, বোঝাই, যতটা ঠাণ্ডা থাকে।

বাড়িয়াই চলিতেছে, তাহার পর সেদিন সকাল থেকে গুজব রটিল ওদিককার ওরা লীগ গবর্ণমেণ্টের উসকানি পাইয়াছে, সেই দিনই আমাদের পাড়ায় আক্রমণ চালাইবে।

তুমুল উত্তেজনায় কাটিতে লাগিল দিনটা ; যতই কিছু না হইতে লাগিল, মনে হইল খুব গুরুতর রকমের কিছু একটা ঘটাইবার জন্যই ওদিকে সময় লইতেছে। সমস্ত পাড়াটা সমিতির ছেলেদের উদ্যোগে অস্ত্রেশস্ত্রে প্রস্তুত হইয়া উঠিল, ক্রমেই অধিক অধিক ভাবে। এর যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল সেইটাই আশঙ্কা করিতে লাগিলাম--অর্থাৎ ওদিক থেকে যদি কিছু না হয়, এই আয়োজনের বিপুলতার চাপে এরাই শেষ পর্যন্ত মারমুখো হইয়া উঠিবে। ব্যাপারটা ক্রমেই আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতে লাগিল।

সমস্ত দিনটা কিছুই হইল না। সন্ধ্যার পর পাড়াটা হঠাৎ কেমন যেন থমথমে হইয়া পড়িল। লক্ষণটা ভাল বোধ হইল না। সমিতিই সমস্ত পাড়াটার কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করে, প্রতিটি কণ্ঠের স্লোগানটুকু পর্যন্ত। হঠাৎ এমন নিস্তব্ধ ভাবটা কেমন যেন অস্বস্তিকর বোধ হইল। একটু খোঁজ লওয়া দরকার।

দত্তদের বৈঠকখানায় গিয়া দেখি বেশ ভরা ঘর। একটা কি চাপা মন্ত্রণা চলিতেছিল, আমি গিয়া পড়িতে সবাই একটু তটস্থ হইয়া পড়িল। আর চাপাচাপি করা চলে না, প্রশ্ন করিলাম—"সন্ধ্যের পর একটু যেন অন্য ভাব দেখছি আজ ; ব্যাপারখানা কি—বলতে আপত্তি আছে ?"

দু'একটা কণ্ঠে "আজ্ঞে—আজ্ঞে" করিয়া একটু কুণ্ঠার ভাব, তাহার পরই সমিতি মুখর হইয়া উঠিল—"ওপক্ষের ওরা আজকে জুৎ করতে পারে নি, তাই এগুল না—অথচ আজ যদি কোন রকমে টেনে আনতে পারি—উইক কিনা—একটিকে ফিরে যেতে দেব না—আজ্ঞে, তাই একটু ঘাপটি মেরে ঠাণ্ডা হয়ে থাকা—বাছাধনেরা যখন দেখবে—"

কথাবার্তার মধ্যেই ঝমঝম্ ঝমঝম্ করিয়া একটা আকস্মিক শব্দে সবাই চকিত হইয়া উঠিলাম ; এক লহমা, তাহার পর ঘর ফাটাইয়া সবাই একসঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল—"জয় হিন্দ !"

আমার কণ্ঠও মিশিয়াছিল।—বুড়ারা ছেলেদের টানিতে পারে না, ছেলেদের আকর্ষণই বড।

বাহিরে আসিয়া সবাই অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম এক ঝলক হাসিও উঠিল উছলাইয়া—দুইটা গলি পরেই জেলে আর গোয়ালাদের মিশ্র বস্তি। আওয়াজটা সেইখান হইতেই উঠিয়াছে—কি উপলক্ষ্য ক.রয়া সেটা পরে আপনি প্রকাশ পাইবে বলিয়া এখানে আর লজ্জার মাথা খাইয়া উল্লেখ করিলাম না।

ঘরে আসিতে আসিতে নানা কণ্ঠে মন্তব্য শুনিতে লাগিলাম—"ওরাই পারে—ওদেরই মানায়—সমস্ত দিন ঐ কাণ্ড করে, সন্ধ্যার পর যদি একটু এই বকম কবে গা না এলায় তো বাঁচবে কি করে ?—আর একা নয় তো, মেয়ে-পুরুষে লেগে গেছে—কচুকাটা করছে—আর সত্যিই তো, মেয়েদের আর ঘোমটা টেনে বসে থাকা চলে ·"

ঘরে আসিয়া আবার পলিসির আলোচনা চলিল।—লোক বাড়িতে লাগিল, নূতন নূতন খবব আসিয়া পড়িতে লাগিল—ভবানীপুর, বালিগঞ্জ, খিদিরপুব। এদিকেও চর পাঠানো হইযাছে—কেহ ফিরিয়া রিপোর্ট দিল, কাহারও ফিরিতে এত দেরি হয় কেন ? মাঝে মাঝে দলের ছেলেরা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছে। একজন একজন করিয়া তাহাদের সন্ধানেও আরো জন চারেক রওনা হইয়া গেল।—বিষাদের আবহাওযা, তবুও ছেলেগুলার বুকের পাটা দেখিয়া আনন্দ হয বৈ কি।

ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। বসিয়া আছি, বসিযা থাকিযাই যতটুকু সংযত রাখা যায়। নিখোঁজ সঙ্গীগুলার জন্যই উত্তেজনাটা বাড়িযা যাইতেছে ক্রমে ক্রমে : জাপানীদের মত সুইসাইড্ স্কোযাড বা আত্মঘাতী বাহিনীর সংখ্যা বাড়িযা যাইতেছে—চারিজন গিযাছিল : আরও দুইজন চঞ্চল হইয়া উঠিল ; কোনমতেই রোখা গেল না।

মৃদু 'জয় হিন্দ' ধ্বনির সঙ্গে তাহাদের বিদায় দিবে এমন সময আগে যাহারা গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে দুইজন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিল এবং প্রবল হাঁপানোর মাঝে কিছু বলিয়া উঠিতে পারার আগেই পাড়াটার উত্তর-পূর্ব দিক মথিত করিয়া একটা তুমুল কলরব

উঠিল—আল্লা হো আকবর!

সমস্ত দলটা একটু চকিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল নিশ্চয় আগে যে একটা ধোঁকা খাইয়াছে সেই স্মৃতিতেই। তাহার পর কিন্তু আর কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না। ঘরের মধ্যে অস্ত্র সাজানো, ক্ষিপ্রতার মধ্যেও একটু গোলমাল হইল না, নিজের নিজেরটি তুলিয়া লইয়া সবাই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল।

ঘরটা খালি হইয়া গেল, রহিয়া গেলাম শুধু আমিই। অস্ত্রও নাই, শরীরে ওদের মত স্নায়ুর ক্ষিপ্রতাও নাই, আছে বয়োধর্মের যা সম্বল—বিবেক, বিবেচনা, একটু থিতাইয়া জিরাইয়া চারিদিক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখা।

মনস্থির করিয়া বাড়ী হইতে একটা পিস্তল লইয়া বাহির হইতে মিনিট পনের হইয়া গেল। ডোবা ভরাট করা একটা পড়তি জায়গা, সেইখানেই কাণ্ডটা হইয়াছে। যখন পৌঁছিলাম তখন ওদিককার ওরা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে, চঞ্চল জনতার মধ্যেই এর-ওর মুখে শুনিলাম পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে কয়েকজনকে রাখিয়াই। তাহাদের অবশ্য সন্ধান পাইলাম না।

হঠাৎ পড়তি জমিটার একদিকে একটা তুমুল কলরব উঠিল—"মা!—মা!—মা!—মা এসেছেন!—জয় মা!—"

সবাই সেই দিকে ছুটিল। যেন চাকের গায়ে মৌমাছি জমিয়া উঠিল, আর ঐ শব্দ-আকাশ যেন মথিত হইয়া যাইতেছে। ভিড় চিরিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে বিস্ময়ে একেবারে বাক্‌রোধ হইয়া গেল। কল্পনাতীত ব্যাপার।

একটি স্ত্রীলোক। আমি পিছনের দিকটায় গিয়া দাঁড়াইয়াছি, ভাল দেখিতে পাইতেছি না, তবুও অদ্ভুত। স্ত্রীলোকটির পরিধানে একটা টকটকে রাঙা চেলি, কতকটা মহিষমর্দিনীর মতই গাছকোমর করিয়া পরা। মাথায়, কপালের খানিকটা লইয়া লাল সালুর মতো একটুকরা কি শক্ত করিয়া বাঁধা। তাহারই মধ্য দিয়া আলুলায়িত কুন্তলের একটা রুক্ষ গুচ্ছ দক্ষিণ বাহুর উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। পাশ দিয়া যতটা দেখা যায় মুখের চোয়ালটা কঠোর, কতকটা পুরুষালিই, হাতটা পেশীবহুল, করতল রক্তবর্ণ; আমার সামনেই পায়ের পাতাটা উল্টাইয়া রহিয়াছে, পেলব নয় মোটেই, তবে সমস্তখানি আলতায় রাঙা, ধূলায় যা একটু মলিন করিয়াছে।

সবচেয়ে যা বিস্ময়কর—রোমাঞ্চকর বলাই ঠিক- রমণী একটা গুণ্ডাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া তাহার নাভিকুণ্ডের উপর ডান হাঁটুটা চাপিয়া দুই হাতে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া যাইতেছে। গুণ্ডাটার মুখটা শ্মশ্রুবহুল হওয়ায় সমস্ত দৃশ্যটা এমন নিখুঁতভাবে মহিষমর্দিনীর চিত্রের মত হইয়া উঠিয়াছে যে সত্যই সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন অভিভূত হইয়া পড়ে। লোকটাকে দেখিলে মনে হয় তাহার আয়ু প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে।

কিছুক্ষণ মাথায় কিছুই বুদ্ধি আসিল না, তারপর হঠাৎ কানে গেল "মা! মা! এই নাও, শেষ করে দাও মা"—সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জনতার একটা উল্লসিত চীৎকার- "জয় মা!"

ঘুরিয়া দেখি একটি যুবকের হাতে একটা ছোরা। হুঁশ হইল, একরকম লাফাইয়া গিয়াই তাহার হাত হইতে সেটা কাড়িয়া লইলাম।

ঐতেই বুদ্ধিটা ফিরিয়া আসিল কতকটা, বলিলাম, "দেখছ কি? তোল ওঁকে, ছাড়িয়ে দাও—"

নিজেই গিয়া হাতটা ধরিলাম। খানিকটা নিশ্চয় আমারও ঘোর আসিয়া গেছে, তা ভিন্ন স্ত্রীলোকই তো, বলিলাম, "মা, যথেষ্ট হয়েছে—ছেড়ে দাও, দয়া কর, তুমি যে কারুর

মা-ই সেইটুকু মনে কব ”

অসীম ক্ষমতা শবীরে, আব যেন সংহাবেব নেশায় মাতিয়া গেছে ; তবে কি মনে হওযায আমাব দেখাদেখি আবও কযেকজনে আসিযা ধরিযা ফেলিল।

পর্দা‌ে জমির নিতান্ত অপ্রচুব আলোকে যতটা সম্ভব চেহারাটা ভাল করিয়া দেখিলাম। বিকট, মসীকৃষ্ণ বললেও অত্যুক্তি হয় না, কোনখানে এতটুকু রমণী-সুলভ মাধুর্যের অবশেষ নাই। শুধু চক্ষু দুইটি বিশাল, আয়ত ; তাহাও কিন্তু ললাটের নিম্নে অগ্নিপিণ্ডের মত ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। আরও যা—কি বলিব ?—ভাষা পাইতেছি না—আরও যা ভীষণ, রহস্যময়—মুখে অল্প অল্প সুরার গন্ধ ! কিন্তু কোন কথা নাই, ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত স্ফীত নাসারন্ধ্রের মধ্যে দিয়া যে একটা সাঁ সাঁ শব্দ বাহির হইতেছে—শব্দের মধ্যে মাত্র সেইটুকু।

"মা-মা !" শব্দ গগন ভেদ করিয়া উঠিতেছে। ভিড় আরও চাপ বাঁধিয়া উঠিতেছে। কি করা যায় ? বুদ্ধি কাজ করিতেছে না।

হঠাৎ চৈতন্য হইল, সমিতিব দু'চারজন অগ্রণীকে বলিলাম, "ভুল হয়ে যাচ্ছে—ভিড সবাও, দাঙ্গাব জাযগা, এখুনি পুলিস এসে পডবে।"

"ওঁকে ? মাকে ?"

"ওঁকে দত্তদের বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি—শীগ্‌গির ভিড পাতলা কর—"

খুবই শক্ত ব্যাপাব, সাক্ষাৎ মা কালীব অবতবণ হইযাছে, লোকে মত্ত উল্লাসে যেন দিশাহাবা হইযা পডিযাছে। কিন্তু মহলা দিযা দিযা ছেলেবা পোক্ত হইয়া উঠিয়াছে, চমৎকার নিযমানুবর্তিতা দেখিতে দেখিতে সমিতিব ছেলেবা ছাডা সমস্ত ভিডটা প্রায পরিষ্কার হইয়া গেল· কতকটা ভযে, কতকটা আবার ইহাদের দাবেও। ফিল্ড হাসপাতালও আছে, গুণ্ডাটাকে সেইখানে পাঠাইবাব ব্যবস্থা করিযা স্ত্রীলোকটিকে মাঝে করিযা দত্তদের বৈঠকখানায লইযা আসিলাম। আপত্তি মোটেই কবিল না, তবে একটা কথাও বলিল না। অত্যন্ত অন্যমনস্ক, যেন অন্য কোন্ লোকে রহিযাছে, শুধু স্ফুবিত নাসারন্ধ্র দিযা ব্যর্থ আক্রোশের চাপা গর্জন আসিতেছে বাহির হইযা।

জাযগাটা থেকে দত্তদেব বাড়ী বেশ খানিকটা দূবে, গোটাকতক গলি দিয়া বাঁকিযা চুবিযা আসিযা উপস্থিত হইলাম। সবাই নিস্তব্ধ, একেবাবে অভিভূত হইযা পডিযাছে ; হিন্দুবই মন তো। প্রথমে যাই ভাবি, সময পাইযা আমি সে বিশ্বাসটা অবশ্য কাটাইয়া উঠিযাছি। তবে সাক্ষাৎ মা কালী না আসুন, একটা বিপন্ন জাতির উদ্ধারেব জন্য মানুষের মধ্যেও তো দৈবশক্তির আবির্ভাব হয—জোয়াঁ অব্ আর্কের মধ্যে ইতিহাসই যে তাহার সাক্ষ্য দিতেছে—হযতো ইনি কুমারী নন, তা সবাইকেই যে কুমাবী হইতে হইবে তাহাব মানে কি ?—শক্তির আধার কি এক বকমই ?

বৈঠকখানায আনিযা একটি সোফায় বসাইলাম। বলিলাম—"এবাব শীগগির এঁর একটু আহারের ব্যবস্থা কব।"

একটি ছোকরা চাপা গলায়, তবুও যাতে স্ত্রীলোকটির কানে যায়, এইভাবে বলিল—"ভোগ বলুন স্যার।"

বলিলাম—"হ্যাঁ, ভুল হয়েছে, ভোগই—শীগ্‌গির দেখো, ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।"

এতক্ষণ পরে স্ত্রীলোকটি একটু মুখ খুলিল, খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে বলিল—কিম্বা—যেন এই রকম শুনিলাম—"মাংস।"

সমস্ত ঘরটা আবার নিস্তব্ধ হইয়া গেল। আমারও বুদ্ধি আবার লুপ্ত হইয়া আসিতেছে,—এ কি আহারের আদেশ! কতকটা বিমূঢ় ভাবেই বলিলাম—"মাংস আনো—মাংস!"

সেই ছেলেটি সেইভাবে প্রশ্ন করিল—"বলির ব্যবস্থা করি?"

সকলেই একবার মুখের পানে চাহিল, মূর্তি শুধু না'র ভঙ্গিতে একবার মাথাটা ঈষৎ নাড়িল।

আমার বুদ্ধি মাঝে মাঝে ফিরিয়াও আসিতেছে একটু একটু, বলিলাম—"চপ, কাটলেট, কোর্মা—এইরকম—শীগ্‌গীর—হোটেল থেকে—"

মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম আপত্তির কোন ইঙ্গিত নাই। জনপাঁচেক ছেলে এক রকম ছুটিয়াই বাহির হইয়া গেল।

এমন সময় একটা কাণ্ড হইল। ঘরে তো তিল ফেলিবার জায়গা নাই, বাহিরেব বারান্দাটাও গেছে ভরিয়া; গোটাদুয়েক জানলা সামনের দিকে—তা এক-একটাতে রাশীকৃত কৌতূহলী মুখ গরাদ চাপিয়া আছে; দরজাটা একেবারে ঠাসাঠাসি। তবে এক চাপা 'মা-মা' ছাড়া কোন শব্দ নাই।

এমন সময় হঠাৎ গলিতে একটু দূরে একটা কচি গলার কান্না উঠিল এবং পরক্ষণেই বোঝা গেল ছেলে বা মেয়ে যেই হোক, দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া যেন এই দিকেই আসিতেছে।

আবার একটা ত্রস্ত গুঞ্জন উঠিল ঘরটাতে, একটা সচকিত ভাব, বলিলাম—"দেখ তো—কাঁদে কেন?"

তাহার আগেই চার-পাঁচজন ছুটিয়া বাহির হইযা গেছে। একটু পরেই একটা ছেলেকে ধরাধরি করিয়া আনিয়া বারান্দার প্রান্তে দাঁড় করাইল। আমি দরজার কাছে আগাইয়া গেলাম। ভিড় দু'পাশে, একটু সরিযা দাঁড়াইতে দেখি এও এক অদ্ভুত ব্যাপার—অলকাতিলকা আঁকা, ধড়া-চূড়া পরা একটি আট-নয় বছরের শ্রীকৃষ্ণ, তাহার কান্নাও তখন স্পষ্ট—"জেঠামজাই! জেঠামশাইকে দেখব—আমার জেঠামশাইকে মেবে ফেলেছে!"

"কোথায় ছিল তোর জেঠামশাই?"

ততক্ষণে তাহার দৃষ্টিটা ভিতরের দিকে পড়িয়া যাওযায় হঠাৎ যেন আড়ষ্ট হইযা চুপ করিয়া গেল। তাহার পর মূর্তিটির দিকে দেখাইযা বলিয়া উঠিল—"ঐ তো, ও জেঠামশাই গো!"

একটু নিস্তব্ধতা; সবাই বুঝিল বেচারার মাথা বিগড়াইয়া গেছে।

কয়েকজন ঘিরিয়া বলিল—"ও তো মেয়েছেলে, দেখছিস—কাঁদিস নি, খুঁজে বের করছি তোর জেঠামশাইকে—ঠাণ্ডা হ' দিকিন।"

"না, মেয়েছেলে নয়—আমার মা—ছেড়ে দাও আমায়—"

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন নেশাখোর গোছের লোক খিঁচাইযা উঠিল—"একবার মা, একবার জেঠামশাই—বেটা, মাথা খারাপ হয়েছে তো না হয় বাবাই বল্—একটা লোককেই ভাসুর আর ভাদ্দরবৌ!"

মূর্তি মাথাটা হেঁট করিয়াই বসিয়াছিল, আরও নামাইয়া লইয়াছে। আমি যে এতক্ষণ কথা বলি নাই তাহার কারণ আছে—মাথাটা ধীরে ধীরে পরিস্কার হইয়া আসিতেছে। আগাইয়া গিয়া বলিলাম—"ছেড়ে দাও ওকে—ব্যাপারটা কি রে? এদিকে আয় তো, বল

খুলে, ভয় নেই—"

ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে এবং তাহারই মধ্যে আড়াল দিয়া কতকটা ভয়ে এবং কুণ্ঠায় মূর্তিটির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে বলিল—"জেঠামশাই-ই তো—যাত্রায় মা যশোদা সেজেছেল, আমি হনু কেষ্ট—তারপর গড়পাড় থেকে মোছলমানেরা এসে পড়ল—তারপর—"

সবাই থ হইয়া গেছে।

মূর্তিটা হঠাৎ উঠিয়া পড়িল, ছেলেটার হাতটা ধরিয়া বলিল—"চ হারামজাদা—হ'ল যদি দু'টো চপকাটলিসের যোগাড় তো কোথা থেকে শনির মতন এসে জুটল—মালের মুখে যে একটু তোয়াজ করে লোকে খাবে—"

ছেলেটাকে টানিতে টানিতে ভিড চিরিয়া ঈষৎ টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল।

বিচারক

হঠাৎ একটা মিশ্র কলরব উঠিল—"চোর! চোর! পকেটমার! পাকড়াও! পালাতে দিও না!"

বাসের মধ্যেকার ব্যাপাব। এরকম অসম্ভব ভিড যে একটু ঘুরিযা দেখাও দুষ্কর। তবু একটা যে চাঞ্চল্য উঠিল তাহাবই সুযোগে ঘাডটি বাঁকাইয়া দেখি আমার হাত দুয়েক ওদিকে একটি ছোকরা অন্য একটি ছোকবার কামিজের বুকের কাছটা বেশ জোরে খামচাইয়া ধরিয়া বলিতেছে—"আলবাৎ নিয়েছিস, বের কব। পকেটে হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ধরেছি; এই হাত—"

চারিদিকের ভিডটা আরও চাপ বাঁধিয়া উঠিয়াছে। মন্তব্য, উপদেশ, আদেশ আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে—জটিল এবং উগ্রও। যে ছোঁড়াকে ধরিযাছে তাহার চেহারা মার্কামারা পকেটমারের—বেশভূষাও তদনুরূপ। যাহার জিনিস গেছে তাহাকেও ভদ্রসন্তান বলিয়া মানিয়া লইতে বেগ পাইতে হয়, তবে উহারই মধ্যে একটু চাকচিক্য আছে।

পকেটমারটি বলিল—"এই হাত তো? দেখান আপনার ফাউনটেন পেন কোথায়, আপনি তো সঙ্গে সঙ্গে ধরেছেন বললেন।"

প্রথম ছোক্‌রা যেন তর্কে একটু ভ্যাবাচাকা খাইযা গেল, ফ্যালফ্যাল করিয়া এদিক ওদিক চাহিতে সামনের একজন উঠিয়া পকেটমারটির গলাটা টিপিয়া একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল, "তুই আলবাৎ নিযেছিস, সরিয়ে ফেলেছিস, তোদের দল থাকে—।" বেশ জোরে আর একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল—"দে ফিরিয়ে, নৈলে দিলাম এই বসিয়ে—"

চারিদিক থেকে সমর্থন উঠিল—"হ্যাঁ, দিন বসিয়ে, ঐ ওষুধ—পেটে কোঁৎকা দিলেই গলা দিয়ে বেরিয়ে পডবে—"

একজন কথাটার সোজা মানে লইয়াই বলিল—"ব্যাটারা গিলেও ফেলে—"

বেড়ালে ইঁদুর ধরিয়া যেমন করে, ছোঁড়াটার তখন সেই অবস্থা চলিয়াছে—বরং আরও খারাপ, কেননা একটা ইঁদুরকে অনেকগুলি বেড়ালে ধরিয়াছে। তাহার মধ্যেই তর্ক চালাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"গিলে ফেলবো! আস্ত একটা কোলম!"

প্রতিবাদে আরও চটিয়া গিয়া ভদ্রলোক দূর হইতে ঝুঁটি ধরিয়া আর সকলের চেয়ে একটু বেশী ঝাঁকানি দিয়া বলিল—"হাঁ কর দিকিন দেখি"—চুলের মুঠি ধরিয়াই গলাটা উল্টাইয়া ধরিল ; স্বভাবতই মুখটা একটু হাঁ হইয়া যাইতে কয়েকজন ঝুঁকিয়া পড়িল—দু'একজন একটু ডিঙি মারিয়াই।

আমি দেখিলাম—এ ঠিক হইতেছে না। সস্তায়—অর্থাৎ যেখানে আত্মরক্ষার উপায় নাই বা অল্প, সেখানে একটু হাতের সুখ উপভোগ করিয়া লইবার প্রবৃত্তিটা মজ্জাগত, চারিদিকে দেখিয়া মনে হইল গলা আর চুল বেহাত হওয়ায় কয়েকজন আর কোথায় বাগাইয়া ধরা যায় তাই লইয়া মনে মনে গবেষণাপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে। আমি উহারই মধ্যে ঠেলিয়া ঠুলিয়া একটু সামনে আগাইয়া গেলাম, বলিলাম—"আপনারা ভুল করছেন ; গলার ভেতর থেকে যদি আস্ত একটি কলম বের করতে পারে তো মারের বদলে ওকে ভেল্কিবাজির জন্যে পয়সাই দেওয়া উচিত—"

কলরবটা একটু থামিয়া গেল। চোরের উপর সহানুভূতিসম্পন্ন দেখিযা সবার মন্তব্যগুলা আমার দিকে ঝুঁকিবাব মতো হইযাছে, আমি বলিলাম—"ওকালতি করছি না, যা সব চেয়ে আগে করা দরকার তা আপনারা করতে ভুলে গেছেন ; ওর জামাকাপড ভালো করে দেখা দরকার আগে- "

"ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন উনি—বেটা বোধ হয় এতক্ষণ সরিয়েও ফেলেছে—"

চারিদিক থেকে প্রায় ছ'সাত জোড়া হাত খানাতল্লাসিতে লাগিযা যাওযায ভিড এবং চঞ্চলতা আরও বাডিয়া গেল, আমিও সেই আবর্তের মধ্যে ভালো করিযা পডিযা গেলাম। শীতকাল, জামার বাহুল্য আছেই সবার গায়ে, তাহার উপর র‍্যাপার, ছোঁডাটাকে কেন্দ্র করিয়া যেন একটা জোট পাকাইয়া গেল। ছোঁডাটা নিজের জামা চাপিয়া চাপিযা ধরিতে লাগিল, বলিতে লাগিল—"বাঃ, জামার পকেটে হাত দেবার কে আপনারা মোশাই ? আমি ভদ্রলোকের ছেলে আছি—এখানে কোতোরোকোম লোক আছে হাতসাফাই করে লিবে—বাঃ, মোশাই ! আমি ভদ্রলোকের ছেলে—আমার নিজেব পার্স আছে, বাঃ মোশাই !"

যাহারা চুল এবং গলা আয়ত্ত করিযাছিল, ছাডিযা দিতে হইল বলিয়া আমাব উপর বেশ বিরক্ত হইযাছে, একজন কনডাকটারকে বলিল—"বানকে, বানকে !"—বাসটা থামিলে নামিয়া যাইতে যাইতে বলিল—"মারের চোটে কলম বেরুত, তা যা শুভানুধ্যাযী সব জোটে !"

আমার দিকে একবার আডে চাহিয়া লইল, তাহার পর সিঁড়ির একটা ধাপে পা দিযা বেশ ভালোভাবেই চাহিয়া বলিল—"নিজেই বা কি কে জানে, পোশাক ভদ্রলোকের হলেই যদি ভদ্রলোক হোত তা' হলে—" নামিযা গেল।

এদিকে ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। ছোঁডাটার গাযে একটা কোট, তাহার নিচে একটা পাঞ্জাবি, তাহার নিচে একটা ফতুযা, অনেকগুলি পকেট ; কিন্তু কলম পাওয়া যাইতেছে না। অত পকেটের বাড়াবাড়ি অথচ কলম পাওয়া যাইতেছে না—অর্থাৎ প্রমাণ রহিয়াছে অথচ মাল লোপাট—সকলে আবার ক্রমেই উগ্র হইয়া উঠিতেছে, খানাতল্লাসি ছাড়িয়া অন্যরকম ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। দেখিতেছি জিনিস লউক বা না লউক ছোঁড়াটার অদৃষ্টে মার আছেই আজ, ঠেকাইতে পারা যাইবে না। এদিকে ভিড়ের চাপে শীতেও ঘামিয়া উঠিতেছি ; আর এই ব্যাপারের মধ্যে থাকিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। ভাবিতেছি নামিয়া না হয় অন্য গাডিতেই চলিয়া যাই, এমন সময হ্যারিসন রোডের

চৌমাথায় বাসটা আসিতে গাড়িটা একটু খালি হইল, নিচে থেকে উল্টা স্রোত ঠেলিয়া আসিবার পূর্বেই আমি গিয়া একটি সামনের সীট দখল করিলাম।

এমন সময় সেই কেন্দ্র হইতে হঠাৎ একটা তুমুল কলরব উঠিল—"পাওয়া গেছে! পাওয়া গেছে! যাবেই পাওয়া! ওর চেহারাতেই লেখা রয়েছে—পকেটমার।"—চড়, ঘুষি আবার সক্রিয় হইয়া উঠিবার উপক্রম করিল।

আমি তখন খানিকটা দূরে, সেখান থেকেই দেখিলাম, একজন মুঠার মধ্যে একটা কলম চাপিয়া বিজয়োল্লাসে তুলিয়া ধরিয়াছে, কলমের মাথাটা মাত্র দেখা যাইতেছে। আমারই পরামর্শের এই সফলতা, কাছে যাহারা বসিয়াছিল আমি তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া একটু বড়াই করিয়া বলিলাম—"পাওয়া যেতে বাধ্য। ওরা সবাই মার দিতে ব্যস্ত!—আরে পকেট দেখো আগে—ভালো করে খানাতল্লাসি করো, শুধু মারলেই কি হবে?"

কয়েকজন সমর্থন করিল, একজন বৃদ্ধ গোছের লোক বলিলেন—"ঐ তো দোষ; তবে আর বলি কেন?"

ওদিকে গোলমালটা হঠাৎ একটু ঠাণ্ডা পড়িয়া গেল। ফিরিয়া চাহিতেই শুনিলাম, যাহার কলম হারাইয়াছে সে বলিতেছে—না, আমার নয়, আমারটা ছিল অন্যরকম, এর চেয়ে খারাপ মোশাই, মিথ্যে কথা কেন বলতে গেলুম?"

ছোঁড়াটাও জো পাইয়া মেজাজ দেখাইতেছে- "ঐ লিন, যার কোলোম সে বলছে আমার লয়—কি মোশাই? চুল ছেড়ে দেন,—মার পড়ে রয়েছে অমনি!—আমার নিজের কোলোম—দু মাসও হয় নি কিনেছি—দেন, ফিরিয়ে দেন আমার কোলোম মোশাই—আমি ভোদ্দোরলোকের ছেলে, কারবার করি, কোলোম থাকবে না একটা?"

"তোর কারবারে কতগুলো করে এরকম কলম আমদানী আর বিক্রি হয় রোজ?"

"কি মোশায়, আপনি ওরকম কথা বোলবার কে? মানহানির চার্জে ফেলে দিতে পারি, জানেন? কোলোম পান আমার কাছে, দশ ঘা জুতো মেরে নামো দিন, আমার কোলোম নেবেন কেন? দেন ফিরিয়ে দেন—"

"কোথা থেকে কার পকেট মেরেছিস বল; তোর কাছে ফাউন্টেন পেন এলো কোথা থেকে—লাটসাহেবের কোন্ সেরেস্তায় তুই কাজ করিস? ওকে থানায় নিয়ে যাও ঐ কলম সুদ্দু- হ্যাণ্ডওভার করে দিন পুলিসকে—"

ছোঁড়াটা একটু উৎসাহিত হইয়া উঠিল, বলিল—"তাই দেন, হ্যাণ্ডওভার করে, আমি যদি সাবুত দিতে না পারি জেলে দেবেখন -চলুন মোশাই, পুলিসকে বলবেন আপনার কোলোম আছে এটা—"

আমি চুপ করিয়া দেখিতেছিলাম আর ভাবিতেছিলাম: ছোঁড়াটা দোরের দিকে ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে আরও চারপাঁচজন ঘুরিল। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল, বলিলাম—"ও মশাই, আপনারা করছেন কি? হ্যাণ্ডওভারের নামে বেটার উৎসাহ দেখছেন না? ওরা অমন রোজ দশবার করে হ্যাণ্ডওভার হচ্ছে, দশবার করে পিছলে বেরিয়ে আসছে। পুলিস আর পুলিসকোর্টের তোয়াক্কা যদি রাখতো ওরা তাহলে আর ব্যবসা চালাতে পারত না-"

"তবে?—তাহলে কি করা যায় ওকে নিয়ে?-"

"এইখানেই কোর্ট বসাতে হবে-"

অনুমোদনের একটা উচ্ছ্বসিত কলরব উঠিল—"হাঁ, সেই ঠিক, উনি যা বলেছেন এইখানেই একটা হেস্তনেস্ত করে ঘাকতক দিয়ে কান ধরে নামিয়ে দাও-"

"ঘাকতক দিলেই হোল ! চুরি করেছি প্রুপ করুন মোশাই—পিঠ আমার আঁতুড়ে-ষষ্ঠীর কুলো পেয়েছেন !—"

আমার মনটা কৌতুকরসে সিক্ত হইয়া আসিতেছে, বিচারকের ভূমিকা লইয়া আরও একটু ভালো করিয়া ঘুরিয়া বলিলাম—"মেরে কুলুতে পারবেন ? মার খেয়ে খেয়ে ওদের ঘাটা পড়ে গেছে। এক কাজ করুন, ও ছোকরার জিনিস হোক না হোক ঐ কলমটাই ওকে দিয়ে দিন—নাও হে, তুমি ঐটেই নাও, কি কলম ছিল তোমার ?"

"ব্ল্যাকবোর্ড ছেল আমারটা মোশাই।"

"এটা কি ?"

যাহার হাতে কলমটা ছিল দেখিয়া বলিল—"পার্কার।"

বলিলাম—"বাঃ, ছোকরার কপাল ভালো, ব্ল্যাকবোর্ডের বদলে যদি পার্কার পাওয়া যায়—"

ছোঁড়াটা আরও হৈ-চৈ লাগাইয়া দিল—"দেন মোশাই আমার কোলোম, বাঃ, এ মগের মুল্লুক আছে নাকি, মোশাই ! কোলোম দিয়ে দেন—"

তাহার ওজর আপত্তি, হাত চালা, মাথা চালার মধ্যেই লোকটি কলমটা ছেলেটিকে দিয়া দিল। সে নির্বিবাদে সেটা পকেটস্থ করিয়া পরের স্টপেজে নামিয়া গেলে এ ছোঁড়া একবার প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া তাহার অনুগমন করিবার চেষ্টা করিল ; কয়েকজন তাহার চুল, গলা, কব্জি, বাহু শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া রহিল—ছোঁড়াটা এদিকে আরও চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছে—তাহার পর গোটা পাঁচেক স্টপেজ পার হইয়া গেলে তাহাকে ছাড়িয়া দিল। আমার পাশের বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিলেন—"হাঁ, এ মন্দ বিচার করেন নি ; আরে, কলম আসলে যার, তার তো গেলই, তবে একটা আকাট পকেটমারের কাছে থাকে কেন ?—এ ছোকরাকে দিয়ে দেওয়া খুব বিচক্ষণতার কাজ হয়েছে—তার তো একটা গেছে আর ঐ ছোঁড়ারই হাতে—না, তারিফ করতে হয় বৈকি ; সুবিচার হয়েছে—"

এক ধরণের লোক আছে, অতি সামান্য কথাও খুব ফেনাইয়া তুলিতে ভালবাসে, বৃদ্ধ সেই ধরণের। বিচার লইয়া খুব আমার প্রশংসা করিল ; একটু আবার কৌতুকপ্রিয়ও আছে—বৃদ্ধেরা সাধারণত যেমন হইয়া থাকে, বলিল—"আর ঐ যে বলেছেন এখানেই কোর্ট বসাব, তা সত্যিই কোর্ট—আসামী, ফরিযাদী, পুলিস, জুরি—সবই তো মজুদ—কোর্টের তো আর একটা নেজ হয না,—বিচারও আপনার চমৎকার হয়েছে।—মশাইয়ের নাম ?"

নাম বলিতে—"নিবাস ?"

তাহাও বলিলাম। প্রশংসায় মানুষের মন যাযই গলিয়া, বরং প্রশংসাব কারণ যত অল্প মনটা তত বেশি গলে ; আমিও ভদ্রলোকের নামধাম জিজ্ঞাসা কবিলাম, তাহার পব আরও প্রশংসা শুনিবার লোভেই হোক বা যে জন্যই হোক, একটু মিথ্যার অবতারণা করিয়া বলিলাম,

—"বাঃ, ঐখানে আপনার বাড়ি ? আমার তো প্রায়ই যাতাযাত ওধারে, আলাপ কবা যাবে একদিন গিয়ে। দাঁড়ান, ঠিকানাটা লিখে নিই—"

পকেটবুকটা বাহির করিলাম, তাহার পর কলমের জন্য বুকপকেটে হাত দিয়াই চক্ষুস্থির ! কলমটি অদৃশ্য হইয়াছে।

বৃদ্ধের প্রশংসা আবার উল্টা স্রোতে ছুটিল—"সরিয়ে নিলে ! সে কি মশাই ! কতক্ষণই বা আপনি ওখানে দাঁড়িয়েছিলেন !—পার্কার কলম ?—তাহলে তো দেখছি আপনি বিচার

করে যেটি ও ছোকরার হাতে তুলে দিলেন সেইটেই মনে হচ্ছে! এ যে ভেল্কি দেখিয়ে দিলে মশাই—গলা থেকে কলম বের করলে আর কী ভেল্কী হোত বলুন?—আর কেমন ফর্সা করে বেরিয়েও গেছে সবাই দেখুন একজন একজন করে—না, তারিফ করতে হয় বৈকি—ও আসামী, ফরিয়াদী, পুলিস, জুরি, উকিল—সব বেটাই এক সাটের—একটা গোলমাল বাধিয়ে আপনাকে টেনে নিয়ে কেমন হাল্কা করে ছেড়ে দিল!—আবার আপনাকেই সাজালে কোর্টের হাকিম, একবার রসিকতাটুকু দেখুন!—কবতে হয় না প্রশংসা—বলুন না—পারা যায় প্রশংসা না করে?—"

চোরের চেয়ে বিচারককে দেখিবার জন্য সকলের দৃষ্টি বেশী কৌতূহলী হইয়া উঠিযাছে; ঐ প্রশংসা, তাহার উপর আবার লাখোরকম প্রশ্ন; কলম যাক, এখন পা উঠিতেছে না যে নামিয়া কোন বকমে পরিত্রাণ পাই।

বর্ষায়

সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই বৃষ্টি নামিয়াছে, আড্ডা জমিল না। তিনজনে ছাড়া-ছাড়া ভাবে সময় কাটাইতেছিল—তারাপদ তাস ঘাঁটিতেছে, বাধানাথ সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখিতেছে, শৈলেন হাত দুইটাকে বালিস কবিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া গুন-গুন করিতেছে।

তারাপদ বলিল, "তোমার মাথার কাছেব জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসছে শৈলেন!"

শৈলেন বলিল, "আসুক, বেশ লাগছে; সুবিধে-আরাম যখন সম্পূর্ণভাবে নিজের আয়ত্তে, তখন ইচ্ছে ক'রেই একটু একটু অসুবিধে ভোগ কবায বেশ একটা তৃপ্তি আছে,—বাজারাজড়ার সখ ক'রে হেঁটে চলাব মত।"

বাধানাথ একটি সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী করিল—"কবি।"

তাবাপদ বলিল, "তাহ'লে আর একটু অসুবিধার তৃপ্তি ভোগ করতে তুমি না-হয় শুভেনকে ডেকে নিযে এস, চাবজন হ'লে দিব্যি আরাম ক'রে তাসটা খেলা যায়।"

রাধানাথ বলিল, "আমি গিয়েছিলাম তাব কাছে; সে আসবে না।"

"কেন?"

"তার দাদার শালী বেড়াতে আসবে।"

"আসুক না!"

বললে, "এ অবস্থায আমাব বাড়ি ছেড়ে যাওযাটা নেহাৎ অভদ্রতা হবে না?"

তারাপদ ভ্রূ কুঞ্চিত কবিযা বলিল, "ও! অভদ্রতা!..."

আবার চুপচাপ; শৈলেন গুনগুনানিটুকুও থামাইয়া দিয়াছে। একটু পরেই তারাপদই আবার মৌনতা ভঙ্গ করিল; প্রশ্ন করিল, "তোমরা ভালবাসা জিনিষটায বিশ্বাস কর?"

রাধানাথ বলিল, "যখন ভূতে করি তখন ভালবাসা আর কি দোষ করেছে—দুটোই যখন ঘাড়ে চাপবার জিনিষ। তবে সব সময় করি না বিশ্বাস। ঘোর অন্ধকার রাত্রি, পোড়ো বাড়ি কিংবা একটানা মাঠের মাঝখানে একটা পুরনো গাছ—একলা প'ড়ে গেছি—এ-অবস্থায় ভূত বিশ্বাস করি; আর ভালবাসার কথা,—কবির ভাষায় এ-রকম 'অঝোর-ঝরা শাওন

রাতি'—তোমার চা-টি দিব্যি হয়েছিল, আর ওদিকে বাড়িতে খিচুড়ী আর মাংসের খবর পেয়ে এসেছি, ভবিষ্যতের একটা আশ্বাস রয়েছে, এ-রকম অবস্থায় মনে হচ্ছে যেন প্রেম ব'লে একটা জিনিষ থাকা বিচিত্র নয়...এমন কি দাদার নেই-শালীর জন্যে একটা বিরহের ভাবও মনে জেগে উঠছে যেন।"

তারাপদ প্রশ্ন করিল, "কবি কি বল ?"

শৈলেন বলিল, "আমি যে রয়েছি, আরও প্রমাণ দিয়ে স্পষ্ট ক'রে বলতে গেলে—এখন, এ-ঘরে মাথা দিয়ে শুয়ে আছি—এটা বিশ্বাস কর ?"

"করি বইকি—না ক'রে উপায় কি ? বিশেষ ক'রে বষ্টি ছাটের সঙ্গে সঙ্গে তোমার শৈলেনত্বের প্রমাণ যখন..."

"তাহ'লে ভালবাসাকেও বিশ্বাস করতে হবে তোমাদের, কেন-না আমি আর ভালবালা সম-স্থিত, ইংরেজীতে তোমরা যাকে বলবে co-existent।"

তারাপদ তাস ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল, "বটে ! তা তোমার জীবনে যে একটা রহস্য আছে সে-সন্দেহ বরাবরই হয় বটে, তবে অ্যান্টি-শুকদেবের মত—আমি অ্যান্টি-ক্রাইষ্টের নজীরে কথাটা ব্যবহার করলাম—অ্যান্টি-শুকদেবের মত তুমি যে রমণী-প্রেম নিয়েই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছ এতটা জানা ছিল না। ব্যাপারটা ভেঙে বল একটু।"

"বয়স যখন সাত-আটের মাঝামাঝি সেই সময় ভালবাসার সূত্রপাত। ঠিক কোন্ লগ্নটিতে আরম্ভ হয়েছিল বলতে পারি না। অনভিজ্ঞেরা কাব্য-কাহিনীতে যা বলেন তা থেকে মনে হয় ভালবাসা জীবনের একটা নির্দিষ্ট রেখা থেকে আরম্ভ হয়, যেমন মাঠের উপর একটা চূনের রেখা কিংবা কোদালের দাগ থেকে আরম্ভ হয় বাজির দৌড়। ঐ যে শোন প্রথম দর্শন থেকেই প্রেম, কিংবা হাতের লেখা দেখেই ভালবেসে ফেলা, ও-সব কথা নিতান্তই বাজে। প্রেমকে একটি ফুল বলা চলে—ওর আরম্ভটা পাঁজির এলাকাভুক্ত নয়। কবে যে কেন্দ্রগত মধুকণাটুকু জমে উঠেছে, আর তাকে ঘিরে কচি দলগুলি কুঞ্চিত হয়ে উঠবে, তার হিসেব হয় না ; আমরা যখন টের পাই তখন যাত্রাপথে অনেক দূর এগিয়েছে—সেটা বিকশিত দলের ব্যাকুল গন্ধের যুগ...

"একদিন ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনতে শুনতে আমি ব্যাপারটুকুর সন্ধান পেলাম। সেদিনও বড় দুর্যোগ ছিল, ঝড়ঝাপটার ভাগটা আজকের চেয়েও বরং বেশি। রাজপুত্র অরূপকুমার কত দীর্ঘপথ পিছনে রেখে, কত দীর্ঘতর পথ সামনে ক'রে চলেছেন। আহার নেই, নিদ্রা নেই ; ভয় নেই, শঙ্কা নেই ; সঙ্গী বুকের মধ্যে একটি রূপের স্বপ্ন। যাত্রাপথের শেষে সাগরের অতল তলে মাণিকের তোরণ পেরিয়ে তাঁর পক্ষীরাজ ঘোড়া পৌঁছল রাজকুমারী কঙ্কাবতীর প্রবাল-পুরীর দ্বারে।

"এতটা হ'ল সাধারণ কথা, যাত্রাপথের দৈনন্দিন ইতিহাস।

"সেই বিশেষ রাত্রে অরূপকুমার আমি যখন সোনার কাঠি ছুঁইয়ে..."

তারাপদ প্রশ্ন করিল, "তুমি আবার কেমন ক'রে বয়স আর অবস্থা ডিঙিয়ে অরূপকুমার হয়ে পড়লে ?"

শৈলেন বলিল—"সাত-আট বছর বয়সের একটা মস্ত বড় সুবিধা এই যে, সে সময় বয়স আর অবস্থা সম্বন্ধে কোন চৈতন্য থাকে না, সুতরাং যাকে মনে ধরে নির্বিবাদে তার মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে পড়া চলে। এখন তুমি যে অমুক আর তোমার বয়স যে সাঁইত্রিশ, এই চেতনা তোমার চারিপাশে গণ্ডী সৃষ্টি ক'রে তোমাকে একান্তপক্ষে 'তুমি' ক'রে রেখেছে—

একটু গণ্ডী কাটিয়ে রাজপুত্র কোটালপুত্র হয়ে নেওয়া তো দূরের কথা, মুহূর্ত কয়েকের জন্য যে নিজের ছেলেবেলা থেকেই ঘুরে আসবে সেটাও দুষ্কর হয়ে ওঠে। এই তরলতার জন্য জীবনের সাত-আট বছর বয়সটা হ'ল রূপকথারই যুগ, যেমন সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ বছর সময়টা তার নির্বিকারত্বের জন্য সাহেব, বড়বাবু প্রভৃতির মধ্যে মুখ বুজে চাকরি করবার যুগ।...যাক, গল্পটাই শোন ঃ বর্ষা কেটে গেলে বায়ুমণ্ডলের এই ভিজে-ভিজে আমেজের ভাবটি যখন কেটে যাবে তখন আমি গল্পটা যে চালাতে পারব—এতে সন্দেহ আছে, কেন-না তখন নিজে যা বলছি তা নিজেই বিশ্বাস করতে পারব কিনা সন্দেহ আছে।

"কি বলছিলাম ? হ্যাঁ, সে-রাত্রে অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে দেখলাম সোনার কাঠি ছোঁয়াতে রূপোর পালঙ্কে যে জেগে উঠল সে রাজকুমারী কঙ্কাবতী নয়—সে হচ্ছে আমার সেজ-বৌদিদির সই নয়নতারা।

"কঙ্কাবতী নয—হাসিতে যার মুক্তা ঝরে, অশ্রুতে যার হীরে গ'লে পড়ে। যে চাঁদের বরণ কন্যের মেঘের বরণ চুল ; জেগে উঠতেই যার চোখের দীপ্তিতে সাত মহলে আলো ঠিকরে পড়ে, সাত সখীতে যাকে চামর দোলায়, যার জন্যে সপ্তবীণায় ওঠে সপ্তসুরের মূর্ছনা।

"সোনার কাঠির স্পর্শে তার জায়গায় আমার মুখের দিকে চোখ মেলে চাইলে নয়নতারা, যাকে বিনা উগ্র সাধনায়ই আমি প্রত্যহের কাজে অকাজে রোজই দেখছি। আমাদের বাড়ির কাছেই বোসপাড়ায় রেলের ধারে তাদের বাড়ি। সামনে পানায় ঢাকা ছোট একটা পুকুর, তাতে একটা বকুল গাছের ছায়ায় বাণাভাঙা সিঁড়ি নেমে গেছে। ঘাটের সামনেই খানিকটা দূর্বাঘাসে ঢাকা জমি...সেখানে শীতের শেষে বকুলে আর সজনে ফুলে কাদায়-গন্ধে মাখামাখি হয়ে প'ড়ে থাকত। তার পরেই একটা বকের পিছনে নয়নতারাদের বাড়ি খানিকটা কোঠা, খানিকটা গোলপাতার। মোট কথা, সাগরতলের প্রবাল-মহলের সঙ্গে তার কোনই মিল ছিল না।

"না ছিল স্বয়ং কঙ্কাবতীর সঙ্গে নয়নতারার কোন মিল। প্রথমতঃ, নয়নতারা ছিল কালো যা কোন রাজকন্যারই কখনও হবার কথা নয়। তবুও যে সে সে-রাত্রে আমার গল্পরাজ্যে অমন বিপর্যয় ঘটালে কি ক'রে, তা ভাবতে গেলে আমার মনে প'ড়ে যায় তার দুটি চোখ। অমন চোখ আমি আজ পর্যন্ত দেখি নি। তোমরা বোধ হয় স্বীকার করবে ফরসা মেয়ের চেয়ে কালো মেয়ের চোখই বাহারে হয়—সবুজ আবেষ্টনীর মধ্যে কালো জলের মত। পরে আমি ভাল চোখের লোভে অনেক কালো মেয়ের দিকে চেয়েছি, কিন্তু অমন দুটি চোখ আর দেখি নি। তার বিশেষত্ব ছিল তার অদ্ভুত দীপ্তি ; উগ্র দীপ্তি নয়, তার সঙ্গে সর্বদাই একটা হাসি-হাসি ভাব মিশে থেকে সেটাকে প্রসন্ন ক'রে রাখত। নয়নতারা বেজায় হাসত—বেহায়ার মত। যখন হাসত তখন তার কালো শরীর থেকে যেন আলো ছড়িয়ে পড়তে থাকত ; যখন হাসত না, আমার মনে হ'ত তখনও যেন খানিকটা আলো আর খানিকটা হাসির অবশেষ ওর চোখে লেগে রয়েছে। আমি সে-দুটি চোখ বর্ণনা করতে পারলাম না, তা ভিন্ন শুধু চোখ নিয়ে প'ড়ে থাকলে আমার গল্প শেষ করাও হয়ে উঠবে না। আমি একবার শুধু সে-চোখের তুলনা পেয়েছিলাম—কতকটা ; মানুষের মধ্যে নয়, পৃথিবীর কোন জিনিষেও নয়।—যদি কখনও শীতের প্রত্যূষে উঠে চক্রবালরেখার উপরে শুকতারা দেখ তো নয়নতারার চোখের কথা মনে ক'রো ; অর্থাৎ সে অপার্থিব চোখের তুলনা পৃথিবী থেকে অনেক দূরে—স্বর্গের কাছাকাছি।

"রেলের দিকে দেয়াল-দিয়ে-আড়াল-করা পানাপুকুরের ধারের জায়গাটিতে নয়নতারার সমবয়সী মেয়েদের আড্ডা জমত। পুরুষের মধ্যে প্রবেশাধিকার ছিল শুধু আমার, কারণ কয়েকটি কারণে আমি ঠিক সেই ধরণের ছেলে ছিলাম নবপরিণীতাদের যারা খুব কাজে লাগে। প্রথমতঃ বয়সটা খুব অল্প ; দ্বিতীয়তঃ আমি ছিলাম খুব অল্পভাষী যার জন্যে বাইরে বাইরে আমায় খুব হাঁদা ব'লে বোধ হ'ত, আর তৃতীয়তঃ আমার পুরুষ অভিভাবক না থাকায় বাড়িতে আমার অবসর ছিল সুপ্রচুর এবং ইচ্ছামত পাঠশালার বরাদ্দ থেকেও সময় কেটে অবসর বৃদ্ধি করবার মধ্যেও কোন বাধা ছিল না। ফলে ওরা যে আমায় শুধু দয়া ক'রে কাজে লাগাত এমন নয়, আমি না হ'লে ওদের কাজ অচল হয়ে যেত। সবচেয়ে বেশি এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল চিঠি নিয়ে ; এক কথায় আমি এই সংসদটির ডাক-বিভাগের পূর্ণ চার্জে ছিলাম বলা চলে। খাম-টিকিট নিয়ে আসা, চিঠি ফেলে আসা, এমন কি প্রয়োজন-বিশেষে পোস্ট আপিসে গিয়ে পিয়নের কাছ থেকে আগেভাগে চিঠি চেয়ে নিয়ে আসাও আমার কাজের সামিল ছিল ; আর পাঁচ-সাতজন নবোঢ়ার খাম, টিকিট, চিঠির সংখ্যার আন্দাজ ক'রে নিতে তোমাদের কোন কষ্ট হবে না নিশ্চয়ই। এছাড়া বাজার থেকে এটা-ওটা-সেটা এনে দেওয়াও ছিল,—চিঠির কাগজ, কালির বড়ি, মাথার কাঁটা, ফিতে, চিরুনি...আড়ালে ডেকে বলত—'পতি পরমগুরু' লেখা দেখে চিরুনিটা নিবি শৈল, লক্ষ্মী ভাই...আর এদের সামনে যখন ব'কব—'ও চিরুনি কেন মরতে নিয়ে এলি ব'লে, তখন চুপ ক'রে থাকবি—থাকবি তো ?...দুটো পয়সা নিয়ে ডালপুরী আলুর দম কিনে খেও, যাও...ভাগ্যিস শৈল ছিল আমাদের !

"এ ছাড়া সময়ের কাঁচা ফল, এবং সেগুলিকে তরুণীদের কাঁচা রসনার উপযোগী করবার নানা রকম মসলা আহরণ করাও আমার একটা বড় কাজ ছিল।...রাধানাথ, ও রকম নিঃশ্বাস ফেললে যে ? হিংসে হচ্ছে ?"

রাধানাথ বলিল, "নাঃ, হিংসে কিসের ? এই আমিও তো আজ তিন ঘণ্টা ধ'রে গিন্নীর ফর্দ মিলিয়ে মিলিয়ে মাসকাবারি কিনে নিয়ে এলাম—মসলা, তেল, ওষুধ, বার্লি...নাও, গল্প চালাও।"

"সেদিন ঠাকুরমার গল্পে নয়নতারা কঙ্কাবতীর জায়গা দখল ক'রে মিলন-বিরহ, হাসি-কান্না, মান-অভিমানে সমস্ত গল্পটির মধ্যে একটা অপরূপ অভিনবত্ব ফুটিয়ে তুললে। রূপকথা আর সত্যের সে অদ্ভুত মিশ্রণ আমার আজ পর্যন্ত বেশ মনে আছে। সেদিন অরূপকুমারকে বিদায় দিতে কঙ্কাবতীর চোখে যখন মুক্তা ঝরল তখন আমার সমস্ত অন্তরাত্মা রেলের ধারের সেই বকুলতলাটিতে এসে অসহ্য বেদনা-ব্যাকুলতা নিয়ে ভোরের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল।

"কিন্তু-আশ্চর্যের কথা—অবশ্য, এখন আর সেটাকে আশ্চর্য ব'লে ধরি না—তার পরদিন সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকেল গেল, সন্ধ্যা গেল, নয়নতারাদের বাড়ির দিকে কোনমতেই পা তুলতে পারলাম না। কেমন যেন মনে হ'তে লাগল, কালকের রাত্রের রূপকথাটা আমার চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে—ওদের সামনে গেলেই সব জানাজানি হয়ে যাবে। এখন লক্ষণ মিলিয়ে বুঝতে পারছি সেটা আর কিছু নয় নূতন ভালবাসার প্রথম সঙ্কোচ।

"সেজবৌদি বললে,—'হ্যাঁ শৈলঠাকুরপো, আজ সমস্ত দিন তুমি ও-মুখো হও নি যে ? নয়ন তোমায় খুঁজছিল।'

"রাত্রি ছিল, আমি লজ্জাটা ঢাকলাম, কিন্তু কথাটা চাপতে পারলাম না, বললাম—'যাও, খুঁজছিল না আরও কিছু।'

"সেজবৌদি বললে—'ওমা ! খুঁজছিল না ? আমি মিছে বললাম ? তিন-চার বার খোঁজ করেছিল, কাল সকালে যেও একবার।'

"বললাম—'আমার বয়ে গেছে।'

"ব'য়ে গেছে ত যেও না, আমায় বলতে বলেছিল, বললাম'—ব'লে বৌদি চলে গেলেন।

"সেদিন ঠাকুরমার ছিল একাদশী, গল্প হ'ল না,—অর্থাৎ তার আগের রাতে যে আগুনটুকু জ্বলেছিল তাতে আর ইন্ধন যোগাল না। পরের দিন অনেকটা সহজভাবে নয়নতারাদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলাম। সে তখন মেঝেয় উপুড় হয়ে চিঠি লিখছে। জিজ্ঞাসা করলাম—'আমায় ডেকেছিলে নাকি...কাল ?'

"নয়নতারা মুখ তুলে বাঁ-গালটা কুঞ্চিত ক'রে বললে—'যা যাঃ, দায় প'ড়ে গেছে ডাকতে, উনি না হ'লে যেন দিন যাবে না। দুটো চিঠির কাগজ এনে উপকার করবেন, তা...'

"ওদের চডটা-আসটাও মাঝে মাঝে হজম করতে হয়েছে, কিন্তু সেদিন এই কথা দুটোতেই এমন রূঢ় আঘাত দিলে যে মনের দারুণ অভিমানে বই-শ্লেট নিয়ে সেদিন পাঠশালায় চলে গেলাম,—মনে বৈরাগ্য উদয় হ'ল আর কি—জানই ত পাঠশালাটা হচ্ছে ছেলেবেলার শ্বাপদ-সঙ্কুল বানপ্রস্থ-ভূমি।...গুরুমশাই বাঘ, শিব পোড়ো ভাল্লুক ইত্যাদি। সেখানে আগের দিন চারেক অনুপস্থিত থাকবার জন্যে এবং সেদিনও দেরি হবার জন্যে বেশ একচোট উত্তম মধ্যম হ'ল।

"এর ফলে বাল্য-মোহের কচি শিখাটি প্রায় নির্বাপিত হয়েই এসেছিল, কিন্তু পাঠশালা থেকে ফেরবার পথে যখন বেল পেরিয়েছি, পুকুরের এপারে রাংচিতার বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে নয়নতারা ডাকলে। আমি প্রথমটা গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপর নয়নতারা আর একবার ডাকতেই আগেকার দু-দিনের কথা, সকালের কথা এবং পাঠশালার কথা একসঙ্গে সব মনে হুড়োহুড়ি ক'রে এসে কি ক'রে জানি না, আমার চোখ দুটো জলে ভরিয়ে দিলে। নয়নতারা বেরিয়ে এসে আমার হাত দুটো ধ'রে আশ্চর্য হয়ে বললে—'ওমা, তুই কাঁদছিস শৈল ? কেন রে, আয়, চল।'

"বাড়ি নিয়ে গিয়ে খুব আদর-যত্ন করলে সেদিন। দুটো নারকেল-নাড়ু আঁচলের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে এসে বললে—'তোর জন্যে চুরি ক'রে রেখেছিলাম শৈল, খা। তোকে সত্যি বড় ভালবাসি শৈল, তুই বিশ্বাস করবি না। তোকে রাগের মাথায় তাড়িয়ে দিয়ে মনটা এমন হুহু করছিল !...মুখে আগুন নস্তের, অত খোসামোদ করিয়ে, একটা নাটাইয়ের দাম আদায় ক'রে, যদিবা কালকে চিঠির কাগজ দিলে এনে, আজ কোনমতেই চিঠিটা ফেলে দিলে না রে ! গ'লে যাক অমন দুশমন গতর—বেইমানের।'

"এদিক-ওদিক একটু চেয়ে শেমিজের মধ্যে থেকে একটা গোলাপী খাম বের ক'রে মিনতির সুরে বললে—'সত্যি তোকে বড্ড ভালবাসি শৈল—বললে না পেত্যয় যাবি। এই চিঠিটা ভাই—বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে নে। আর একটু ঘুরে গিয়ে পোস্টাপিসে ফেলে দিয়ে বাড়ি যেও; রোদটা একটু কড়া; কষ্ট হবে ? হ্যাঁ, শৈলর আমার এ-কষ্ট কষ্ট ! নস্তে কিনা।...এগারটা বেজে গেছে, বারোটার সময় ডাক বেরিয়ে যাবে শৈল, লক্ষ্মীটি...'

"আমি এখনও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি,—পুকুরধারে, শানের বেঞ্চের পিছনে, বকুলগাছের আড়ালে আমার কাঁধে বাঁ-হাতটা দিয়ে নয়নতারা দাঁড়িয়ে আছে, আমার মুখের উপর ডাগর ভাসা-ভাসা চোখ দুটি নীচু করে,—তাতে চিঠির গোপনতার একটু লজ্জা, খোশামোদের ধূর্তামি, বোধ হয় একটু অনুতপ্ত স্নেহ, আর একটা কি জিনিষ—একটা অনির্বচনীয় কি জিনিষ যা শুধু নবপরিণীতাদের চোখেই দেখেছি,আর যা এই রকম চিঠি লেখা, চিঠি-পাওয়ার সময় যেন আরও বেশি ক'রে ফুটে ওঠে।

"এইখানে আমার ভালবাসার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় শেষ হ'ল, এই ফিরে যেতে যেতে আবার ঘুরে আসায়।...তোমাদের ঐ বয়সের মেয়েদের মজলিসের কোন অভিজ্ঞতা আছে ?"

তারাপদ বলিল, "না।"

রাধানাথ বলিল, "কি ক'রে থাকবে বল ? গার্জেনের কণ্টকারণ্যে মানুষ হয়েছি। চক্ষু সর্বদা বইয়ের অক্ষরলগ্ন থাকত, অক্ষরের রূপে যে মুগ্ধ ছিলাম তা নয়,—বই থেকে চোখ তুললেই বাবা কিংবা পাঁচ কাকার কেউ-না-কেউ চোখে পড়তেন। ছুটিছাটায় যদি দুই-এক জন বাইরে গেলেন তো সেই ছুটির সুযোগে মামা পিসেমশাইদের দল এসে আমার ভবিষ্যতের জন্যে সতর্ক হয়ে উঠতেন। তাঁরা ছিলেন উভয়পক্ষ মিলিয়ে সাতজন। শেষবারে এই তেরজন মাথা একত্র ক'রে বিয়ে দিলেন একটি নিষ্কণ্টক মেয়ের সঙ্গে, যার বাপের সম্পত্তিতে ভাগ বসাবার জন্যে না ছিল বোন, না ছিল একটা ভাই যে একটি শালাজেরও সম্ভাবনা থাকবে।...নাও, ব'লে যাও, আবার মজলিস ! এত কড়াক্কড়ির মধ্যে যে একটি মেয়ে কোন রকমে ঢুকে পড়েছে এই ঢের।"

তারাপদ বলিল, "রাধানাথ চটেছে,—তা চটবার কথা বইকি..."

শৈলেন বলিল, "নয়নতারাদের মজলিসের কথা বলতে যাচ্ছিলাম। আগে বোধ হয় এক জায়গায় বলেছি যে এ-মজলিসে আমার মুক্তগতি ছিল। ছিল বটে, কিন্তু এর পূর্বে আমি আমার ছাড়পত্রের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতাম না। তার কারণ ওদের কথা সব সময় ঠিকমত বুঝতামও না আর বুঝলেও সব সময় রস পেতাম না। আমার নিজেরও বয়স-সুলভ নেশা ছিল,—মাছ ধরা, স্টেশনের পাখার দিকে চেয়ে ট্রেনের প্রতীক্ষা করা, এবং ট্রেনের ধোঁয়া দেখা দিলে লাইনে পাথর সাজিয়ে রাখা, ঘুঁড়ি ওড়ানো, এই সব। কিন্তু এবার থেকে আমার মস্ত একটা পরিবর্তন দেখা দিল,—মাছ, ঘুড়ি, ট্রেনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব গিয়ে সমস্ত মনটি নয়নতারাদের মজলিসে, নয়নতারার,—বিশেষ ক'রে নয়নতারার আশ্চর্য চোখ দু'টিতে কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠল। সে যখন তাস খেলত আমি তার সামনে কারুর পাশে একটু জায়গা ক'রে নিয়ে ব'সে থাকতাম। নয়নতারা তাস দিচ্ছে পিঠ ওঠাচ্ছে ; তার চুড়িগুলি গড়িয়ে একবার মণিবন্ধের নীচে, একবার কনুইয়ের কাছে জড়াজড়ি ক'রে পড়ছে। কখনো সে তার আনত চোখের ওপর ভ্রূ দুটি চেপে চিন্তিতভাবে মাথা দোলাচ্ছে, তার কপালের কাঁচপোকার ময়ূরকণ্ঠী রঙের টিপটি ঝিক্‌ঝিক্ ক'রে উঠছে, আমি ঠায় ব'সে ব'সে দেখতাম। তখন ছিল কাঁচপোকার টিপের যুগ, এখন বেচারি আর সুন্দর কপালে ঠাঁই পায় না, তার নিজেরই কপাল ভেঙেছে। আমি প্রতীক্ষা করতাম—জিতলে কখন্ নয়নতারার পান-খাওয়া ঠোঁটে হাসি ফুটবে ; হারলে সে যে আমার কাছের মেয়েটিকে চোখ রাঙিয়ে কটুমন্দ বলবে সে দৃশ্যও আমার কাছে কম লোভনীয় ছিল না। একটা কথা আমি স্বীকার করছি,—আজ যে-ভাবে বয়সের দূরত্ব থেকে নয়নতারাকে দেখছি, সে-সব

দিন যে ঠিক সেই ভাবেই দেখতাম তা নয়। তখন তার সমস্ত কথাবার্তা, চালচলন, হাসি-রাগ আমার কাছে এক মস্তবড় বিস্ময়কর ব্যাপার ব'লে বোধ হ'ত, —যে বিস্ময়ে মনের উপর একটা সম্মোহন বিস্তার ক'রে মনকে টানে। এ-দিক দিয়ে দেখতে গেলে মনোবিজ্ঞানের নিক্তির তৌলমত আমার মনোভাবটাকে ভালবাসা না ব'লে ভাল লাগা বলাই উচিত ছিল। আমি ভালবাসা ব'লে যে সুরু করেছি তার কারণ এর মধ্যে আবার ঐ মনস্তত্ত্বেরই পরখ-মত কিছু কিছু জটিলতা ছিল, সে-কথা পরে যথাস্থানে বলব।

"সেদিন তাসের মজলিস ছিল না, একটা বই পড়া হচ্ছিল। বইটা যে ভাগবত কিংবা মনুসংহিতা নয় এ-কথা বোধ হয় তোমাদের ব'লে দিতে হবে না। আমি যে বসেছিলাম এটা ওরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে নি, তার প্রধান কারণ ওরা নিজেদের খেয়ালে সেদিন খুব বেশিরকম মশগুল ছিল আর দ্বিতীয় কারণ—আগে বোধ হয় বলেছি—ওরা সাধারণতঃ আমায় এসব বিষয়ে জড়পদার্থের সামিল বলেই ধ'রে নিত। সেদিন আবার আমি একেবারেই জড়পদার্থ হয়ে গিয়েছিলাম, কেননা নয়নতারাকে সেদিন যেন আরও অপরূপ দেখাচ্ছিল। আমি বোধ হয় বইটাও শুনছিলাম না ; সেই জন্যে, তার বটতলা-মার্কা চেহারা মিলিয়ে মোটামুটি তোমাদের কাছে তার কুলশীলটা জানাতে পারলাম, তার নাম-ধামটা দিতে পারলাম না।

"এর মধ্যে একটি মেয়ে—নামটা বোধ হয় তার সুধা কি এই রকম কিছু, ঠিক মনে পড়ছে না—আমার দিকে চেয়ে বললে—'শৈল ভাই, যা না, আমার সেই কাজটা...দেরি হয়ে যাচ্ছে...'

"অপর একজন জিজ্ঞাসা করলে—'কি কাজ রে ?'

"সুধা বললে—'কিচ্ছু না।'

"সেই মেয়েটা ঠোঁট উল্টে ভ্রূ নাচিয়ে বললে—'ওরে ব্বাবা ! শুধু আমি জানি আর আমার মন জানে !...জিজ্ঞেস ক'রে অপরাধ হয়েছে, মাফ চাইছি।'

"তার রাগটা পড়ল আমার উপর। একটা কুঞ্চিত ক'রে বললে—'তা তুই এখানে কচ্ছিস কি রে ? আরে গেল ! তুই কি বুঝিস এসব ?'

"অন্য একজন বললে 'তোর পাঠশালা নেই ?'

"কে উত্তর দিলে—'পাঠশালে তো গুরুমশাই এসব কথা বলবে না, বলে তো দু বেলা ছেড়ে তিন বেলা গিয়ে সেখানে ধন্না দেয়। ও মিনমিনেকে চিনিস্ না তোরা।'

"কথাটার জন্যেও এবং আমার মুখের ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটার জন্যেও ওদের মধ্যে একটা হাসি প'ড়ে গেল।

"একজন বললে 'ওর আর দোষ কি ? ওদের জাতটাই হ্যাংলা ; কি রকম ক'রে চেয়ে রয়েছে দেখ না। যেন পায় তো সবগুলোকে এক এক গেরাসে গিলে খায়।'

"আবার একচোট হাসি। তারই মধ্যে একজন বললে—'কাকে আগে ধরবি রে ?'

"আবার হাসি, আরও জোরে ; সব দুলে দুলে গড়িয়ে পড়তে লাগল, ঝড়ে ঘনসন্নিবিষ্ট গাছগুলো যেমন এলোমেলো ভাবে পরস্পরের গায়ে লুটোপুটি খায়।

"হাসিতে যোগ দিলে না শুধু খনু। সে গম্ভীরভাবে বললে—'আগে ধরবে নয়নকে ; সেই থেকে ঠায় ওর মুখের দিকে কি ভাবে যে চেয়ে আছে ! কি বয়াটে ছেলে গো মা ! নয়ন আবার দেখেও দেখে না।'

"এখন বুঝতে পারছি, তাকে ফেলে নয়নতারাকে দেখবার জন্যেই তার এত আক্রোশ।

খনুর আসল নাম ছিল ক্ষণপ্রভা ; সে ছিল খুব ফরসা, সুতরাং সুন্দরী। এই রঙে-নামে তার চরিত্রের মধ্যে ঈর্ষার ভাবটা প্রবল ক'রে তুলেছিল।

"নয়নতারা যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে গেল ; কিন্তু তখনই সে-ভাবটা সামলে নিয়ে বললে—'দেখতে হয়ত তোকেই দেখবে, আমার মত কালো-কুচ্ছিৎকে দেখতে যাবে কেন !'

"খনু বললে—'আমায় দেখলে ঠাস ঠাস ক'রে ছোঁড়ার দু-গালে চার চড় কষিয়ে দিতাম—নগদ দক্ষিণে।'

"নয়নতারা ততক্ষণে সপ্রতিভ ভাবটা বেশ ফিরিয়ে এনেছে। চকিতে ভ্রূ নামিয়ে বললে—'পেট ভরে খাওয়ার পরেই দক্ষিণে হয়, আমায় দেখলে পেটও ভরবে না, দক্ষিণেও নেই।'

"এটা প্রশংসা ছিল না, ঠাট্টা ; কেননা রঙেই সুন্দরী হয় না। হাজার গুমর থাকা সত্ত্বেও খনুর যে এটা না জানা ছিল এমন নয়। সে মুখটা ভার ক'রে রইল।

"তুলনায় নয়নতারাই সবচেয়ে সুন্দরী ব'লে—বিশেষ ক'রে কালো হয়েও সুন্দরী ব'লে—খনুর দলেও কয়েকজন মেয়ে ছিল। তার মধ্যে সুধা একজন। সে অবজ্ঞাভরে ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে বলল—'ঠাট্টা কর্ নয়ন ; কিন্তু খনুর মত হ'তে পারলে বর্তে যেতিস—আমি হক্ কথা বলব।'

"নয়নতারা গাম্ভীর্য মুখভার একেবারেই সহ্য করতে পারত না। গুমটটা কাটিয়ে মজলিসটায় হাসি ফোটাবার জন্যে মুখটা কপট-গম্ভীর ক'রে বললে—'ওমা, সে আর যেতাম না !' সঙ্গে সঙ্গে খনুর দিকে হেলে প'ড়ে বললে—'আয় তো খনু, একটু গায়ে গা ঘষে নি।'

"ফল কিন্তু উল্টো হ'ল। 'হয়েছে' ব'লে খনু হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে মসলিস ছেড়ে চলে গেল। খানিকটা চুপচাপ গেল, তার পর নয়নতারা হঠাৎ রেগে উঠে আমার দিকে চেয়ে বললে—'ফের যদি তুই কাল থেকে এখানে এসেছিস্ ত তোর আর কিছু বাকী রাখব না। তুই মেয়েদের মুখের দিকে হাঁ ক'রে কি দেখিস্ রে ?...গলা টিপলে দুধ বেরোয...'

"সবার হাসিঠাট্টা ধমকানির মধ্যে আমাব অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল, কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললাম—'আমি কখ্খনও দেখি না।'

"নয়নতারা বললে—'দেখিস্ ; নিশ্চয় দেখিস্ ; তোর কোন গুণে ঘাট নেই। না যদি দেখিস ত এই যে খনী এক ডাঁই মিথ্যে ব'লে গেল, বোবার মত চুপ ক'রে গেলি কেন ?'

"সুধা শরীর দুলিয়ে দুলিযে উঠে প'ড়ে বললে—'খনু মিথ্যে বলে নি ; দেখে ও ড্যাবড়া-ড্যাবড়া চোখ বার ক'রে। পাঁচ বছরেরই হোক আর পঞ্চাশ বছরেরই হোক—বেটাছেলেই ত ? আমাদের চোখে কেমন লাগে তাই বলি ; থাকলেই বলতে হয়, তার চেয়ে না থাকাই ভাল বাবা !'

"সেদিন আড্ডা আর জমল না। কয়েকজন খনুর সঙ্গে মতৈক্যের জন্যে গেল ; বাকী কয়েকজন কথাটা নিয়ে খানিকটা নাড়াচাড়া করলে, তার পর আকাশে মেঘের অবস্থা দেখে একে একে উঠে যেতে লাগল। আমার অবস্থা হয়ে পড়েছিল 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ; আমাদের পাড়ার ননী উঠতে আমি কোন রকমে দাঁড়িয়ে উঠলাম।

"ননী মেয়েটি ছিল অত্যন্ত চাপা। সে যে কোন্ দিন কোন্ দলে, টপ্ ক'রে বোঝবার উপায় ছিল না। বোঝা যেত একেবারে শেষের দিকে, যখন সে নিজের নির্বিকারত্ব পরিহার ক'রে তার অভীপ্সিত দলের একেবারে শেষ এবং মোক্ষম কথাটি ব'লে উঠে যেত। আমি

উঠতেই বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে—'তুইও যাচ্ছিস নাকি?'

"বললাম—'হুঁ।'

"তা হ'লে দয়া ক'রে এগিয়ে যাও ; ভাব ক'রে সঙ্গে গিয়ে কাজ নেই—আমি তোমার ভাবের লোক নই।...না হয়, তুই পরেই আসিস্'খন, দিব্যি দু-চোখ ভ'রে দেখ না ব'সে ব'সে, আর ত কেউ বলবার রইল না,' বলে চাবির থোলো-বাঁধা আঁচলটা ঝনাৎ ক'রে পিঠে ফেলে হন্ হন্ ক'রে চলে গেল।

"আর খানিকটা জড়ভরতের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। ননী বেশ খানিকটা চলে গেলে শচী বললে—'মুয়ে আগুন, গোমড়ামুখী!'

"শচীও চলে গেল। বৃষ্টি তখন এলো ব'লে। আমি পা বাড়াচ্ছি, নয়নতারা বললে—'ভিজে যাবি শৈল, একটু ব'সে যা ; চল্ বাড়ির ভেতর।'

"সেদিনটি আমার স্পষ্ট মনে আছে, আশা করি কখনও অস্পষ্ট হবে না। তখনও ভাল ক'রে বিকেল হয় নি, কিন্তু আকাশে গাঢ় মেঘের জন্যে মনে হচ্ছিল যেন সন্ধ্যার আর দেরি নেই। মজলিস যখন ভাঙল সে সময় রেলের ওপারে বনের আড়াল থেকে একটা আরও কালো মেঘের ঢেউ যেন মেঘলা আকাশটায় ভেঙে পড়ল, মনে হ'ল দিনটাকে অতি শীঘ্র রাত ক'রে তোলবার জন্যে কোথায় যেন মস্ত বড় তাড়াহুড়ো প'ড়ে গেছে। একটু পরেই ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নামল।

"রেলের দিকে নয়নতারাদের দুটো ঘর, একটা বড়, একটা অপেক্ষাকৃত ছোট। নয়নতারা একটু এদিক-ওদিক ক'রে এসে ছোট ঘরে রেলের দিকের জানালাটির চৌকাঠের পাশে বসল। আমায় বললে—'তুই এইখানটায় বোস্ শৈল, ভাগ্যিস যাস্ নি, না?'

"বললাম—হ্যাঁ, ভিজে যেতাম।"

"জানালাটা দিয়ে অল্প অল্প বৃষ্টির ছাট আসছিল, নয়নতারা হঠাৎ গুটিসুটি মেরে একটু হেসে বললে—'একটু একটু বৃষ্টি এসে গায়ে লাগলে কিন্তু বেশ লাগে, তোর ভাল লাগে না শৈল?'

"বললাম—'না, ভিজে যেতে হয়।'

রাধানাথ বলিল, "তখন তাহ'লে তোমার মাথায় একটু সুবুদ্ধি ছিল বলতে হবে, এখন দেখছি..."

শৈলেন বলিল, "ভুল বলছ, তখন বৃষ্টিতে ভেজা বরং একটা রীতিমত উৎসব ছিল আমার পক্ষে, কিন্তু সে সময় যা বলবার তা শুধু নয়নতারার কথা ভেবে,—তার ভেজা দেখে কষ্ট হচ্ছিল।"

তারাপদ বলিল, "এত দূর!"

শৈলেন বলিয়া চলিল—"নয়নতারা ব'সে ব'সে অনেকক্ষণ ধ'রে বৃষ্টি দেখতে লাগল।...তার মুখের আধখানা দেখতে পাচ্ছি,—কি রকম অন্যমনস্ক হয়ে মুখটা একটু উঁচু ক'রে ব'সে আছে, মুখটাতে একটা ছায়া পড়েছে, বৃষ্টির ছাটের ছোট ছোট গুঁড়ি মুখের এখানে-সেখানে, চোখের কোঁকড়ানো পাতার ডগায়, কপালের চুলে চিকচিক করছে। হঠাৎ কি ভেবে বললে—'চারদিক মেঘে ঢেকে গেলে মনে হয় সব্বাই—যে যেখানে আছে—সব যেন এক জায়গায় রয়েছি, না রে শৈল?'

"এখন মানে বুঝি, তখন একেবারেই বুঝি নি ; তবুও এত তন্ময় আর অন্যমনস্ক ছিলাম যে কিছু না ভেবেই ব'লে দিলাম—'হ্যাঁ।'

''নয়নতারা বোধ হয় নিজের ঘোরে বলেছিল কথাটা, কোন উত্তরের অপেক্ষায় বা আশায় নয়। আমার দিকে একটু চেয়ে রইল। আরও খানিকক্ষণ চুপচাপের পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে—'মেঘ তোর কেমন লাগে শৈল ?'

''সামান্য যেন একটু কুণ্ঠা, তার পরেই বললে—'মেঘ কালো কিনা, তাই জিজ্ঞেস করছি, বিদ্যুৎ বরং ঢের সুন্দর...'

''আমি উত্তর দিলাম—'বেশ লাগে মেঘ।'

''ঠিক মনে পডছে না, তবুও যেন বোধ হচ্ছে নয়নতারার চোখের তারা একটুখানির জন্যে কি রকম হয়ে গেল। হ'তে পারে এটা আমার আজকের সজাগ মনের ভুল বা অপসৃষ্টি, কিন্তু এই রকম বর্ষা পড়লেই সেদিনকার সেই ছবিটি যখন ফুটে ওঠে, দেখি নয়নতারার চোখ দুটি যেন একটু নরম হয়ে উঠেছে।

''একটু পরে আবার বললে—'ক্ষণপ্রভা মানে বিদ্যুৎ- ঐ যে খেলে গেল...খনার নাম...'

''আমি সরস্বতী দেবীর অতটা বিরাগভাজন হ'লেও কি ক'রে জানি না—এই অসাধারণ কথাটার মানে অবগত ছিলাম। সেইটিই পরম উৎসাহে বলতে যাব এমন সময় নয়নতারা হঠাৎ জানলা থেকে নেমে এসে আমার সামনে ব'সে পড়ল, এবং আমার মুখের পানে কি এক রকম ভাবে চেয়ে ব'লে উঠল--'তুই আমায় অত ক'রে দেখসি কেন রে শৈল ? আমি তো কালো !...'

''এখন আমিও বুঝেছি, তোমরাও বুঝছ আসল ব্যাপারটা কি--অর্থাৎ নয়নতারাকে সেদিন বর্ষায় পেয়েছিল, নবোঢ়ার মন পাড়ি দিয়েছিল তার দয়িতের কাছে ; –আকাশে ওদিকে বর্ষা, সে এদিকে মনে মনে শৃঙ্গার করেছে, তার পরে আমার চোখের মুকুরে নিজের রূপটি দেখে নিয়ে সে যাবে,—সে কালো, তাই তার অপূর্ণতার ব্যথা, খনুর সঙ্গে তুলনা।

''সেদিন আমি এ কথাটা বুঝি নি, বোঝবার সম্ভাবনাও ছিল না। সেদিন এই বুঝলাম যে আমার জন্যেই নয়নতারা এ প্রশ্নটা করছে, সে বলছে—তোমার যদি ভাল লাগে তাহ'লেই আমার রূপের আর জীবনের সার্থকতা- আমার সমস্ত জীবন-মরণ নির্ভর করছে তোমার একটি ছোট্ট উত্তরের উপর।...

''আমি তখন যা ভেবেছিলাম তা গুছিয়ে বলতে গেলে এই দাঁড়ায় যে সেদিন নয়নতারা আমার বয়সের গণ্ডী থেকে তুলে নিয়ে আমায় পৌরুষের জয়টীকা পরিয়ে দিলে, আমার হ'ল প্রেমের অভিষেক।

''প্রবল কুণ্ঠায় এবং কেমন একটা সশঙ্ক আনন্দে আমি মুখটা নামিয়ে নিলাম, উত্তর দিতে পারলাম না। উত্তর দিলে কথাটা তখনই পরিষ্কার হয়ে যেত, কেননা নয়নতারা সেদিনকার নিভৃতে যেমন নিঃসঙ্কোচে আরম্ভ করেছিল তাতে সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার বরের কথা এনে ফেলত। যদি বলতাম—তবুও—অর্থাৎ কালো হলেও তুমি খুব সুন্দর সে হয়ত বলত—তোর কথার সঙ্গে 'ওর' কথা মিলে গেছে, শৈল,—মেলে কিনা তাই দেখবার জন্যে জিজ্ঞেস করছিলাম।—কিংবা এই রকম কিছু, কেননা এই ধরণেরই একটা কথা তার মনে ঠেলে উঠছিল।

''ফলে, সত্যের আলোয় যে ধারণাটা তখনই নিরর্থক হয়ে যেতে পারত, মিথ্যার অর্থাৎ ভ্রান্তির অন্ধকারে সেটা আমার জীবনে একটা অপূর্ব সার্থকতা লাভ করলে। আমার ভালবাসার তন্তু এতদিন শূন্যে দুলছিল, আশ্রয়-শাখা এগিয়ে এসে তাকে স্পর্শ করলে।

বোধ হয় এত দিন আমার শুধু ভাল লাগছিল মাত্র, সেদিন থেকে আমি নিঃসন্দেহ ভালবাসলাম, আমার ভালবাসার ইতিহাসে দ্বিতীয় স্তর আরম্ভ হ'ল।"

তারাপদ বলিল, "তোমার গল্পটা মন্দ লাগছে না, তবে জিনিষটাকে ভালবাসা বলায় স্পর্ধার গন্ধ আছে, যদিও এ ভ্রান্তির জন্য আমরা তোমায় ক্ষমা করতে রাজী আছি, কেননা ভ্রান্তিই কবির ধর্ম।"

রাধানাথ বলিল, "কেননা কবি বিধাতার ভ্রান্তিই।"

শৈলেন বলিল, "না, সেটা ভালবাসাই, কেননা এবার থেকে যা লক্ষণ সব প্রকাশ পেতে লাগল তা ভালবাসার একেবারে নিজস্ব জিনিস—ট্রেড-মার্কা দেওয়া। একটি গুরুতর লক্ষণ দাঁড়াল—ঈর্ষা।

"হ্যাঁ, তার আগে সেদিনকার কথাটা শেষ ক'রে দিই। উত্তর না পেয়ে নয়নতারা আমার মুখটা দুটো আঙুল দিয়ে তুলে ধরে বললে—'তোর বুঝি আবার লজ্জা হ'ল!'

"বোধ হয় তার প্রশ্নের জটিলতাটা উপলব্ধি করলে এতক্ষণে। একটু কি ভাবলে, তার পর আমার হাতটা ধরে একটু গলা নামিয়ে বললে—'আমি তোকে ও-কথাটা জিজ্ঞেস করেছি, কাউকে বলিস নি যেন শৈল, বলবি না তো ? বোস্, আমি আসছি'—ব'লে চলে গেল ; অবশ্য আর এল না সেদিন

শৈলেন একটু চুপ করিল। রাধানাথ বলিল, "বৃষ্টি তোমার কবিত্বের গোড়ায় জল যোগাচ্ছে বটে শৈলেন, কিন্তু ওদিকে তারাপদর কার্পেটটা ভিজিয়ে তার সমূহ অপকার করছে, আতিথেয়তায় ত্রুটি হয় ব'লে বোধ হয় ও বেচারা..."

তারাপদ তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, শৈলেন বলিল, "দাও বন্ধ ক'রে।"

বন্ধ জানলার উপর ধারাপাতের জন্য মনে হইল বৃষ্টিটা যেন হঠাৎ বাড়িয়া গেল। শৈলেন চোখ বুজিল, যেন কোথায় তলাইয়া গিয়াছে। তারাপদ আর রাধানাথ বুঝিল সেদিন নয়নতারাকে যেমন বর্ষায় পাইয়াছিল আজ ঠিক সেই ভাবে পাইয়াছে শৈলেনকে। শৈলেনের গল্পে আর বাহিরের বর্ষা বোধ হয় তাহাদের ভিতরের গদ্যাংশেও কিছু কিছু তরল করিয়া আনিয়াছিল, তাহারা শৈলেনের মৌনতায় আর বাধা দিল না।

একটু পরে যেন একটা তরলতা হইতে ভাসিয়া উঠিয়া শৈলেন বলিল, "হ্যাঁ, কি বলছিলাম ? ঠিক, ঈর্ষার কথা। যখন আমার ভাল-লাগার খাদ মরে গিয়ে সেটা ভালবাসায় দাঁড়াল, সেই বরাবর থেকে একটি নির্দোষ, নিরীহ লোক আমার শত্রু হয়ে দাঁড়াল,—সাক্ষাৎ ভাবে আমার কাছে কোন অপরাধ না ক'রেও। এই লোকটি নয়নতারার স্বামী অক্ষয়।

"অক্ষয়ের পরোক্ষ অপরাধ এই যে সে নয়নতারাকে বিবাহ করেছে। ঘটনাটি প্রায় এক বৎসরের পুরনো, কিন্তু এতদিন এতে ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না, কেননা অক্ষয় এতদিন একটি নির্বিঘ্ন নেপথ্যে অবস্থান করছিল। বর্ষায় সেদিন নয়নতারার যে নূতনতর আলো ফুটে উঠল সেই আলোতে হঠাৎ অক্ষয় দুর্নিরীক্ষ্য ভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অনেক কথা, যা কখনও ভাবিও নি, তা শুধু ভাবনার নয়, একেবারে দুর্ভাবনার বিষয় হয়ে উঠল।—নয়নতারা আমায় খুবই ভালবাসে—আমার জন্যে নারকেল-নাড়ু চুরি ক'রে রাখে, ছেঁড়া কাপড়ের রুমাল তৈরি ক'রে তাতে রেশমের ফুল তুলে দেয়, ঘুঁড়ির, ডালপুরির পয়সা যোগায়, গুরুমশাইয়ের বেতের দাগ পড়লে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে রুচিকর ভাষায় গুরুমশাইয়ের আদ্যশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করেছে—জীবনের অমূল্য সম্পদ এসব ; কিন্তু তার সামান্য একটি চিঠি পাবার কি পাঠাবার আগ্রহ আজ হঠাৎ এসবকে যেন নিষ্প্রভ,

অকিঞ্চিৎকর ক'রে দিলে। সে আগ্রহটা আমার প্রতি তার সাক্ষাৎ আচরণের কাছে সামান্যই একটা ব্যাপার—কে পৃথিবীর কোন্ এক কোণে প'ড়ে আছে, তার সঙ্গে দুটো অক্ষরের সম্বন্ধ, কিন্তু এটাও আমার অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। ষোল আনার মধ্যে সাড়ে পনর আনা আমিই পাচ্ছি, কিন্তু ওদিকে যে ঐ দুটো পয়সা যাচ্ছে ওটুকু বরদাস্ত করা—যতই দিন যেতে লাগল—ততই আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগল।

"ঠিক এই সময় একটি ব্যাপার ঘটল যা অবস্থাটিকে ঘনীভূত ক'রে তুললে।

"একদিন সুধীর একটা খুব জরুরী চিঠি ডাকে দিতে যাচ্ছি, স্টেশনটা ছাড়িয়েছি, এমন সময় স্টেশনের গেট দিয়ে অক্ষয় বেরিয়ে এল। সেই ট্রেন থেকে নেমেছে। চুল উস্কখুস্ক, মুখ শুকনো। আমায় দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে বলল—'এই যে শৈলেনভায়া! মানে—ইয়ে—এরা সব কেমন আছে বলতে পার?'

"তখন 'এরা'-র মানে আমি বুঝি, না বুঝাই অস্বাভাবিক, বললাম—'ভাল আছে।'

"অক্ষয়ের মুখটা যেন অনেকটা পরিষ্কার হ'ল। আমার হাতটা ধ'রে জিজ্ঞাসা করলে—'পথ্যি পেয়েছে?—কবে পেলে?—অ্যাঁ?'

"আমি বিস্মিত হয়ে চুপ ক'রে রইলাম, তারপর বললাম—'কই তার তো অসুখই করে নি!'

"অসুখ করে নি! তবে?—ব'লে অক্ষয়ও খানিকটা আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে চাইলে, আস্তে আস্তে চোখ ঘুরিয়ে কি ভাবলে, তার পর মুখটা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, 'দেখ, কাণ্ড! আচ্ছা তো!...তুমি বুঝি চিঠি ফেলতে যাচ্ছ?—কোন্ দময়ন্তীর?'

"নয়নতারাকে লেখা পত্রে অক্ষয় আমার সম্বন্ধে প্রায়ই উল্লেখ করত—'হংসদূত' বলে, তা নিয়ে চিঠি পড়বার সময় চর্চা হ'ত। সুতরাং দময়ন্তী কথাটার অর্থ বুঝতে আমার অসুবিধে হ'ল না। বললাম—'সুধাদিদির।'

"ঐ ত লেটার-বক্স,—যাও—ফেলে দিয়ে এস। একসঙ্গে যাওয়া যাবে'খন।'

"ভালবাসা যখন জমে আসছে, তার মধ্যে অক্ষয়ের এসে পড়াটা আমার মোটেই প্রীতিকর হয় নি কিন্তু ফিরে আসতে আসতে যখন শুনলাম নয়নতারার এই মিথ্যাচরণের জন্যে তাকে কি নাকালটা ভোগ করেই চ'লে আসতে হয়েছে তখন আমার মনটা খুবই খুশি হয়ে উঠলো। বেচারা আপিস থেকে বাড়িও যেতে পাবে নি; যখন স্টেশনে, তখন ফার্স্ট বেল হয়ে গেছে, ছুটতে ছুটতে শানবাঁধানো প্লাটফর্মে পিছলে প'ড়ে গিয়ে হাঁটুটা গেছে কেটে, হাতটা গেছে ছ'ড়ে; কাপড়ে রক্তের দাগ দেখিয়ে বললে—'এই দেখ কাণ্ডটা।'

"এটার আকস্মিকতাটা আমি আর ধরলাম না; আমার মনে হ'ল দারুণ দুর্ভাবনায় ফেলা থেকে নিয়ে প্লাটফর্মে আছাড় খাওয়ানো পর্যন্ত সমস্তই নয়নতারার কীর্তি,—সৎকীর্তি। আমার মনটা নয়নতারার উপর প্রসন্নতায় ভ'রে উঠল এবং অক্ষয়কে চিঠি লিখবার জন্যে, আর তার চিঠির প্রতীক্ষা করবার জন্যে যে মনে মনে একটা অভিমান এবং আক্রোশের ভার ঠেলে উঠছিল সেটা একেবারে কেটে গেল। বুঝলাম—এত যে চিঠি তার মধ্যে এই নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় জীবটিকে প্লাটফর্মে আছাড় খাওয়াবার একটা গূঢ় অভিসন্ধি জমে উঠছিল। অক্ষয়ের প্রতি আমার মনের ভাবের সঙ্গে নয়নতারার মনের ভাবে এ-রকম আশ্চর্য মিল দেখে তার সঙ্গে বেশ একটা নিবিড়তর ঘনিষ্ঠতা উপলব্ধি করলাম।

"তার পরদিন দুপুরের মজলিস বেশ জমাট রকম হ'ল—প্রায় ফুল হাউস্। কিন্তু কথাবার্তা প্রশ্নোত্তর বেশির ভাগই চাপা গলায় হওয়ায় এবং বিতর্কের ভাগটা কম থাকায়

গোলমাল বেশি হ'ল না। আমাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি পুকুরের ওপারে কামিনীতলায বসে মাঝে মাঝে হাসির হররা শুনছিলাম আর অক্ষয়কে আমার এই নির্বাসনের জন্য দায়ী ক'রে মনের নির্বাণপ্রায় রাগের শিখাটিকে আবার পুষ্ট করে তুলছিলাম।

"প্রথম পর্ব শেষ হ'লে তাস পড়ল। নয়নতারা আমায় বাড়ি থেকে কি একটা আনতে বললে ; এনে দিয়ে আমি দলের পাশে আমার জায়গাটিতে বসলাম। সুধা একবার আমার দিকে চেয়ে হেসে বললে---'ছেলেটা কি গো ?—তাড়ালে যায না !'

"কে বললে---'জাতই ঐ রকম। এর পরে একবার 'তু' ক'রলে হাঁটু-ছেঁচে, রক্ত-মাখামাখি হয়ে ছুটে যাবে।...আহা !

"তাসের দান দেওয়ার মধ্যে হাসির হর্‌রা ছুটল। খানিকক্ষণ কাটল।

"নয়নতারার চোখের আর একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে, নীচের দিকে চাইলে চোখের সুপুষ্ট, মসৃণ পাতা দুটি এমন নিরবশেষ ভাবে চোখ দুটিকে ঢেকে ফেলত যে মনে হ'ত যেন সে চোখ বুজে আছে। পরে পদ্যলেখা উপলক্ষে আমি এই জিনিষটিকে কিশলয়ে-ঢাকা কুঁড়ির সঙ্গে তুলনা করেছি। বেশিক্ষণ এই ভাবে চিন্তা করলে মনে হ'ত যেন সে ঘুমোচ্ছে ; কিন্তু তার চোখের গড়নই অপরের চোখে এই দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাত ব'লে কেউ বড়-একটা টুকত না। সেদিন কিন্তু হাতের তাসের দিকে নজর রেখে প্রায় মিনিট দু-তিন ওরকম ভাবে থাকবার পর নয়নতারার মাথাটা হঠাৎ সামনে ঢুলে পড়ল। খনু বল্‌লে—'ওমা, নয়ন, তুই যে সত্যিই ঘুমোচ্ছিস লা ! আমরা ভাবছি...'

"নয়নতারা একেবারে হকচকিয়ে উঠল, প্রথমটা অপ্রতিভ ভাবে বললে—'ধ্যাৎ, কই যাঃ'...সঙ্গে সঙ্গে মুখটা বিরক্তিতে কুণ্ঠিত ক'রে বললে---'না ভাই, সারারাত জাগিয়ে রাখা ভাল লাগে না। কবে যে যাবে—আপদ...'

"এইটুকুই যথেষ্ট ছিল ; আমার মধ্যেকার নাইট্—যে-বীরকে তোমরা কঙ্কাবতীর সন্ধানে পাতালপুরীতে দেখে থাকবে—প্রতিহিংসায ক্ষিপ্ত হযে উঠল। আমি আপদবিদায়ে একেবারে বদ্ধপরিকর হযে উঠলাম।

"সেদিন সন্ধ্যার সময জামার মধ্যে হাত গলাতে গিযে দুটি লুকানো বিছুটি-ডগার সংস্পর্শে যন্ত্রণা আর শ্বশুরবাড়িতে সে-যন্ত্রণা চেপে রাখবার ভদ্রতার মাঝে প'ড়ে অক্ষয় অস্থির হয়ে পায়চারি করলে খানিকটা। তার পরে বোধ হয় ডাক ছেড়ে কাঁদবার সুবিধার জন্যে বেড়াতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে যেই জুতোয পা ঢোকাবে—'উঃ' ক'রে এক রকম চীৎকার ক'রেই পা-টা বের ক'রে নিলে—একমুঠো শেযাল-কাঁটায পা-টা সজারুর মত হয়ে উঠেছে।

"বাড়িতে একটা হৈ-হৈ প'ড়ে গিয়ে সকলে সাবধান হযে পড়ায় আর তখন কিছু নূতন উপদ্রব হ'ল না ; কিন্তু অক্ষয় সন্ধ্যার পর বেরিয়ে যেই বাড়িতে ঢুকবে, অন্ধকারে একটা ঢিল বোঁ ক'রে তার কানের কাছ দিয়ে বেরিযে গেল এবং সে চীৎকার ক'রে রাংচিতার বেড়া টপকাবার আগেই আর একটা সজোরে এসে তার মাথায় লাগল।

"সে-সময হাজার তল্লাস ক'রেও আততায়ী কে ঠাওরাতে পারা গেল না বটে, কিন্তু তোমাদের বোধ হয় বুঝতে বাকি নেই যে সে মহাপুরুষটি কে।

"তোমাদের যদি নিজের নিজের গাযে হাত দিয়ে বলতে বলা হয় ত নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে আজন্ম কলিকাতা-বাসীরা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দুটি জিনিষকে বেশি ভয় করে,—সাপ আর ভূত ; আর তাদের বিশ্বাস ওদিকে লিলুয়া আর এদিকে দমদমের পরে

সমস্ত ভূভাগ এই দুই উপদ্রবে ঠাসা! অক্ষয় যখন নিঃসন্দেহ হ'ল যে এটা বাড়ির কারুর ঠাট্টা নয়, তখন তার আর সন্দেহ রইল না যে সমস্ত ব্যাপারটা একেবারে ভৌতিক। সে রাতটা নিরুপায়ভাবে কোন রকমে কাটালে এবং তার পরদিন দুপুরে—অর্থাৎ রাত্রি হবার এবং তার সঙ্গে সেই উৎকট রকম ঠাট্টাপ্রিয় অশরীরীর আবির্ভাব হওয়ার ঝাড়া পাঁচ-ছয় ঘণ্টা পূর্বে সে বেচারি হাওড়া-মুখো গাড়িতে গিয়ে বসল।

"সেদিন আমি ওদিকে যেতে পারি নি—শেতলাতলায় যাত্রার আসরের জন্যে কাগজের শেকল তৈরি করতে ধ'রে নিয়ে গেল।

"তার পরের দিন কিছু সকালেই আমি বিজয়ী বীরের মত গিয়ে নয়নতারাদের বাড়িতে উপস্থিত হলাম। সে নিশ্চয়ই সমস্ত রাত নিরুপদ্রবে ঘুমিয়ে এতক্ষণ উঠেছে। এইবার গিয়ে তার ত্রাণকর্তা যে কে সেটা জানিয়ে বিস্ময়ে, আহ্লাদে, কৃতজ্ঞতায় তাকে অভিভূত ক'রে ফেলতে হবে।

"গিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার নিজেরই বিস্ময়ের সীমা রইল না। পুকুরঘাটের শেষ রাণাটিতে, মুখ ধোওয়ার জন্যে বাঁ-হাতে খানিকটা ছাই নিয়ে নয়নতারা নিঝুম হয়ে বসে আছে। চুল উস্কখুস্ক, মুখটা খুব শুকনো, চোখ দুটো ফুলো-ফুলো আর রাঙা।

"আমি গিয়ে বসতে একবার ফিরে দেখলে, তার পর চিবুকটা হাঁটুর ওপর রেখে, চোখ নীচু ক'রে ব'সে রইল।

"প্রথমটা মনে হ'ল অক্ষয় সব আক্রোশ নয়নতারার উপর মিটিয়ে গেছে। কি ভাবে যে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ঠিক ক'রে উঠতে পারছিলাম না। চেয়ে আছি, হঠাৎ দেখি তার দু-চোখ বেয়ে ঝরঝর ক'রে জল নামল। আশ্চর্যের ভাবটা চাপতে না পেরে ব'লে উঠলাম—'কাঁদছ যে তুমি!—কাঁদছ কেন?'

"যাঃ, কাঁদছি কোথায়?—ব'লে নয়নতারা আঁচল তুলে চোখ দুটো মুছে ফেললে। একবার, দুবার, তার পর বাঁধ-ভাঙা বন্যার মত এত জোরে অশ্রু নামল যে আর আঁচল সরাতে পারলে না, চোখ দুটো চেপে ধরে ব'সে রইল। একটু পরেই ফোঁপানির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরটা দুলে দুলে উঠতে লাগল।

"খানিকক্ষণ এইভাবে গেলে বেগটা যখন কমে এল, আঁচলের মধ্যে থেকেই কান্নার ভাঙা ভাঙা স্বরে বললে—'অত কাকুতিমিনতি ক'রে, মিথ্যে অসুখের কথা লিখে নিয়ে এলাম শৈল, মার খেয়ে গেল! কে মারলে বল দিকিনি?—কার কি করেছিল সে?—নিরীহ, নির্দোষ মানুষ...'

"আর বলতে পারলে না, ভেঙে পড়ল।

"ঠিক সেই সময়টিতে নয়নতারার কান্নার মধ্যে বিনিয়ে বিনিয়ে কথাগুলো শুনে, এবং কতকটা নিজের অপরাধের জ্ঞানের জন্যেও আমিও কান্নাটা থামাতে পারলাম না বটে, কিন্তু সেই দিনই কোন একটা সময় থেকে, নয়নতারার এই রকম পক্ষপাতিত্বের জন্যে অক্ষয়ের উপর বিদ্বেষ আর হিংসার ভাবটা একেবারে উৎকট হয়ে উঠল। ছেলেবেলার চিন্তাগুলো ঠিক গুছিয়ে মনে আসে না, অন্ততঃ যা মনে আসত তা এতদিনের ব্যবধান থেকে গুছিয়ে বলা যায় না।

"শুধু মনে পড়ছে এই পক্ষপাতিত্বের জন্যে—যেটা নিছক নয়নতারারই দোষ—আমি নয়নতারার উপর না চটে চটলাম অক্ষয়ের উপর। লোকটাকে যে নয়নতারা আসবার জন্যে সত্যিই কাকুতিমিনতি ক'রে লিখেছিল—প্ল্যাটফর্মে আছাড় খাওয়াবার অভিপ্রায়ে যে

ডাকেনি—তাকে যে নয়নতারা নির্দোষ বলে—এই সব হ'ল অক্ষয়ের অমার্জনীয় অপরাধ, আর সবচেয়ে বড় অপরাধ হ'ল তার বিবাহ করাটা, যার জন্যে নয়ন তাকে কাকুতিমিনতি ক'রে ডেকেছে, আর আমি অত কষ্ট ক'রে তার মাথা ফাটালে তাকে নির্দোষ বলেছে, তার জন্যে চোখের জল ফেলেছে।"

শৈলেন চুপ করিল। তারাপদ প্রশ্ন করিল, "তোমার গল্প শেষ হ'ল নাকি ? উপসংহার কোথায় ?"

শৈলেন বলিল, "ভালবাসা ত গল্প নয় যে উপসংহার থাকবে,—বইয়ের দুটি মলাটের মধ্যে তার আদি-অন্ত মুড়ে রাখা যাবে। তবুও যদি ভালবাসাকে গল্প-উপন্যাসের সঙ্গেই তুলনা কর ত বলা যায় তার উপসংহার নেই, অধ্যায় আছে ; সে কোন এক অনির্দিষ্ট সময়ে একবার আরম্ভ হয়, তার পর অধ্যায়ের পর অধ্যায় সৃষ্টি করে তার অফুরন্ত গতি।..."

"সে সময়ের অধ্যায়টিই না-হয় শেষ কর।"

"সেটার শেষ ছিল একটা সামান্য চিঠি। একদিন নয়নতারা আমায় অক্ষয়ের নামে একটা চিঠি ডাকে ফেলে আসতে দিয়ে হঠাৎ থমকে মুখের দিকে চেয়ে বললে—'হ্যাঁ রে, তুই চিঠি খুলে পড়িস্ নে তো ? খবরদার, আর এই ৭৪ ॥ দেওয়া রইল, পড়লে বুকে ব্যথা হবে।'

"আমার যে বুকে একটা কত বড় ব্যথা ছিল নয়নতারা সে খবর রাখত না।

"এর আগে কখনও কারুর চিঠি খুলি নি, কিন্তু সেদিন আমি পোস্টাপিসের রাস্তাটা একটু ঘুরে বাড়ি এলাম এবং একটা নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে চিঠিটা খুললাম।

"৭৪ ॥-এর দিব্যিটা আমার হাতে হাতে ফলল। সে যে কি বিনিয়ে-বিনিয়ে লেখা চিঠি—কত ব্যাকুলতা, কত আদর, কত আশ্বাস, ফিরে আসবার জন্যে কত মাথার দিব্যি !—এবার নয়নতারা তাকে বুকে করে রাখবে, যে শত্রুতা করেছে তার সমস্ত অত্যাচার নিজের সর্বাঙ্গে মেখে নেবে ; অক্ষয় ফিরে আসুক,—নয়নতারার চোখে ঘুম নেই—কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়েছে—এসে একবার দেখুক অক্ষয়, একবার দেখুক এসে তার অত আদরের নয়ন কি হয়ে গেছে...

"এত চায় সে অক্ষয়কে ?—ক্ষোভে, ঈর্ষায়, অসহায়তায় আমার বুকের মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা ঠেলে উঠতে লাগল। সেদিন ঢিল কুড়োবার সময় কি ক'রে একটা পুরনো ভাঙা শাবল হাতে উঠেছিল। কি ভেবে সেইটেরই সদ্ব্যবহার করি নি। সেই আপসোসে ছটফট্ করতে লাগলাম।

"বোধ হয় সেদিনকার ঢিল ছোঁড়বার কথা মনে হওয়ার জন্যেই মনে পড়ে গেল যে অক্ষয় সমস্ত কাণ্ডটা ভৌতিক মনে ক'রেই তাড়াতাড়ি পালিয়েছিল। আমার মাথায় একটা সুবুদ্ধি এসে জুটল।

"আমি আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে কালি-কলম নিয়ে এলাম এবং আমার লেখার খাতা থেকে খানিকটা কাগজ ছিঁড়ে খুব জোরে ঢিল ছুঁড়তে পারে এই রকম জবরদস্ত ভূতের হাতের উপযোগী মোটা মোটা অক্ষরে, চন্দ্রবিন্দুসংযুক্ত ভূতোচিত শুদ্ধ ভাষায় লিখলাম—খঁবরদার এঁবার এঁলে এঁকেবারে ঘাঁড় মঁটকে তোঁর রঁক্ত খাঁব—এবং আমি যে ভূত এটা প্রমাণ দিয়ে ভাল ক'রে বিশ্বাস করাবার জন্যে জুড়ে দিলাম—আঁমি খাঁমের মঁধ্যে ঢুঁকে সঁব পড়েছি। আমার সঙ্গে চাঁলাকি ?

"তোমরা হাসছ ? কিন্তু এর পরেই আমার অবস্থা অতিশয় করুণ হয়ে উঠল, কেননা এ ভূতের নামধাম পরিচয় বের করতে খুব বেশি রকম বিচক্ষণ রোজার দরকার হ'ল না। তার ভূতপূর্ব কীর্তিও সব ধরা পড়ে গেল—ভূতপূর্বই বল কিংবা অভূতপূর্বই বল।...বৃষ্টিটা কি থেমে আসছে ?"

শৈলেন আবার খানিকটা চুপ করিল। তার পর বলিল, "কয়েক দিন পরে এসে বাবা আমায় বিদেশে তাঁর কর্মস্থানে নিয়ে গেলেন। তার পর আর নয়নতারার সঙ্গে দেখা নেই।"

তারাপদ বলিল, "কিন্তু কি যেন অফুরন্ত অধ্যায়ের কথা বলেছিলে ?"

শৈলেন বাহিরের ম্রিয়মাণ বর্ষার বিলম্বিত মৃদঙ্গ কান পাতিয়া শুনিতেছিল, আত্মসমাহিত ভাবে বলিল, "হ্যাঁ, তবে একটু ভুল হয়েছিল,—অধ্যায় নয়, সর্গ,—জীবনের পাতা একটির পর একটি পূর্ণ ক'রে ভালবাসার করুণ গাথা সর্গের পর সর্গ সৃষ্টি ক'রে চলেছে...

রাধানাথ বলিল—"তুমি কবি, হিসাবের গদ্যকে নিশ্চয় এড়িয়ে চল ; তাই মনে করিয়ে দিচ্ছি তোমার আট বৎসরের সময় নয়নতারার বয়স যদি পনর বৎসর ছিল তো তোমার এখন পঁয়ত্রিশ বৎসরে সে বিয়াল্লিশ বৎসর অতিক্রম ক'রে।

শৈলেন উঠিয়া বসিল, বলিল, "ভুল বলছ তুমি,—নয়নতারার বয়স হয় না। আমার প্রেম তার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকে অমরত্ব দিয়েছে। তার পরের নয়নতারা—সে তো আমার জীবনে নেই। আমার নয়নতারা—এখনও সেই পুকুরঘাটটিতে সখীপরিবৃতা হয়ে বসে ; রূপে, রসে, পূর্ণতায় উজ্জ্বল। তার কত দিনের কত কথা, ভঙ্গী, তার আশ্চর্য চোখের পরমাশ্চর্য চাউনির খণ্ড খণ্ড স্মৃতি আমার জীবনে এক-একটি অখণ্ড কাব্যের মধ্যে রূপ ধ'রে উঠেছে। যখন আমি থাকি প্রফুল্ল—ত্রিশ বৎসরের দীর্ঘ ব্যবধানের ওপারে দেখি নয়নতারা হাসিতে, কপট গাম্ভীর্যে কিংবা অকপট কৌতুকপ্রিয়তায় ঝলমল করছে ; তার চিক্কণ চুলের নীচে, ঘোরাল গালের প্রান্তে পারসী মাকড়িটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে ;—আমি যখন থাকি মৌন, বিমর্ষ, তখন বিকেলে নয়নতারার আকাশ ঘিরে বর্ষা নেমে—রেলের ধারের ঘরটিতে মেঘের উপর চোখ তুলে নয়নতারা নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকে, মেঘবিলুপ্ত সান্ধ্য সূর্যের মত কানের পারসী মাকড়ি কেশের মধ্যে ঢাকা, আমার দিকে ফেরানো গালটিতে অশ্রুবিন্দু টলমল করছে...

"আমি জীবনে আর কাউকেই চাই নি, আমার জীবনের চিত্রপটে নয়নতারাকে অবলুপ্ত ক'রে আর কারুর ছবিই ফুটতে পারে নি। পনের বৎসরের অটুট যৌবনশ্রীতে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তারই ওপর নিবদ্ধ-দৃষ্টি আমি তাকে অতিক্রম ক'রে আমার পঁয়ত্রিশ বৎসরে এসে পড়েছি—সূর্য যেমন যৌবনশ্যামলা পৃথিবীকে অতিক্রম ক'রে অপরাহ্ণে হেলে পড়ে। আজকের এই বর্ষায় কি তোমরা কথাটা অবিশ্বাস করতে পারবে ?"

তারপর বলিল, "আমরা স্বয়ং তোমার বিশ্বাসের জন্যে ভাবিত হয়ে উঠছি—কেননা বর্ষাটা গেছে থেমে।"

উপবাসী

১

রূপচাঁদ রাস্তার ধারে একটা শুকনো গুঁড়ির উপর পা দুইটা গুটাইয়া বসিয়া চিন্তিতভাবে একটা চোরকাঁটার শীষ দাঁতে খুঁটিতেছিল। আজ সকাল হইতেই তাহার মনটা বড় অপ্রসন্ন। তাহার কারণ বোসেদের মেয়ে নেড়ীর আজ বিবাহ। পাকাদেখার দিন হইতেই সে সমস্ত ভণ্ডুল করিবার মতলব আঁটিতেছে কিন্তু কিছুই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। কাল গায়ে-হলুদটা হইয়াই গেল। আজ রাত্রে বিবাহ, একটু পরেই এই সাড়ে দশটার গাড়িতে বর আসিবে ; এই পথ দিয়া বাজনাবাদ্য করিয়া যাইবে। নিতান্ত অপ্রীতিকর বস্তুর যে একটা নিগূঢ় মোহ থাকে তাহারই টানে রূপচাঁদ পথের উপরটিতে আসিয়া বসিয়া আছে।

কাজীপাড়ার রহমৎ আসিয়া পাশটিতে বসিল। চুপ করিয়া খানিকটা পা দুলাইল, তাহার পর প্রশ্ন করিল—"কিছু উপায় ঠাওরাতে পারলি রে রূপো ?"

রূপচাঁদ ঠোঁট আর নাক একত্র করিয়া মাথা নাড়িল ;—না পারে নাই। রহমৎও—বোধ হয় সহানুভূতির নিদর্শনস্বরূপ—একটা চোরকাঁটার শীষ তুলিয়া লইয়া দাঁতে খুঁটিতে লাগিল। খানিকক্ষণ নীরবেই গেল, তাহার পর ফোঁস কবিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"আচ্ছা তোদের দুজনেব মধ্যে কি খুব বেশি ভালবাসা হয়েছিল ?"

রূপচাঁদ এবারেও কথা কহিল না, মাথা নাড়িয়া জানাইল—হ্যাঁ।

রহমৎ কথাটাতে একটু টান দিয়া গভীর দুশ্চিন্তার সহিত বলিল, "তবেই ত !" আবার শীষ চিবাইতে লাগিল।

একটু পরে গুঁড়িটার উপর গুটাইয়া-সুটাইয়া বসিয়া প্রশ্ন করিল—"আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করব বলতে আপত্তি আছে ? মানে, বিয়ের কথা হবার ··· তোকে কিছু বলেছিল কি ?—যেমন ধর, বিষ খেয়ে মরব, কি গলায় দড়ি দোব ?...তা যদি ব'লে থাকে ত..."

রূপচাঁদ বলিল—"কিছুই বলেনি।"

রহমৎ কপালে চোখ তুলিয়া বলিল—"কিছুই বলে নি ! তবে ত আরও ভাবনার কথা। তোর ঘাড়ে শেষ পর্যন্ত একটা স্ত্রীহত্যার পাপ না চাপে !..."

রূপচাঁদ চোরকাঁটার শীষটা সরাইয়া লইয়া খানিকটা উদ্বেগের সহিতই প্রশ্ন করিল—"কেন ?"

রহমৎ এখানে ছোকরা-মহলে প্রেম সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ। বয়সের অনুপাতে বাংলা নভেলে তাহার জ্ঞান খুব সুগভীর, তাহা ভিন্ন বাড়িতে ফারসী ভাষায় একটু-আধটু চর্চা থাকায় বুলবুল, বাগিচা থেকে আরম্ভ করিয়া লায়লা-মজনু প্রভৃতি পশ্চিম-সীমান্তের ওদিককার ব্যাপারের সঙ্গে তাহার এক রকম সাক্ষাৎ-পরিচয় আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। বলিল—"যদি সত্যিকার ভালবাসা হয়—মানে, সে যদি সত্যিই লায়লা হয় আর তুই যদি সত্যিই মজনু হোস্ ত যে-মুহূর্তে তোদের প্রথম চোখোচোখি হয়েছিল সেই মুহূর্তেই চোখের রাস্তা দিয়ে তোর দিল্ ওর দিলের কাছে গিয়ে তার এন্‌জেল হয়েছিল—যাকে

পার্সীতে বলে ফিরস্তা। তা হ'লে হ'ল না ?—তোকে না পেয়ে ও যদি সত্যি একটা কিছু ক'রে বসে ত তোর গুনাহ্ অর্থাৎ পাপ লাগল না ?"

রূপচাঁদ বলিল—"বয়ে গেল।"

রহমৎ এত বড় একটা তত্ত্বকথার পর নায়কের মুখে এরূপ গ্রাম্যতাদুষ্ট মন্তব্য শুনিয়া নিশ্চয় খুবই ক্ষুণ্ণ হইল। বিরক্তির সহিত বলিল—"তাহলে তোর ইশ্‌ক্ খাঁটি নয়, শুধু ভড়ং করছিস, যাঃ।"

রূপচাঁদ প্রশ্ন করিল—"ইশ্‌ক্ কি ?"

রহমৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া ঘাড়টা তাহার দিকে ঝুঁকাইয়া অনেকটা ব্যঙ্গের স্বরে বলিল- "ইশ্‌ক্ হচ্ছে—প্রেম, প্রণয়, ভালবাসা—আশীকের জন্যে নিজেকে মিটিযে দেওয়া,—যা ছিল লায়লা আর মজনুর মধ্যে—যা ছিল জাহাঙ্গীর আব নূরজাহানের মধ্যে—যার মাঝখানে দাঁড়াতে গিয়ে শের আফগানের প্রাণ গেল,—যা ছিল আয়েষা আর জগৎসিংহের মধ্যে—যার হাহাকার দেখতে পাবি শরৎবাবুর দেবদাসে...তুই ঘাস চিবো ব'সে ব'সে।..."

হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। খানিকটা অগ্রসর হইতে রূপচাঁদ ডাক দিল— "রহমৎ, শোন্।"

অনেকটা অনিচ্ছার সহিত রহমৎ ফিরিয়া আসিল। তখনও রাগটা লাগিযা আছে, বলিল—"তোর এসবে হাত দেওয়া ঠিক হয নি। হুটোহুটি মাবামারি ক'বে বেড়াস, ঐ নিয়েই থাকা উচিত ছিল। কেন ডাকছিলি ?"

"একটা গাধা যোগাড় করতে পারিস ?"

রহমৎ একদৃষ্টে রূপচাঁদের মুখের দিকে চাহিযা রহিল। বোধ হয ভিতরে ভিতবে আশা করিয়াছিল হতাশ প্রেমের ধাক্কায বেচাবি পাগল হইযা গিয়াছে ; কিন্তু তাহাব আব কোন নিদর্শন না পাইযা সহজ বিস্ময়ের স্বরে প্রশ্ন করিল- "কেন, গাধা কি হবে ? হঠাৎ গাধা ?"

"বর শুনছি রমজানেব গাড়ি ক'রে আসবে। কাল নূতন ক'রে রঙ করছিল, জিজ্ঞেস করলাম ত বললে..."

"গাড়িতে ঘোড়ার বদলে গাধা জুড়ে দিবি নাকি ?"

"গাধা জুড়ে দেওযা নয়।...রমজানের সাদা ঘোড়াটার একটা মস্ত দোষ আছে জানিস ত ?—গাধার ডাকে ভয়ানক ভড়কে যায়..."

রহমৎ আরও বিস্ময়ের সহিত বলিল—"যাক্, তাতে কি ?"

"বরটাকে যদি ঘায়েল করা যেত,—বরের বাপকেও, পুরুতকেও—সবগুলোই নিশ্চয এক গাড়িতেই থাকবে।"

রহমৎ আরও দুই পা আগাইয়া আসিযা অপলক দৃষ্টিতে রূপচাঁদের দিকে একটু চাহিযা রহিল, তাহার পর আসিয়া আবার গুঁড়িটার উপর বসিল। মনে হইল যেন একটু খুশি হইয়াছে,—বোধ হয এই জন্য যে, হতাশ প্রেমিক নিতান্তই চুপচাপ বসিয়া নাই, কিছু একটা করিতেছে। উন্মাদ হইয়া যাওয়া কিংবা আত্মহত্যা করা অবশ্য বেশি শাস্ত্রসঙ্গত হইত, অভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী-বিনাশও নিতান্ত নিন্দার নয়। জিনিসটাতে উন্মাদ লক্ষণও বর্তমান। বলিল— "কাজটা ভাল হয় না, যদিও জাহাঙ্গীরের নজির আছে...কিন্তু গাধা পাবি কোথায় ?"

"তাই ত ভাবছি।...আমিও অবশ্য গাধা ডাকতে পারি..."

"দ্যুৎ, সে কি হয় ? টের পেয়ে গেলে শেষকালে গাধা হোস আর নাই হোস ধোবার

মত বাড়ি হাঁকড়াবে। তার চেয়ে এ বাবা, ইংরেজের রাজত্ব,—গাধা নিজের খুশিতে, নিজের মনে ডেকেছে আমরা কি করব ?"

বূপচাঁদ হাঁটুতে চিবুকটা চাপিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল—"ঠিক তো ,—বনে চরতে চরতে রঙচঙে গাড়ি সাজগোজ-করা লোক দেখে ওর মনে যদি ভাব এসে থাকে...আমরা কি ওকে উস্‌কে দিতে গিয়েছিলাম ?...তোমরা অত জুলুস ক'রে না এলেই পারতে।...কিন্তু পাওয়া যায় কোথায় ? সমিস্যে তো সেই ; আর গাড়ির সময়ও হয়ে আসছে..."

রহমৎ হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—"আচ্ছা তুই ব'স্, আমি দেখছি একবার। আর দেখ্—যদি আমাব দেরিই হয আব বর এর মধ্যে এসেই পড়ে ত তুই এই গুঁড়ির আড়ালে ব'সে দিস না-হয ডেকে খোদার নাম নিয়ে।...বাঃ, আমাব মর্জি হয়েছে আমি ডেকেছি গাধাব ডাক মশায, তাতে আপনাদেব ঘোড়া যে ঘাবড়ে বসবে কে জানে !...ব'সে থাক্, দেখি একবাব চেষ্টা।"

২

খানিকক্ষণ গেল। গুঁড়িব উপব থেকে স্টেশনের ওদিকে ডিস্ট্যান্ট সিগ্‌নালটা দেখা যায ; বূপচাঁদ সেই দিকে চাহিয়া ছিল, দেখল সিগ্‌নালটা মাথা হেঁট করিল। গাড়ি আসিতেছে। সে দাঁড়াইযা উঠিয়া, বহমৎ যেদিকটায গিযাছে—তীব্র উৎকণ্ঠায সেদিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া বহিল। না, বহমতেব কোন চিহ্ন নাই। তাহা হইলে বোধ হয তাহাব নিজের গলাই শেষ পর্যন্ত ভরসা।

ছোট স্টেশন, রাস্তায বিশেষ লোক চলাচল নাই। ববযাত্রীদেব যাহারা অভ্যাগমন কবিবে তাহারা অনেকক্ষণ স্টেশনে চলিযা গিযাছে। রতন মণ্ডল তাহার ছোট মেযেটিকে লইয়া স্টেশন অভিমুখে যাইতেছিল—মেয়ের মামাব বাড়ি যাইবে ; জিজ্ঞাসা করিল—"ঘোযজা এখানে ব'সে যে ?"

কিন্তু বেশি কৌতূহল দেখাইল না ; কেননা বূপচাঁদকে ডোবাব ধারে, কি জঙ্গলেব মধ্যে, কি গাছের মগডালে, কি গুঁড়ির উপর দেখা এমন কিছু অসাধারণ ব্যাপার নয়।

বতন চলিযা গেলে বূপচাঁদ আর একবার রহমতেব পথের দিকে চাহিল, তাহার পর গলাটা পরিষ্কাব করিযা লইয়া খুব নিম্নকণ্ঠে—'হাঁক্কা—' করিযা একটা টানা আওযাজ করিল। বাসভধ্বনিব রিহার্সেল। দ্বিতীয় বাব আব একটু জোরে। না, বেশ চলিবে। গলাখাঁকারি দিয়া আরও একটু জোরে আরম্ভ কবিতে যাইবে, দেখিল রাযেদের পোড়ো বাড়ির পাশ দিয়া যে সবু রাস্তাটা চলিযা গিযাছে, সেই রাস্তা দিযা, গাধার উপর, পাকা ঘোড়সওয়ারের ভঙ্গিতে পা ছড়াইযা বাসু ধোবাব ছেলে সাতকড়ে গট্ গট্ কবিযা চলিযা আসিতেছে। সামনে আসিয়া তড়াক্ করিযা নীচে লাফাইযা পড়িল, তাহাব পর গাধাটাব পিঠে দুইটা সাবাসির চাপড় কষিয়া বূপচাঁদকে বলিল—"বহমৎ ডেকে নিযে এল। সে আসছে। তোমবা চড়বে নাকি দাঁড়াউব ? চড় না, ঘোড়া ছেড়ে চড়বে লোকে আমার মাতনের ওপর,—ওব নাম মাতুধন রেখেছি...পড়ার ভয় নেই, মাটিতে দুটো পা ঠেকিয়ে দাও, নীচে দিযে গ'লে বেরিয়ে যাবে : মাযেব যেমনকার ছেলে ঠিক তেমনটি রইলে, আঁচড় পর্যন্ত লাগল না।"

বূপচাঁদ প্রশ্ন করিল "ডাকে কেমন ?"

সাতকড়ে খুব সম্ভবতঃ স্নেহের আধিক্যেই বলিল—"খুব মিষ্টি ডাক।"

রহমৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। একটু বিজয়ের ভঙ্গিতে রূপচাঁদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"কি রে, হ'ল যোগাড়, না হ'ল না? বাবা, এ যার নাম রহমৎ শেখ!...কাজটা কিন্তু অন্যায় হচ্ছে, ব'লে দিলাম, আমি এর মধ্যে নেই। নাও, সাতকড়েকে বল এখন তোমার কি দরকার গাধায়।"—বলিয়া হাত পা গুটাইয়া নির্লিপ্ত ভাবে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

রূপচাঁদ বলিল—"সেই কথাই তো বলছিলাম, ও বলছে খুব মিষ্টি ডাক ওর গাধার মিষ্টি ডাকে কি হবে?"

রহমৎ মুখ না ফিরাইয়াই বলিল—"রেখে দে, গাধার আবার মিষ্টি ডাক! আমাদের মোরগটা তাহলে মিঞা তানসেন। ...এখন ঠিক তালের মাথায় ডাকবে কি না ডাকবে সেই কথা দেখ।...কাজটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না, ব'লে রাখছি; না-হক্ ক'জন বে-কসুর লোককে..."

রূপচাঁদ সাতকড়ের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি বলিস রে, ডাকবে ফরমাস মতন?...ব্যাপারটা তোকে বুঝিয়ে দিই; মানে হচ্ছে..."

সাতকড়ে কোমরে একটা হাত দিয়া সিধা হইয়া বলিল—"মাতন আমার ডাকে নিজের খেয়ালের উপর। কারুর তো রেয়ৎ নয়?—দাসখৎ ও লিখে দেয় নি,—বল না কেন রহমৎ ভাই!"

এমন সময় গাধাটা হঠাৎ তরতর করিয়া কয়েক পা আগাইয়া গেল এবং ঘাড় পিঠ আর লেজ সোজা করিয়া বিকট রব করিয়া চীৎকার জুড়িয়া দিল এবং নিজস্ব ভঙ্গিতে আওয়াজটাকে ধাপে ধাপে নামাইয়া থামিয়া গেল। সাতকড়ে দৃপ্তভাবে তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল—"ঐ লেন্, একখানি লমুনা ঝেড়ে দিলে। ভাবছেন বুঝি আমাদের কথা কিছু বুঝছে না ও? আর কিন্তু ঘণ্টা-দুত্তিন এখন ঠাণ্ডা। সারা দিনে পাঁচ-ছটি বার আওয়াজ দেয়, ব্যাস্।"

রহমৎ ফিরিয়া বসিয়াছিল। স্টেশনের ওদিকে চাহিয়া বলিল—"তোর গাড়ি ওদিকে এসে গেল কিন্তু রূপো; ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে।"

রূপচাঁদ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। দাঁড়াইয়া পড়িয়া চারিদিকে চাহিয়া বলিল—"তাই তো। কোন উপায় নেই রে সাতকড়ে? তুই ওকে বলেছিস, রহমৎ, কেন ডাকাতে হবে?...বলিস নি?...মানে হচ্ছে, একটা বরযাত্রী আমাদের গ্রামে আসছে, সাতকড়ে; তাদের একটু ঠাট্টা করা দরকার তো, নইলে ভাববে এদের দেশে ঠাট্টা করবার লোকই নেই; তাই ওরা যেই এখান্ দিয়ে যাবে আমরা শাঁক বাজিয়ে দোব...বিয়েবাড়ির হাজারটা শাঁকেও এমন বাজখেঁয়ে আওয়াজ হবে না বাবা, হুঁ!"

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, সাতকড়েও হাসিয়া হাততালি দিয়া উঠিল, বলিল—"খাসা মতলব, দা'ঠাউর, খাসা মতলব এঁটেছ বটে!"

রূপচাঁদ বলিল—"কিন্তু তুই বলছিস যে আর ঘণ্টা দু-এক ডাকবে না ও।"

সাতকড়ে বলিল—"দু-রকম ডাক আছে দা'ঠাউর। এ যা লমুনোটা দিলে এটা হচ্ছে আহ্লাদের ডাক—মনটা খুব খুশি রইল, ডেকে দিলে একবার। আমরা যেমন হাসলাম না এইমাত্তোর, সেই রকম আর কি। আর এক রকম ডাক আছে মাতনের, সে কিন্তু এ-রকম মিষ্টি লাগবে না, তা ব'লে দিচ্ছি। সে ওর কান্নার ডাক।"

রহমৎ ঘুরিয়া প্রশ্ন করিল—"ঠেঙিয়ে ডাকানো নাকি?"

সাতকড়ে আগাইয়া গিয়া গাধার ঝুঁটি ধরিয়া তাহার পিঠে হেলান দিয়া রহমতের সহিত মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইল ; বলিল—"তোমাদের মত ইস্কুলের পোড়ো নয় যে একটা বেতের ঘায়ে 'ভ্যাঁ' ক'রে উঠবে, আস্ত একখানি বাঁশ পিঠে ভাঙলেও মাতুধন টুঁ শব্দ করবে নি। ওকে কাঁদাবার অন্য হদিস্ আছে। কিন্তু ঐ যে কইনু, শাঁক যা বাজবে তাতে কানে তালা লাগিয়ে থোবে।"

দুজনেই আগ্রহের সহিত বলিল—"কি, কি হদিস্, বল না শীগ্‌গির, ওদিকে গাড়ি যে প্রায় স্টেশনে এসে পড়ল।"

সাতকড়ে বড় রাস্তার এ-মোড় ও-মোড় একবার দেখিয়া লইল, তাহার পর—'দাঁড়াও, দেখছি একবার' বলিয়া যে-পথে আসিয়াছিল সেই পথে বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। রূপচাঁদ হাঁকিয়া বলিল—"দেরি করিস নে সাতকড়ে, গাড়ি ওদিকে এসে গেল!"

একটুখানির মধ্যেই সাতকড়ে আবার ঘুরিয়া আসিল। একটু নিরাশভাবে বলিল—"না, পাওয়া গেল না।"

রহমৎ জিজ্ঞাসা করিল—"কি খুঁজছিলি তুই?"

সাতকড়ে বলিল—"কুকুরের গায়ের মাছি। গাধাকে ডাকাতে একেবারে ধন্বন্তরি, তবে আর বলছি কি! দুটি মাছি একটু ধুলোর মধ্যে ক'রে ছেড়ে দাও গায়ে, তার পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শহর ধরে শোন না কত ডাক শুনবে। তা দিন বুঝে একটাও পাওয়া গেল না কুকুর—দরকার কিনা...সব .বটা ভাবলে উপ্‌গার হবে।"

স্টেশনটা গোটাকতক গাছের আড়ালে পড়ে, দেখা যায় না, তবু হাঁকডাক, ব্যস্ততার আওয়াজ কানে আসিল। রহমৎ আবার নির্লিপ্ত ভাবে ঘুরিয়া বসিয়াছিল, সেই ভাবেই বলিল—"মাছির কামড়ে যদি ডাকে তো বিছুটি ছোঁয়ালে ডাকবে না কেন? আমি কিন্তু এর মধ্যে নেই বাবা ; তোমাদের যা মনে হয় কর। একটা কথা বললি, তার উত্তর দিতে হ'ল ; ব্যস।"

সাতকড়ে বিস্ময় এবং প্রশংসায় চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া এমন ভাবে চাহিল যেন সে রহমতের মধ্যে স্বয়ং মক্কার পীরকে প্রত্যক্ষ করিতেছে।

বরযাত্রীর দল স্টেশনের প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া রাস্তায় নামিয়াছে। ২৫ জন-ত্রিশেক লোক। গ্রামে তিনখানি গাড়ি। যত দূর সঙ্কুলান হইয়াছে তাহাতে বরপক্ষীয়দের বসানো হইয়াছে। বাকি আর সকলেই পায়ে হাঁটিয়া আসিতেছে। রূপচাঁদের খবর ঠিকই ছিল, বর, নিতবর, বরের বাপ, এবং পুরুত রমজানের গাড়িতে চড়িয়াছে। সেটা সর্বাগ্রে রাখা হইয়াছে।

সমস্ত দলটা ধীরে ধীরে চলিয়াছে। বুড়া রমজান কিন্তু তাহার পেটমোটা ঘোড়া দুইটার রাস এমন কায়দা করিয়া কষিয়া ধরিয়া আছে, মনে হইতেছে যেন অন্যমনস্ক হইয়া রাস একটু ঢিলা করিলেই তাহারা একেবারে তীরবেগে ছুটিতে আরম্ভ করিয়া দিবে।

দলটা সামনে আসিতেই রূপচাঁদ গুঁড়ি হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"সেলাম রমজান চাচা।"

তীব্র উৎকণ্ঠায় মুখটা একটু শুকাইয়া গিয়াছে।

রহমতেরও মনে একটা শঙ্কা এবং উদ্বেগ লাগিয়া ছিল। অনেকটা, পূর্বাহ্ণেই ভাব জমাইয়া রাখিবার জন্য বলিল—"সেলাম আলেকুম।"

রমজান কোন উত্তর দিল না, শুধু গাধাটার পানে একবার আড়চোখে চাহিয়া রাসটা আরও সতর্ক হইয়া ধরিল।

সাদা ঘোড়াটাও একবার ঘাড়টা ঘুরাইয়া দেখিয়া অস্বস্তির সহিত কান দুইটা সঞ্চালিত করিতে লাগিল। রূপচাঁদ আর রহমৎ দুজনেই সঙ্গ লইল। রূপচাঁদ একবার গাড়ির ভিতরটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। তাহার পর রমজানের সঙ্গে গল্প জমাইবার জন্য প্রশ্ন করিল "রঙ ধরাতে কত খরচ পড়ল রমজান-চাচা ?"

কোন উত্তর হইল না। রহমতের বুকটা ধড়াস ধড়াস করিতেছিল, চকিতে ঘুরিয়া একবার গুঁড়িটা যেখানে আছে সেইখানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তাহার পর নির্লিপ্ত ভাবে বলিল—"আচ্ছা রঙ ধরাতে যাই খরচ পড়ুক, তুমি একটু সরে থেকো তো যদি জানের ডর থাকে ; রমজানী খালার ঘোড়া একটি যদি লাথি ঝাড়ে তো উঠে আর তোমায় জল খেতে হবে না।...এ তোমার বাংলা দেশের পিলেরোগা ঘোড়া নয় যে মনে করেছ..."

এমন সময় "হাক্কা—" করিয়া একটা অতি উগ্র আওয়াজ পিছনে শোনা গেল এবং পরমুহূর্তেই দেখা গেল আকাশপাতাল হাঁ করিয়া, লেজ সিধা করিয়া চীৎকার করিতে করিতে একটা গাধা বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। পিছনের লোকেরা ত্রস্তভাবে রাস্তা ছাড়িয়া দিতেছে। নানা রকম সন্ত্রস্ত রব উঠিয়াছে—সাবধান ! গাধারা কামড়ায়ও আবার—দেখো যেন ছুঁয়ে ফেলো না, কি বিপদ !...ও মাড়িয়ে চলেছে মশাই, আর আপনি ছোঁবার ভয় করছেন !

রমজানের গাড়ির সাদা ঘোড়াটা দাঁড়াইয়া পড়িল। রাসটাতে একটা তীব্র ঝাঁকানি দিয়া পিছনে ঘুরিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল, তাহার পর রমজান নামিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিবার পূর্বেই পাশের ঘোড়াটাকে এক রকম টানিতে টানিতেই সামনে গলা বাড়াইয়া মত্ত গতিতে ছুট দিল। একটা "সামাল সামাল" রব পড়িয়া গেল। গাড়িটা খানিকটা সিধাই ছুটিল, তাহার পর সাদা ঘোড়াটা রাস ছিঁড়িয়া পলায়ন করায়, একটা ঘোড়ার টানে খানিকটা একপেশে হইয়া ছুটিতে ছুটিতে রাস্তার ধারে একটা সেগুন গাছের গুঁড়িতে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগিয়া হেলিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

৩

এর পরের দৃশ্য রূপচাঁদদের বাড়ির চিলেকোঠার অভ্যন্তর। সন্ধ্যার প্রাক্কাল। রূপচাঁদ ধূলিশয্যায় শয়ান ; কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত হইয়া বোধ হয় এইমাত্র নিদ্রা গিয়াছে। চোখের কোলে, গালে শুষ্ক অশ্রুর কলঙ্করেখা। নেড়ীর সঙ্গে আসন্ন বিরহের অশ্রু নয় ; অবশ্য পরোক্ষ হেতু এইটাই বটে। আসলে রূপচাঁদের পিঠে আজ একটি আস্ত কঞ্চি ভাঙিয়াছে।

মাতুধন-ঘটিত ব্যাপারটা প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হইল না। ডাকের মূলে বিছুটি, বিছুটি থেকে সাতকড়ে, সাতকড়ে থেকে রহমৎ, তাহার পর রহমৎ থেকে রূপচাঁদে বেশ সহজেই পৌঁছানো গেল। রূপচাঁদের পিতা দুর্ভাগ্যক্রমে দলের মধ্যেই ছিলেন। কান ধরিয়া বাড়ি লইয়া গেলেন, তাহার পর চোরের মত মার দিয়া চিলেকোঠায় পুরিয়া বাহির হইতে তালা আঁটিয়া দিয়া বলিলেন—"সমস্ত দিন সমস্ত রাত আজ শুকো, রাস্কেল কোথাকার...নেমন্তন্ন বাড়ি যাওয়া একেবারে বন্ধ।..."

বিয়ে-বাড়ি।

দুইটা বাড়ি বাদে রায়েদের বৈঠকখানায় বরযাত্রীদের তোলা হইয়াছে। কতকগুলো ছোকরা আসিয়া অবধিই গণ্ডগোল বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের গাড়ি করিয়া আনা

হয় নাই, তাহাদের অপমান হইয়াছে। যাহারা গাড়িতে আসিয়াছিল তাহাদের অনেককেও তাহারা দলে টানিয়াছে বলিয়াছে গাড়ি চড়াইয়া জখম করিবার মতলব ছিল এদের, ওদের গুরুবল ছিল তাই তাহারা চড়ে নাই। অবশ্য বরের গাড়িতে কাহারও বিশেষ আঘাত লাগে নাই, অন্যান্য গাড়িগুলা একেবারে নিরাপদ ছিল, কিন্তু কি সর্বনাশটাই না হইতে পারিত, সেই দুশ্চিন্তায় সকলেই স্তম্ভিত হইয়া আছে। সর্বনাশের চেয়ে তার কল্পনাটাই আরও ভয়ঙ্কর, কারণ সে কল্পনায় তো কোন সীমা বাঁধা থাকে না। তাই কিছু না-হওয়ার চেয়ে বড় বিপদ আর কিছুই হইতে পারে না। স্নানে, আহারে, চায়ে, পানে যত রকম ভাবে পারিল ইহারা কন্যাপক্ষীয়দের সমস্ত দিন বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজের দিকের পুরুতকেও ইহারা দলে টানিল।

পুরুতঠাকুরের চা আসিলে একজন কাছে গিয়া দাঁড়াইল এবং চায়ে চুমুক দিয়া পুরুতঠাকুর মুখটা কুঞ্চিত করিয়া উঠিতেই নিরীহের মত প্রশ্ন করিল—"খুব মিষ্টি দিয়েছে বুঝি? তা বেচারিরা তো জানে যে আপনি কম মিষ্টি খান..."

পুরুতঠাকুর ঠোঁটে জিবটা অস্বস্তির সহিত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"মিষ্টি কোথায় হে, এ যে নুন!"

"—নুন—!! না পুরুতমশায়, আপনি নিশ্চয় ভুল করেছেন; অবশ্য যা ছোটলোক এরা...কিন্তু আপনি বরপক্ষের পুরুত, আজকের কাজে আপনি দেবতার তুল্য, তায় সমস্ত দিন উপোস ক'রে আছেন, আপনার সঙ্গেও কি এ-রকম ঠাট্টা-প্রবঞ্চনা করতে সাহস করবে? বোধ হয় ভুল করেছেন,—দেখুন তো আর একটা চুমুক..."

পুরুতঠাকুর একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন, চায়ের বাটিটা আছড়াইয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"আমি পুরোহিত, তিন কুড়ি বয়স হ'তে চলল, আমার সঙ্গে তঞ্চকতা! আমি যদি আজ এ-বিবাহে পৌরোহিত্য করি তো..."

সকলে আসিয়া পড়িল—কি ব্যাপার!...একটি ছোকরা বলিল—"থাক্ পুরুতমশাই, এই উপোসের মুখে যদি একটা প্রতিজ্ঞা ক'রে বসেন সে তো আর স্বয়ং বিধাতা এলেও রদ হবে না; থাক্, সয়ে যান..."

একজন সামনে ঠেলিয়া আসিয়া বরের পিতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"তার চেয়ে বরং বর আসনে বসবার আগে, কাকা, একবার গয়নাপত্র, দানসামগ্রীগুলো দেখে নিন্..."

কন্যাপক্ষের দিক থেকে একজন বেশ ষণ্ডাগোছের লোক উগ্র দৃষ্টিতে ছোকরার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"জিজ্ঞেস করি—কেন?"

ছোকরা রোগাগোছের, থতমত খাইয়া আমতা আমতা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, এমনি বলছিলাম সবাই তাহলে একবার দেখতাম।" তাহার পর পাশের একটি সঙ্গীকে প্রশ্ন করিল—"তুই বলছিলি না রে—এখানকার সেকরারা চমৎকার গড়ন করে গয়নার?"

সে ছোকরা এসব ফ্যাসাদের কথায় একেবারেই না থাকিবার জন্য বলিল—"যাঃ, আমি কি জানি এখানকার সেকরাদের কথা, দেখ তো! মিছিমিছি আমায় টানা..."

প্রথম ছোকরা একটু ছুতা করিয়া সরিয়া পড়িল।

গোলমাল কিন্তু থামিল না। বরের পিতা একটু সন্দিগ্ধ-প্রকৃতির লোক, বলিল—"ছেলেমানুষ যদি তুলেই থাকে কথাটা, আপত্তির কারণও তো দেখি না আপনাদের। বিয়ের আগে গয়নাপত্র দেখে নেওয়া, এ রকম তো আখছারই হচ্ছে আজকাল।"

কন্যাপক্ষের লোকটির রাগে তখন শরীরটা কাঁপিতে আরম্ভ করিয়াছে, কণ্ঠস্বর সংযত

করিয়া বলিল—"এ বাড়িতে হয় নি।"

অপর একজন বলিল—"এ তল্লাটে নয়।"

বরকর্তার হাতে একজন সুবিবেচনার সহিত নিজের হুঁকাটা তুলিয়া দিল। সে দু-তিনটা টান দিয়া শান্ত-স্বরে বলিল—"নাই বা হ'ল, আজ হোক। দোষ কি ? পুরুতের চায়ে যখন নুন রয়েছে, তখন...কি যে বলে বেশ..."

যে হুঁকা যোগাইয়া দিয়াছিল তাহার আবার সুযোগের মাথায় কথা যোগাইয়া দেওয়াও অভ্যাস আছে, বলিল—"তখন কনের গয়নায় খাদ থাকবে না, কে বলতে পারে !"

"মুখ সামলে"—বলিয়া কয়েকজন একসঙ্গে হুঙ্কার করিয়া উঠিল।

বরকর্তা বলিল—"তা সামলাচ্ছে, কিন্তু গয়না যাচাই না হলে বর পিঁড়িতে উঠবে না।"

—"আলবৎ উঠবে।"

কন্যাপক্ষীয়দের সকলেই সমস্ত দিন নানারকম আবদার-অত্যাচার সহ্য করিয়া অন্তরে অন্তরে ক্ষিপ্ত হইয়া ছিল। প্রতিশোধের আঁচ পাইয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল। একজন ভিড়ের মধ্যে থেকে বলিয়া উঠিল—"তাকে কান ধরে টেনে এসে বসানো হবে।"

"কোথায় গেল বর ?"

"পাকড়ো উস্‌কো।"

অবরুদ্ধ আক্রোশের বাঁধ ভাঙিয়া একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। এ-পক্ষের দল যেমন দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া গেল, ও-পক্ষের দল সেই অনুপাতে কমিয়া আসিতে লাগিল ; যে যেখানে পারিল সন্ধ্যার অন্ধকারে গা-ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বরের কিন্তু খোঁজ পাওয়া গেল না। আনাচে, কানাচে, অন্ধকারে, গলি-খুঁজিতে, বন-বাদাড়ে যে কয়জনকে ধরা গেল তাহাদের কেহই বর নয়।...

"গেল কোথায় বর !"

প্রশ্ন উঠিল—"স্টেশনে যায় নি তো ?"

একজন উত্তর করিল—"তাদের বাড়ির দিকে এখন গাড়ি নেই তো ; কলকসতার গাড়ি আছে একটা।"

একটা দল স্টেশনের দিকে ছুটিল।

* * *

তখন কলিকাতার গাড়ি আসিয়া গিয়াছে। পাতলা অন্ধকারে দূর হইতে দেখা গেল টিকিটঘরের দিক থেকে খুব ঢিলাঢালা জামা-কাপড় পরা একটি ছোকরা গাড়ির দিকে ছুটিয়াছে।...গার্ড হুইসল্ দিল।

দলের তিন-চারজন ছোকরা ছুটিল। প্লাটফর্মে যখন পঁহুছিল তখন গাড়ি বেশ একটু জোর দিয়াছে। তবুও বোধ হয় টানিয়া নামাইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু সাহেব-গার্ডের ধমক খাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

একজন বলিল—"হজ্‌ব্যান্ড স্যার, হজ্‌ব্যান্ড রনিং এওয়ে ! !"

বিবাহ না করিয়াই যে পলাইতেছে সেইটে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য অপর একজন হাত তুলিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"আন্-ম্যারেড হজ্‌ব্যান্ড অফ আন্-ম্যারেড ওয়াইফ, স্যার ! !"

গাড়ি কিন্তু চলিয়া গেল।

৪

তখন দুর্ভাবনা জুটিল—জাত-কুল বাঁচে কি করিয়া ?

সদ্য বর কাঁড়িয়া বিয়ে দিতে হইবে। প্রথমে মিত্তিরদের শম্ভুর কথা মনে পড়িল সকলের। বিয়েবাড়ি তোলপাড় করিয়াও শম্ভুর সন্ধান পাওয়া গেল না। শম্ভু নিমন্ত্রণে আসে নাই—একটা অভাবনীয় ব্যাপার! কয়েকজন উৎসাহী ছোকরা তাহার বাড়ি ছুটিল।

বাড়িতে আর কেহই ছিল না, মেয়ে-পুরুষ সবাই বিয়ে-বাড়ি। বৈঠকখানায় তক্তপোষে শম্ভু ঘুমাইয়া আছে। পাশে ত্রৈলোক্য কবিরাজের ছেলে মাখন। তক্তপোষের এক ধারে কতকগুলা শিশি আর একটা ওষুধ মাড়িবার খল।

আজ দিনের বেলায় মেয়ে খাওয়ানো ছিল। টের পাওয়া গেল শম্ভু কোন সুযোগে এক জায়গায় বসিয়া পড়িয়াছিল। আহারটা অত্যধিক হইয়া গিয়াছে। মাখন এখন বাপের যত রকম হজমি বড়ি, চূর্ণ, আরক আছে সবগুলা তাহার উপর পরীক্ষা করিতেছে।

বিয়ের কথা শুনিয়া মাখন কবিরাজোচিত গাম্ভীর্যের সহিত প্রশ্ন করিল—"লগ্ন কখন ?"

"সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে নটার মধ্যে।"

মাখন শম্ভুর পেটে দুইটা টোকা মারিয়া চক্ষু ঊর্ধ্বে তুলিয়া একটু হিসাব করিল; তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিল—"তাহলে হ'ল না, এগারটার আগে উঠে বসতে পারবে না। এগারটা পর্যন্ত খেতে যাবে সেই চেষ্টা করছি; সে-সময় হ'লে হয় তো দেখ।"

আর তাহা হইলে ছেলে কই ?

একজন বলিল "কেন, আমাদের ফেলু কেমন হয় ? রমানাথের ভাগনে ফেলারাম..."

রমানাথ কাছেই ছিল। একটু লোভী লোক। ভাগনেকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করিয়াছে এবং তজ্জনিত খরচের একটা হিসাব রাখিয়া গিয়াছে, আশা ছিল বিয়েতে সেটা পুষাইয়া লইবে! সৌভাগ্যটা এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আসায় উল্লসিত হইয়া উঠিল। মোচড় দিয়া আরও কিছু আদায় করিবার জন্য বলিল—"ওর মা কি রাজী হবে ? ওই একটি ছেলে; আর কেউ তো নেই..."

গরজের বালাই, দর আর একটু উঠিল। ফেলারামের ডাক পড়িয়া গেল। তাহাকে পাওয়া গেল না। রমানাথের ছেলে কানাই বরযাত্রীদের টিটকারি দিতে দিতে স্টেশন পর্যন্ত ধাওয়া করিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া সব শুনিয়া বলিল—"সে তো আজ বিয়ে করতে পারবে না!"

রমানাথ একেবারে খিঁচাইয়া উঠিল—"আজ পারবে না মানে ?—এ কি পরাণ মণ্ডলের কর্জ শোধ দেওয়া নাকি ?—আজ পারব না, কাল—কাল নয়, পরশু!...ডাক সে হারামজাদাকে। দেখি, কেমন না করে..."

কানাই বলিল—"ডাকলে আসবে কি ক'রে ? নেমন্তন্নর জন্যে জোলাপ নিয়ে ব'সে আছে মাখনের কাছ থেকে। মাখনা ভুল ক'রে কি একটা দিয়েছিল—এখনও জের কাটে নি। সে আসতে চাইলেও বরং রোকা উচিত।"

কন্যাকর্তা আর সমাজের মাতব্বরেরা মাথায় হাত দিয়া বসিল। গ্রামে আর ছেলে নাই। এদিকে লগ্ন বুঝি বহিয়া যায়।

কানাই-ই প্রশ্ন করিল—"রূপচাঁদকে হ'লে কাজ চলবে না ? ওর বাবা-কাকা তো ওকে সমস্ত দিন উপোস করিয়ে রেখেছে, পেটফাঁপার হাঙ্গামাও নেই, জোলাপের হাঙ্গামাও নেই।"

এ-হেন পাজি বরযাত্রীর দলকে গাড়ি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করায় সকলেই বৃপচাঁদের ওপব সন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকেই একসঙ্গে চেঁচাইয়া উঠিল—"ঠিক তো! হ্যাঁ, ওর সঙ্গেই দিয়ে দাও বিয়ে।"

একজন সন্দেহ প্রকাশ করিল—"কিন্তু ঠিক মিল হবে কি? প্রায় এক বয়সই যে দুটোতে।"

—"আরে বেশ হবে নাও, আগে জাত তো বাঁচুক, তারপর মিল আর টিল।"

একটি ছোকরা আবেগের মাথায় একেবারে গুরুলঘু ভুলিয়া সামনে আসিয়া বলিল—"আর ওদেব দুজনেব মধ্যে যে লব রয়েছে; লবেব চেয়ে মিল..."

"বেরো" বলিয়া কে একজন তাহাব গালে ঠাস করিয়া একটা চড বসাইয়া পিছনে ঠেলিয়া দিল।

কনের মা মূর্ছা গিয়াছে, বাবা সেইখানেই ছিল। কয়েকজন তাহাকে ডাকিতে ছুটিল। ওদিকে কানাই আর বৃপচাঁদের বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কয়েকজন তাহাব বাড়ি ছুটিল।

বাড়িতে শুধু বৃপচাঁদের ঠাকুবমা আর একটা বুড়ী ঝি। সকলে খোঁজ লইয়া চিলেকোঠার সামনে গিয়া দাঁড়াইল। বাহির হইতে তালা বন্ধ, ভিতরে কোন সাড়াশব্দ নাই। সকলে একবার সভয়ে মুখ-চাওয়াচাওযি কবিল। তাহাব পব ভূতো দোরে একটা ধাক্কা দিয়া ডাকিল—"বৃপো!"

কোন উত্তর হইল না।

আরও জোরে ধাক্কা দিয়া ডাকিল "বৃপো, এই বৃপচাঁদ!"

অতি ক্ষীণ একটা আওয়াজ ছিদ্রপথে বাহিব হইল। একেবাবে তিন-চারজন একসঙ্গে প্রশ্ন করিল—"বিয়ে করবি?"

বৃপচাঁদ শরীরটাকে টানিয়া দুয়ারেব কাছে সরিয়া আসিল। দুইটা কপাটের মাঝে ঠোঁট দিয়া প্রশ্ন করিল—"কিছু খাবাব আছে বে?...ভূতো নাকি?"

—"হ্যাঁ,...ওদেব বব পালিয়েছে। তোর সঙ্গে নেড়ীব বে ঠিক হয়েছে।"

বৃপচাঁদ চিঁ চিঁ করিয়া বলিল—"দোবটা খুলে দে; কিছু খাবাব এনেছিস তোবা? কেনো কোথায়?"

—"কানাই চাবি আনতে গেছে, ভুলে গিয়েছিল...একেবাবে বিয়ের পব খাবি বৃপো, ঘণ্টাদুয়েক একটু সবুর ক'বে থাক না।"

—"ওবে বাপ রে! দু-ঘণ্টা?...তবে থাক।"

—"তুই অত ভালবাসতিস্ নেড়ীকে বৃপো, একবাব অন্য জায়গায় হয়ে গেলে বিয়ে..."

বৃপচাঁদ ভিতর হইতে একেবারে খিঁচাইয়া উঠিল—"মেলা ফ্যাচফ্যাচ কবিস নে ভূতো...সমস্ত দিন পেটে অন্ন নেই, বলে এবও ওপব দু-ঘণ্টা চাপিয়ে বিয়ে ক'রসে।...দোব খুলে কিছু খেতে দিবি তো দে, নইলে বেরো...সব উপগাব করতে এসেছেন..." কণ্ঠস্বর ক্রমেই ক্ষীণতর হইয়া একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল।

কানাই চাবি লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দুয়ার খুলিয়া যতক্ষণে তাহারা নীচে নামিয়া আসিল ততক্ষণে বৃপোর বাপ নেড়ীব বাপ আরও সব অনেক লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এ-রকম অর্ধমৃত অবস্থায় বিবাহ হয় না। একজনকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, সে ছুটিয়া গিয়া একটু দুধ আব সন্দেশ লইয়া আসিল। বৃপচাঁদ চাঙ্গা হইয়া উঠিতে উঠিতে বাড়িটা মেয়েপুরুষের কলরবে, হঠাৎ বিবাহেব ত্রস্ত আয়োজনে গমগম্